

সায়নী পুতুল

অসভ্য চোখ



অসভ্য চোখ

সায়ন্ত্রনী পূতুণ্ড

প্রাক্কথন

একজোড়া চোখ!

একজোড়া চোখ নিয়ে এখন তল্লাট সরগরম! শুধু চোখ নয়, বীতিমত অসভ্য চোখ!

এই তো, কয়েকদিন আগেকার ঘটনা। মিত্রবাড়ির মায়াদিদি একেবারে বিদ্যা বালানের মত লাল গামছা পরে উ_লা_লা, উ_লা_লা করে গান গাইতে গাইতে ছান_টান করছিল। আর বেবো_স্টাইলে হেসে হেসে সাবান মাখছিল। এটাই এখনকার নিয়ম। সাবান মেখে .কি জিনিস বানিয়েছ গুরু, হতে হলে সাবান কে সাবান নয়, এক টুকরো হাত্তিক ঝোশন ভাবতে হবে! অতঃপর সাবানটাকে নিজের গায়ে না ঘষে সাবানের গায়ে লুটোপুটি খেতে হবে। তবেই ‘ফস্সা’, হওয়া যাবে!

যথারীতি মায়াদিদিও সেটাই করছিল। আর খুঁচখুঁচ করে গান গাইছিল—‘তু হ্যায় মেরা ফ্যান্টাসি’। ফ্যান্টাসি সে নিজে, না সাবানটা, না সাবানরূপী হাত্তিক ঝোশন তা ভগাই জানে! কিন্তু ‘ফ্যান্টাসি’র ‘সি’তে গিয়েই সে অসভ্য চোখজোড়াকে ‘সি’ করে ফেলল, অর্থাৎ দেখে ফেলল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সি শার্প থেকে চড়াৎ করে একেবারে স্টান এফ শার্পে হাঁউমাউ! পাড়াশুন্দ লোক সেই আর্টচিংকারে ছুটে এল, রাস্তার শান্তিশিষ্ট ল্যাজকাটা কুকুর ভুলো ‘খ্যাঁক’ করে চামার দোকানদার ভোলা মুদিকে কামড়ে দিল, দুটো কাক উড়তে উড়তে আচমকাই আছড়ে পড়ল ইলেকট্রিকের তারে! আরও কত কি হল কে জানে! যাই হোক, শেষপর্যন্ত জানা গেল অমন প্রলয়ক্ষর চিংকারের কারণ। মায়াদিদি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—‘ঐ বাথরুমের জানলা দিয়ে...কেউ উঁকি মারছিল!...কেউ এদিকেই উঁকি মারছিল...’।

এটাই অবিশ্য প্রথম কেস নয়। এর আগে এই অজ্ঞাত ‘কেউ’ টি মজুমদার বাড়ির ছেট ছেলে আর বৌয়ের ফুলশয়্যার দিন জানলা দিয়ে উঁকি মেরেছিল। তারও আগে শান্তি বৌদির বেডরুমে! ভাগ্যে সেদিন দাদা বাড়ি ছিল না! ‘কেউ’ বেচারিকে সেদিন হয়তো নিরামিষ থাকতেই হয়েছে। তাতে সে ফ্রাস্টেটেড হয়ে আরও কান্তিমান জুড়েছে। আগে শুধু বেডরুমেই নজর দিয়ে খুশি ছিল। এখন বাথরুমকেও ছাড়ে না। সকালে_বিকেলে, স্নান_সান্ধ্যস্নান করার সময়ে তো বটেই, এমনকি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলেও তার অসভ্য চোখের উৎপাতে টেঁকা যাচ্ছে না।

চিন্তার ব্যাপার! অত্যন্ত চিন্তার ব্যাপার! নবগ্রামের সব ক্লাবের ছেলেপুলেরা একজোট হল। এ কি অন্যায়! তামাম মা_বোনদের মান_সম্মানের কথা। দাদা_ভাইদের প্রেসিজে এভাবে

গ্যামাক্সিন দিয়ে হতভাগা 'কেউ' 'কেউটেগিরি' করতে পারে না! অবিলম্বে স্টেপ নিতে হবে।

নবগ্রাম শিশু সজ্জের প্রেসিডেন্ট শাঁকালুদা হয়তো কোনওকালে শিশু ছিলেন। কিন্তু এখন তার ছেলের ঘরে শিশু খেলে বেড়াচ্ছে। অবশ্য তাতে আর কি! 'উমর' পচপন, হলেও হৃদয়ে এখনও 'বচপন', জাগ্রত্ত। তার আসল নাম কারুর জানা নেই। শাঁকালুর মত দাঁত হওয়ার দরুণ, বেচারির পিতৃপ্রদত্ত নামটা পালটে গিয়ে 'শাঁকালুদা'ই হয়ে গেছে। লোকে বলে, তিনি নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে সেরেল্যাক, বোর্নিভিটাও খেয়ে থাকেন!

যাই হোকু, সেই শাঁকালুদা তার মাথার 'স্মৃতিটুকু' থাক, এ হাত বুলিয়ে বললেন—'এল' আছু ব্যবহৃতা কত্তে হবে'।

ইয়ে, কথাগুলো কি হিস্তি বলে মনে হচ্ছে? তাহলে একটা কথা জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, যে শাঁকালুদা এখনও বাচ্চাদের মতই আধো আধো উচ্চারণে কথা বলেন। নিন্দুকেরা পিছনে বলে—'ল্যাদা!', কিন্তু মোদা কথা হল, লোকটাকে এখনও শৈশব ছাড়েনি। হঁ হঁ বাবা, সাধে কি তিনি শিশু সজ্জের প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে আছেন!

তার কথার তর্জমা করে দিল ইয়ুথ ক্লাবের ক্যাশিয়ার হাবু—মানে, এর আশু ব্যবস্থা করতে হবে'।

ইয়ুথ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হলোদা সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী হয়েছেন। তিনি উত্তেজিত হয়ে স্টান উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন—'ভস্তুরা, আমাদের পাড়ায় এখ মহাভিফদ আসন্ন। আমাদের লড়তে হত্তেং ফ্রিতিবাধ করতে হত্তেং। মা, ভোন দের ইজ্জথের গায়ে হাথ দেওয়া ছলভে নাঃ...'।

প্লেটোনিক ক্লাবের মিচকেপটাশ পিকুল বলল—'কেলো করেছে! এ যে ফের সংস্কৃত বলতে লেগেছে!'

সত্যিই সংস্কৃত! এবং প্রতিটা বিসর্গের সাথে উপরিপাওনা কয়েকফোঁটা থুতু! ইয়ুথক্লাবের প্রেসিডেন্ট হলে হবে কি! হলোদার সামনের চারটে দাঁত বেমালুম পড়ে গেছে। পাশের তিনটে জেহাদ করছে। 'এই গদি ছাড়লাম... ছাড়লাম...' ভাব। হলোদা গদি পাওয়ার আগেই হয়তো তারা দেহ রাখবে। আগের চারটেও শুরুতে এমনই করছিল। কিন্তু হলোদার তেজস্বী ভাষণের ধাক্কায় বেচারারা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে তার ঠিক নেই! শোনা যায়, শেষ দাঁতটা নাকি পার্টির এক মন্ত্রীর নাকে লেগেছিল। ভদ্রলোক মন দিয়ে হলোদার বক্তৃতা শুনছিলেন। কিন্তু উত্তেজিত হলোদার 'জয় হোঁ' ধ্বনির বিসর্গের সাথে অব্যর্থ লক্ষ্যে ঠাঁই করে কি যেন একটা তাঁর নাকে এসে লেগেছিল! নাক কেটে গিয়ে, রক্তপাত হয়ে সে এক কেলেক্ষারিয়াস কান্দ! কর্মকর্তারা কাঁইকাঁই করে উঠেছিলেন—এ নাকি বিপক্ষ দলের ষড়যন্ত্র! তারাই বক্তৃতা চলাকালীন টিল ছুঁড়ে মন্ত্রীর নাক ফাটিয়েছে!

কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল, টিল নয়—দাঁত! হলোদার দাঁত! আগেই নড়তে শুরু করেছিল। ভাষণের ঠ্যালায় একেবারে মিসাইলের মত ছুটে গিয়ে লেগেছে মন্ত্রীর নাকে!

সে এক কেছা! তার কথা আর না বলাই ভালো। মোদা কথা হল, হলোদার চারটে দাঁত না থাকার দরুণ, তিনি যা বলেন তা উচ্চারণ করার আগেই ফস্ফস্ করে দাঁতের ফুঁকর দিয়ে বেরিয়ে যায়। ফলস্বরূপ 'প', 'হয়', 'ফ', 'ব', 'হয়', 'ভ', 'এবং', 'দ', 'হয়', 'ধ'।

--'এটা কি সত্তা পেয়েছ?' প্লেটোনিক ক্লাবের হোমরা চোমরা সুব্রতদা বললেন--'এখানে ওসব বন্ধুগণ, ফন বলে বক্তিমে দেওয়ার দরকার কি? সত্যি গুরু, জমায়েতে ভাষণ দিয়ে দিয়ে তুমি ফুলটু ন্যাতা হয়ে গেছ মাইরি!'

--'ভাষণ নয়। এই নভগ্রামের নুন, ঝল খেয়েছি আমরা সবাই। থার শোধ ধেওয়ার সময় আরুকে...'।

সুব্রতদা যোগ করলেন--'শুধু নুন, জলই খাইনি। শুশ আর পটিও করেছি। সেটা তো বললে না মামা'।

হুলোদা প্রতিবাদে ফসফস করে আরও কিছু বিসর্গ আর খুতু ছেটাতে চলেছিলেন। তার আগেই পিকুল তাকে থামিয়েছে--'সুব্রতদা, তুমি কি বলো?'।

সুব্রতদা একটু ভাবলেন--'বুঝলি পিকুল, ব্যাপারটা যত সামান্য ভেবেছিলাম, ততটা নয়। আমার সন্দেহ হয়.....।'

--'কি...কি...কি...?'।

সবাই এমন ভাবে তার দিকে ঝুঁকে পড়ল, যেন এখনই তিনি হরির লুটের বাতাসা ছাঁড়ে দেবেন! শিশু সঙ্গের উইকেট কিপার পাঁচু তো প্রায় ক্যাচ ধরার ভঙ্গিই নুয়ে পড়েছে!

--'এসব কোনও বাইরের লোক করছে না। পাড়ার লোকেরই কাজ!', সুব্রতদা সিঁথেটে এমন ভাবে টান মারলেন, মনে হল ওটা সিঁথেট নয়, পাইপ! আর তিনিও সুব্রত চাটুজে নন, খোদ শার্লক হোম্স! আস্তে আস্তে বিড়বিড় করলেন--'এসব কোনও ফ্রাস্টু খাওয়া বদমায়েশ ছেলের কাণ্ড'।

--'যাঃ কলা!', পাঁচু হতাশ ভাবে হাত নাড়ে--'তাহলে যে ঠক বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে দাদা। ফ্রাস্টু তো এখন ঘর কি কাঁহানি'। ভগবান বুদ্ধ এ যুগে জন্মালে মৃত্যুহীন পরিবারের বদলে ফ্রাস্টুহীন পরিবার খুঁজতে বলতেন। মিলায় ফ্রাস্টু ঘরে ঘরে'।

--'যা বলেছিস্ম'. হাবু পাঁচুকে সমর্থন করল--'বাবার চাকরিতে বসের দাঁত খিঁচুনির ফ্রাস্টু, কাকার গায়ক না হওয়ার ফ্রাস্টু, তেলেভাজার দোকানির উত্তমকুমার না হতে পারার ফ্রাস্টু, সাইবার ফ্রাস্টু-খাইবার ফ্রাস্টু, প্রেমে ফ্রাস্টু-গেমে ফ্রাস্টু, বাঁচার ফ্রাস্টু-খাঁচার ফ্রাস্টু, বুমে ফ্রাস্টু-ডুমে ফ্রাস্টু, চুপি ফ্রাস্টু-গুপি ফ্রাস্টু, দৈনিক ফ্রাস্টু-চৈনিক ফ্রাস্টু... খুনী ফ্রাস্টু-টুনি ফ্রাস্টু... অ্যালো ফ্রাস্টু-হ্যালো ফ্রাস্টু, হোমিও ফ্রাস্টু-...।'

--'রোমিও ফ্রাস্টু'। সুব্রতদা মুচকি হেসে যোগ করলেন।

হাবু মহাখুশি হয়ে বলে--'বাঃ, বেড়ে মিলিয়েছ তো! এটা তো ভাবিনি!'।

--'ভাবা উচিং ছিল'। তিনি বললেন--'অন্যান্য ফ্রাস্টেশনের কথা আপাতত থাক। উপস্থিত এমন একটা লোককে খোঁজা দরকার যার রোমিও ফ্রাস্টু আছে। প্রেমে ল্যাঙ খেয়েছে, কিংবা একাকিত্বে বিরক্ত অথবা ডনজুয়ান হওয়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে নখু খয়রা হয়ে গেছে--এমন পার্সিক। মেয়ে পায়নি। তাই পিপিং টম গিরি করে নিজের ফ্রাস্টুর ইলাজ করছে'।

--'এমন ফ্রাস্টুওয়ালা লোকও তো নবগ্রামে কম নেই! পিকুল মাথা চুলকে বলে--অন্তত গোটা পঞ্চাশেক ছেলেপুলে এমনই পাওয়া যাবে। তার মধ্যে কোনজন কি করে বুঝব?'।

--'পাতা লাগাতে হবে'। সুব্রতদার ভুরু কুঁচকে গেল--'পঞ্চাশটা নাম না হলেও, অন্তত ছুটো নাম আমার এখনই মাথায় আসছে। বলবো?'।

১.

“এই জীবন লইয়া কি করিব”? এই জীবন-যৌবন লইয়া কি করিতে হয়?

রোজ সকালে বাথরুমে গিয়ে বিড়িতে টান মারলেই বিশ্বনাথ গুপ্ত তথা বিশুর মাথায় দার্শনিক প্রশ্নরা এসে তিং পাং তিং পাং করে নাচতে শুরু করে। তখন সে কেমন যেন ভোম্ হয়ে বসে থাকে। মনে হয় পরমহংস অবতার নিয়েছে। এক্ষুনি ডাঙা ছেড়ে প্যাঁক প্যাঁক করে নেমে যাবে জলে। আর ডুবকি মেরে মেরে কাদা খেকে গুগলি বেছে বেছে খাবে।

অবশ্য নতুন করে গুগলি আর খাবে কি? কয়েকদিন আগেই রঞ্জনা যা একখানা মোক্ষম গুগলি ঘোড়ে দিয়ে গেছে! দিব্যি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিল বিশুর সঙ্গে। হঠাৎ ওর বাবা এসে রেডকার্ড দেখালেন। আর রঞ্জনাও ‘আরুলিশ’, বলে জল ছেড়ে উঠে গেল ডাঙায়। কালই তার বিয়ে ছিল। মেইন রোলে কাঁচরাপাড়া নিবাসী কোন্ এক ডাঙার! আর বিশু গেস্ট অ্যাপিয়ারেলা মনে যতই লক্ষাবাটা জ্বলুক, বরের পাশে দিব্যি দাঁত কেলিয়ে বসেছিল।

ডাঙার-জামাইবাবুর পাড়াতুতে শালা বলে কথা! শা-লা!

ভাবতেই বিশুর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কালকের বিয়েবাড়ির কথা ভাবলেই তার গা জ্বলছে। এমনিতেই বিয়েবাড়ি সম্পর্কে তার একটু অ্যালার্জি আছে। যারা নিয়মিত বিয়েবাড়ি অ্যাটেন্ড করেন তাদের ‘সহযোগী অথবা সহবিভূষণ, উপাধি দেওয়া উচিত। অন্তত বিশুর হাতে ক্ষমতা থাকলে এমন একটা উপাধির চল করে দিত। এই কালকের কথাই ধরো না! বিয়ে বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই একশো চালিশ ডেসিবেলের চিংকারে প্রথমেই কান ফাটানোর তাল! তার সাথে যত কাকু জ্যেষ্ঠা আদেখিলের মত নাচতে নাচতে এসে ঘাড়ের উপর হৃষি খেয়ে পড়লেন। প্রায় ‘জগন্নাথের অপ্রতিহত রথের মত’, এ ওর পা মাড়িয়ে দিচ্ছেন। নাচের ঠ্যালায় ইতস্তত কনুইয়ের গুঁতো হরির লুটের বাতাসার মত এদিক ওদিক ছিটকিয়ে পড়ছে! কিন্তু রেগে যাওয়ার উপায় নেই। ‘বুরা না মানো, শাদি হ্যায়’! অগত্যা মুখে একটা প্লাস্টিক হাসি ঝুলিয়ে মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে তথাকথিত জেঁ-কাকুদের গুষ্টির পিণ্ডি চটকানো আর পিত্তপুরুষের শ্বাসমেত মুভুপাত!

কোনমতে তাঁদের এড়িয়ে ঠেলেঠুলে প্রমীলা কক্ষে প্রবেশ! সেখানে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ হওয়া অবধারিত! ওখানে মহিলার সংখ্যা কম, আর চলমান ক্রিসমাস ট্রি-এর সমাবেশ বেশি!

একেবারে সোনার দোকানের ব্র্যান্ড অ্যাস্বাসাডার হয়ে গয়না ঝমর করে ঘুরছেন শ্রীমতিরা! প্রায় একটন ওজনের বেনারসী, কিম্বা কাঞ্জিভরম অথবা জারদৌসি পরিহিত মহিলাদের দেখলেই হঠাৎ করে মনে হয় যে এরাই বুঝি মিশরের পিরামিডের পাথর বয়ে এনেছিলেন! আর তাঁদের আভরণ? তাঁরা কেমন করে পরে থাকেন কে জানে, কিন্তু শুধু দেখেই বিশুর গা কুটকুট করতে থাকে! কেউ চন্দ্রহার, কেউ ললন্তিকা, কেউ নওলাখা-বাপরে! শো অফের চূড়ান্ত!

এরপরের দৃশ্যটা অনেকটা এইরকম—

চন্দ্রহার পেছনে বলবেন—‘ইশশশশ... নওলাখাৰ বেনারসীটা দেখেছ? একেবারে থার্ডক্লাস...!’

নওলাখা ফিসিফিসাবেন—‘ যাই বলো, ললন্তিকা একদম ওল্ড ফ্যাশনড। আর এটিকেট ও কিসু জানে না! দেখেছ? পরে এসেছে একটা যা তা জারদৌসি...ছ্যা ছ্যা ছ্যা...’

ললন্তিকা বরকে ডেকে বলবেন—‘ যতই মুখে রঙ লাগাও, কাক কি আর ময়ূর হয়?

দুজনেই যা জ্বলছে না! একেবারে জ্বালিয়ে দিয়েছি! ’

এর মধ্যে যদি বিশুর সমব্যথী কেউ হয়ে থাকে, তবে সে বিয়েবাড়ির আসল নায়ক। বর বেচারা কান কাটা হলোর মত মাথা নীচু করে ঘুরছিল—যেন গুরুচুরি করে জেলে পিয়েছিল, আজই সবে ছাড়া পেয়েছে! শ্বশুর শাশুড়ি ততক্ষনে নিজের জ্ঞাতিগুষ্ঠির সাথে আলাপ করিয়ে দিতে ব্যস্ত—

—‘ বাবাজীবন, এই হল আমার জ্যেষ্ঠুর খুড়তুতো শালার বৌয়ের মামাতো বোনের দেওরের ছোট ভাইয়ের মাসির পিসতুতো বোনের ছোট ছেলের মেয়ে! ’

বর বাবাজী এই .ই ইকোয়্যাল্টু এম সি স্কোয়্যার, কতদূর বুবলেন ভগবানই জানেন—কিন্তু মুখে একটা ক্যালানেকার্টিক মার্কা হাসি দিয়ে হেঁ হেঁ করতে করতে করমর্দন করলেন। যদিও এই আঞ্চলিক সাথে কম্পিনকালে তার দেখা হবে কি না কে জানে! কিন্তু বিয়ের দিন সবাই উদার!

এসব বিশু বহুবার দেখেছে। বহুবার শুনেছে। কম তো হল না। প্রেমিকাদের বিয়ের নেমন্তন্ত্র খাওয়ার বিষয়ে সে রেকর্ড করেছে। এতদিনে গিনেস বুক অব রেকর্ডসে তার নাম উঠে যাওয়া উচিত ছিল। কপালদোষে ওঠেনি। রাণী, মৌমিতা, বসুধা, শিরিন, জয়িতা, অঞ্জলি, মুনিয়া—এবং রঞ্জনা, প্রত্যেকের বিয়েই সে খেয়ে ফেলেছে। বিশু লক্ষ্য করে দেখেছে, যখনই কোন মেয়ের সঙ্গে তার প্রেম হয়, তার ঠিক তিনমাসের মধ্যেই সেই মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়ে যায়! এ পাঢ়ার প্রত্যেকটি মেয়েই এই ব্যাপারটা জানে। তাই যখনই কোনো মেয়ের বিয়ের শখ হয়, তখনই সে বিশুর সাথে একটু ফস্টিনষ্টি করে যায়! বলাই বাহুল্য, উদ্দেশ্য কলেজের সাদামাটা ক্লার্ক বিশ্বনাথ গুণ্টকে বিয়ে করা নয়। বরং তার ঘাড়ের উপর দিয়ে বন্দুক চালিয়ে একটি ট্যাঁকমোটা রাজহাঁস শিকার করা।

বিশু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মেয়েগুলোর দোষ নেই। সে নিজেই তো তাদের অভিসন্ধি জানে। তবু যখন বিদায়ের আগে মেয়েরা বলে—‘টেক ইট ইঁজি বিশু। সামান্য ক্লার্কের চাকরি করে ব্যাচেলার লাইফ লিড করা যায়। ম্যারেড লাইফ নয়’, তখন বিশুর বুকের ভিতরটা একইরকম টনটন করে। একইরকম চোখ কড়কড় করে। একই ভাবে কান্না পেয়ে যায়! সে বারবার তাদের হাত জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে—‘আমায় ছেড়ে যেও না। কথা দিচ্ছি আমার রক্ত বিক্রি করে হলেও তোমায় আমি সুখী রাখবো। কিন্তু এভাবে ছেড়ে যেওনা। আমি কি নিয়ে বাঁচবো?’

প্রত্যেকটা বিয়ের নেমন্তন্ত্র খেয়ে আসার পর মনে হয় আজ হয় কেরোসিন, নয় দড়ি!

কিছুক্ষণ সে সব চিন্তা করার পর আপনমনেই গান গাইতে থাকে—‘যুঙ্গুরু কি তরাহ্ বাজতা হি রাহা হুঁ ম্যায়... কভি ইস্ পগ মেঁ, কভি উস পগ মেঁ...’। তারপর গোটা দুয়েক বড়ি খেয়ে ঝুঁ হয়ে বসে থাকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে—‘ইশ্বর, তোমার দ্বন্দ্যায় কি আমার জন্য কেউ নেই?’

বিশুর জন্য আর কেউ না থাক, বড়ি আছে। স্কুলজীবন থেকেই সে বড়ি খেয়ে আসছে। না না, এ বড়ি তরকারিতে দেওয়ার বড়ি নয়। এ বড়ি হল ঘুমের বড়ি। এখন তার ফ্যানি নাম হয়েছে—স্ট্রেস ফ্রি! খেলে বেশ একটা ঝিমঝিমে মৌতাত হয়। কিছুক্ষন বাদে মাথাটা বেশ

হাঙ্কা হাঙ্কা মনে হয়। মনে হয়, কোথাও কেউ নেই, জগৎ মিথ্যা— ব্রহ্ম ওরফে বিশুই
সত্য! দুনিয়ায় কোনও চাপ নেই! রাণী, মৌমিতা, বসুধারা সবাই আসলে তার শরণাগত!
ভগবান বুদ্ধ বা যীশুর কাছে যেমন পাপীতাপী, রোগগ্রস্তরা মুক্তির জন্য ছুটে যেত, তেমন
তার কাছেও সবাই সুখ-শান্তির খোঁজে ছুটে আসে। অর্থাৎ রামমোহন, বিদ্যেসাগর মশাইয়ের
মত বিশুও নারীদের উদ্ধার প্রকল্পেই এসেছে। অথবা যেমন শ্রীরামের পদস্পর্শে পাষাণী অহল্যা
মানবী হয়েছিলেন, তেমনি তার স্পর্শেও মিস্রা মিসেস হয়।

বড়িগ্রন্থ হয়ে পড়লে তার মাথায় এসব ভালো ভালো চিন্তাই আসে। কিন্তু সে মৌতাত কেটে
গেলে আবার সেই একই প্রশ্ন ফণা তোলে।

--“এই জীবন লইয়া কি করিব?” এই জীবন-যৌবন লইয়া কি করিতে হয়?

২.

--‘কাকু, আপনার ব্যাগটা কি ধরবো?’

হারাধনকাকুর কালো চশমাটা রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠল। হেসে বললেন--‘বিশু মনে হচ্ছে!
আজ হঠাতে বাজারে যে! কলেজ নেই?’

--‘আজ কিসের যেন একটা ছুটি’।

--‘কিসের ছুটি?’

--‘কি জানি!, বিশু মাথা চুলকুতে চুলকুতে বলল--‘হাতুড়ি পূর্ণিমা না কোদালে অমাবস্যা
কি যেন একটা আছে’।

হারাধনকাকু জন্মাক্ষা চোখে সবসময়ই একটা কালো চশমা পরে থাকেন। একহাতে একটা
স্টিক, অন্যহাতে ঘোঁতন। পেটমোটা বাজারের ব্যাগটা সামলাতে পারছিলেন না। হেসে ফেলে
বললেন--‘ছুটি উপভোগ করছ, অথচ জানোনা কিসের ছুটি? আজ রাখী পূর্ণিমা!’

জানতে বয়েই গেছে বিশুর। রাখী পূর্ণিমা বা ভাইফোটায় তার বাজারে মন্দা! যেটা জরুরী
নয়, সেটা জানতে হবে কেন? সে রাখীপূর্ণিমাকে গুলি মেরে বলল--‘আপনার হাতের
ব্যাগটা...’।

--‘যদি ধরতেই হয়, তবে ঘোঁতনকে ধরো। বড় ছটফট করছে। সামলাতে পারছি না’।

বিশু সাবধানে কোলে তুলে নিল ঘোঁতনকে। সে সদ্য সদ্য দাঢ়ি কামিয়েছে। গাল থেকে
ভুরভুর করে আফটারশেভের খুশবু আসছিল। সেই গন্ধ শুঁকেই ঘোঁতনের নোলায় জল চলে
এসেছে বোধহয়। ব্যাটা কুঁইকুঁই করতে করতে তার গাল একচোট চেঁটে নিল। তার ঠান্ডা,
ভেজা নাকটাকে একহাতে চেঁপে ধরে বিশু বলল--‘ব্যাপার কি কাকু? আজ যে দেখছি
স্পেশ্যাল বাজার!’

--‘স্পেশ্যাল?, তিনি হাসছেন--হঠাতে এমন মনে হল কেন?’

--‘ইলিশের ন্যাজ আর পাঁঠার মাংসের প্যাকেটটা চোখে পড়ল কি না!’

--‘ও! হারাধনকাকু বললেন--‘ইঙ্গিতারা এসেছে। জামাই এখন সুইটজারল্যাণ্ডে সেট্ল্ড।
আসার তেমন সুযোগ পায় না। এবার মাসখানেকের ছুটি নিয়ে স্টান কলকাতায়। গত
মঙ্গলবারই এসে পৌঁছেছে যাদবপুরের বাড়িতে। আজ এ বাড়িতে এসেছে। বলেই মৃদু হেসে
যোগ করলেন--‘জামাই বাবাজী বলে কথা। খাতির তো করতেই হবে।’

খাতির তো বন্তা হ্যায়! ইঙ্গিতাদিকে বিয়ে করার জন্য এবং প্রায় দু'বছর সহ্য করার জন্য খাতির শুধু নয়, একটা নোবেলও ওর প্রাপ্য! ইঙ্গিতাদির বরের চেয়ে বড় শান্তির দৃত আর কেউ হতেই পারে না! হিটলার আর মুসোলিনীকে নিয়ে একসাথে ঘর করার চাপ তো নেহাঁ কম নয়! ইঙ্গিতাদি যতদিন অবিবাহিতা ছিল, ততদিন ছাতে কাকচিলও বসতে পারত না! ঝগড়া করার আর্টটা দারুণ জানত! রিকশাওয়ালাকে আট আনা কম দেওয়া থেকে শুরু করে, ডাঙ্কারের প্রেসক্রিপশনে রোগিনীর বয়েস লিক্ করে দেওয়া—সব ইস্যুতেই গলাবাজীতে সে পয়লা নম্বর। পারলে বাতাসের গলায় দড়ি দিয়েও ঝগড়া করে!

সেই ইঙ্গিতাদির যখন বিয়ে হল তখন বর বেচারিকে দেখে মায়া হয়েছিল বিশুর। মায়া হয়েছিল ইঙ্গিতাদির শাশুড়ির জন্যও। কেমন গোবেচারি মহিলা। বৌভাতের দিন তাঁকে দেখেছিল। মুখে একটি কথাও নেই। প্রায় বোবার মতই বসেছিলেন। যাক্, একদিক দিয়ে ভালোই। বোবার শক্র নেই। যুদ্ধের আগেই ইঙ্গিতাদি ওয়াক্তওভার পেয়ে গেল!

ও বাবা! কোথায় কি! কয়েকদিনের মধ্যেই ইঙ্গিতাদির গলাবাজীর চোটে শ্বশুরবাড়ির আশেপাশের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। বর বাড়িতে থাকে না, শাশুড়ি তো সাত চড়েও রা কাড়ে না। তাঁর গলাও শোনা যায় না। তবে মেয়েটা সারাদিন ঝগড়া করে কার সাথে! প্রতিবেশীরা একবার কৌতুহলী হয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারল। এবং যা দেখল তা অবিশ্বাস্য! ইঙ্গিতাদি প্রবল বিক্রমে তার শাশুড়ির সাথে ঝগড়া করছে! সেই শাশুড়ি, যার মুখে কোনও আওয়াজই নেই! কিন্তু আওয়াজ না থাকলে কি হবে! যেই বৌমা চেঁচিয়ে-মেঁচিয়ে, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, তখনই তিনি ভাবলেশহীন মুখে তাকে কিল, চড়, জুতো, ঝাঁটা তুলে তুলে দেখাচ্ছেন! মুখে কোনও শব্দ নেই। শ্রেফ হাতের ইশারা! তাতেই ফের ইঙ্গিতাদি হাউ-হাউ, দাউ-দাউ করে জ্বলে-পুড়ে বকে-ঝাকে একসা করছে!

বৌমা তো বৌমা! শাশুড়িও সুভানাম্বাহ!

এই আগ্নেয়গিরি পরিস্থিতি থেকে প্রাণরক্ষা করার জন্যই বোধহয় ইঙ্গিতাদির বর, অবনীদা ডাইরেক্ট সুইটজারল্যান্ডে গিয়ে বসেছে! আহা! কি জায়গা! চতুর্দিকে শুধু বরফ আর বরফ! ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা-কুল কুল। সহধর্মীনী ফায়ার হয়ে গেলে তার মাথায় দেড় কেজি বরফ ঢেলে দাও। ওঁ শান্তি... ওঁ শান্তি!

ঘোঁতন বোধহয় বিশুর আফটারশেভের লোভ এখনও ছাড়তে পারেনি। আক্ষরিক অর্থেই বিশুকে চেটেচুটে একসা করছে! ওর ইচ্ছে করছিল জন্মটার পাছায় ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে তিন লাথি মারে। অসভ্য কুকুর কোথাকার! খড়খড়ে জিভ দিয়ে ক্রমাগতই গালে পালিশ দিয়ে চলেছে! মোমপালিশ পেয়েছিস নাকি বে! এমন দরদ দিয়ে চাটছে যেন সে পুরুষ নয়, একটি চকচকে গোলগাল মিস ইউনিভার্স!

সে আলগোছে ঘোঁতনকে এক থাক্কড় কষিয়ে দেয়। কুকুরটা থাক্কড় খেয়ে ঘ্যাঁক করে উঠল। হারাধনকাকু চমকে ওঠেন—'কি হল?'

--'কিছু না কাকু'। বিশু সামলে নেয়—ঘোঁতন ট্যান খেয়েছে। আই মিন, বিরহ হয়েছে'।
--'মানে?'.

--'ঐ রাস্তা দিয়ে একটা সুন্দরী রাপ্চিক রোডেশিয়ান যাচ্ছিল। তাকে দেখেই...। বলেই
এমন দীর্ঘশ্বাস ফেলল, যেন ঘোঁতন নয়, সে-ই এখন পারলে চার পায়ে কান্ননিক সুন্দরী
রোডেশিয়ানটির পিছন পিছন দৌড়য়!

হারাধনকাকুকে চিন্তিত লাগে—ঠিক বলেছ। ঘোঁতনটারও কিছু করার দরকার! আজকাল
কেমন উদাস উদাস হয়ে যাচ্ছে। ঠিকমত খাচ্ছে না। সবসময়ই ঝিমোচ্ছ...।
বিশু অবাক হয়ে ঘোঁতনের দিকে তাকায়! আরে গুরু, তুমিও লাইনে এসে পড়েছ নাকি!
তোরও দেখছি আমার মতই ছেঁড়া চপ্পল দশা! কিন্তু ঝিমুচিস কেন বস্? বড়ি ধরেছিস্
নাকি?

ঘোঁতন তার দিকে জুলজুলিয়ে দার্শনিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভাবটা এমন-- যেন বলছে,
কি চাপ বলো দিকিন! জীবনে খালি কতগুলো শুকনো হাড়! মেয়ে নেই... মেয়ে
নেই... মেয়ে নেই...। মেয়ে ছাড়া আর সবই মায়া! এমনকি মুর্গীর জরুর ঠ্যাঙ্টাও! এই
জীবন নিয়ে কি করি! এই ঘৌন-জীবন নিয়ে কি করি! কুকুর বলে কি মানুষ নই! আমার
কি চুলকুনি হয় না! আনু কি শুধু তোমাদেরই আছে!

আহা রে! বিশুর মায়া হয়। অবলা জীব। যাক্, মেয়ে না দিতে পারি, আফটারশেভটা তোকে
দিয়েই দেব। আরাম করে চাটিস্। বেচারা! ভগবান আবার তোকে সবক' টাই পা দিয়ে
রেখেছেন। একজোড়া হাতও দেননি যে মাস্টারবেট করবি! আয়, দুই দেবদাস গলাগলি
করি।

ঘোঁতনকে জড়িয়ে ধরতেই সে চটাস্ করে কথা নেই বার্তা নেই বিশুর ঠোঁট চেঁটে দিল।
হতভাগা! ফ্রাস্টু খেয়ে খেয়ে ওর মাথাটাই গেছে। বিশু আরেকটা থাক্কড় বসাতেই যাচ্ছিল।
তার আগেই হারাধনকাকু বললেন—'এতদূর যখন এলে তখন ইঙ্গিতার সাথে একবার দেখা
করে যাও। ও খুশি হবে'।

আলবাংৎ! দেখা করবে না মানে! ইঙ্গিতাদিকে দিয়েই তো তার নারী-উদ্ধার প্রকল্পের 'জয়
গণেশ' হয়েছিল। পুরনো কাস্টমারকে কি ভুলে যেতে পারে বিশু! মনে পড়ে যায় সেই
চিলেকোঠার সিনটা। জটায়ু থাকলে আরেকখানা রোমাঞ্চকর উপন্যাস লিখে ফেলতেন।
চিলেকোঠায় চোরাবালি! চোরাবালি বলে চোরাবালি! এমন নাকানিচোবানি খেয়েছিল যে,
তারপর প্রায় একহাত্তা তার ঘুমই হয়নি! শ্বাসে ইঙ্গিতা, স্পন্দনে ইঙ্গিতা, পাশবালিশে
ইঙ্গিতা! প্রথমবার কৌমার্যকে ঘেঁটে 'ঘ', করে আহ্লাদে প্রায় পাউডার হয়ে গিয়েছিল। কল্পনায়
ইঙ্গিতার বুকের ভাঁজে, খাঁজে খাঁজে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কিন্তু পাউডারের কপাল! ঠিক তিনমাস পরে 'ফুঁ' করে উড়িয়ে দিয়ে ঝুকঝাকে ওপেল
অ্যাস্ট্রায় চড়ে শশুরবাড়ি চলে গেল ইঙ্গিতাদি। কোথায় পাউডার আর কোথায় ওপেল
অ্যাস্ট্রা! ওপেল অ্যাস্ট্রার ঝলসানিতে সেদিন বিশুর বুকের ভিতরটা অ্যাশট্রে হয়ে গিয়েছিল।
হৃদয় এমনই একটা বস্ত যা পুড়লে ধোঁয়া ওঠে না! গন্ধও পাওয়া যায় না! শুধু রাবণের
চিতার মত চিড়বিড়ে জ্বলুনিতে জ্বলতেই থাকে।

সবকথা শুনে পাড়ার ব্যায়ামবীর বাবনদা, তথা রাবণদা হেসেছিল। তাকে পাড়ার ছেলেরা
পিছনে 'লো বাজেটের অসুর' বলেও ডাকে। হাই বাজেটের অসুরগুলো বেশ চিকনা হয়।
আর লো বাজেটের অসুরগুলো যাচ্ছেতাই। রাবণদার চেহারাটাও অনেকটা তেমনই। ঝাঁকড়া

ঝাঁকড়া চুল, পাকানো গৌঁফ, মোষের মত গায়ের রঙ আর লাল লাল আলুচেরা চোখ—সব
মিলিয়ে মূর্তিমান যমদূত! কিন্তু আদতে অমন কড়া চেহারার লোকটাও দন্তরমত দার্শনিক।
পিঠে হাত রেখে বলেছিল—‘বুঝলি, হৃদয় হচ্ছে ফিনিক্স পাখির মত। হ্যারি পটারে দেখিস্তি? ফিনিক্স
আসলে মরে না। পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পরে, সেই ভস্ম থেকেই আবার জন্ম
নেয়। মানুষের হৃদয় ও তাই। পুড়ে যাওয়ার পরেও খতম হয় না। ফের সেই ছাই থেকেই
ধুকপুক করতে করতে বেঁচে উঠে নতুন হৃদয়। আবার জ্বলার জন্য প্রস্তুতি নেয়।’

ঠিকই বলেছিল রাবণদা। ইঙ্গিতাদির সাথে দেখা করার কথা ভাবতেই তার ছাই হয়ে যাওয়া
বুকের পাঁজরের ভিতরে কি যেন একটা ধুকপুক করে উঠল। বোধহয় নতুন হৃদয়টা জন্মেছে।
আর তার কি ধুকপুকানি। হৃদয় নয়, যেন টারবাইন! কয়েকশো হর্সপাওয়ারে রঞ্জ ছাড়িয়ে
দিচ্ছে সারা শরীরে। এই স্পিডে যদি বাড়ির পাম্প চলত তাহলে একশো তলা অবধি জল
অনায়াসে উঠে যাওয়াও অসম্ভব নয়! দুঃখের কথা আজকালকার পাম্পগুলো নেহাতই
অপদর্থ। কলের তলায় বালতি পেতে শ্রেফ একখানা কালী সিঙ্গির ‘মহাভারত’, নিয়ে বসে
পড়ো। ঘুধিষ্ঠিরের স্বর্গগমনের আগে বালতি ভরবে না!

বুকের ভিতরে একটা অন্ধুর শিরশিরানি আর খচমচ নিয়ে হারাধনকাকুর পিছন পিছন
বাড়িতে চুকল বিশু। একসময় এই বাড়িতে তার নিত্য আনাগোনা ছিল। আজও মনে পড়ে
ইঙ্গিতাদির সেই বিখ্যাত শিফনের শাড়ি আর স্লিভলেস ব্লাউজ! সবসময়েই মেগা সিরিয়ালের
নায়িকা! ঘুম থেকে উঠলেও বোধহয় চুল এলোমেলো হয় না, দাঁত ব্রাশ করার সময়েও
চোখে কাজল আর টেঁটে লিপস্টিক থাকবেই। আর ‘ম্যায় ছাঁ না’র সুস্মিতা সেনের
কেমিস্ট্রির পাঠ বোধহয় ইঙ্গিতাদির শাড়িগুলো সব আগেই পড়ে ফেলেছিল। প্রথম যেদিন
বাজারে দেখা হয়েছিল তখনও বিশু নিরেট হরলিকস বেবি। ফলের দোকানির সাথে দৱ নিয়ে
ঝগড়া করছিল ইঙ্গিতাদি। যেই না একটু উত্তেজিত হয়েছে অমনিই এক কেলো! সড়াৎ করে
বুকের আঁচল খসে পড়ল। ইঙ্গিতাদির সেদিকে খেয়ালই নেই। সে একটা কমলালেবু তুলে
নিয়ে তর্ক জুড়েছে—‘সাইজ দেখেছেন?’

দোকানি হাঁ করে অন্য কমলালেবু দেখতে দেখতে বলল—‘অ্যাঁ! ... হ্যাঁ! ... দেখছি! ’

--‘এই সাইজ দেখলে কারুর ভঙ্গি আসে?’

ভঙ্গি আসে না, তবে লোভ আসে! সে কথা দোকানি আর বলল না। বরং টেঁক গিলে
বলে—‘কত সাইজ?’

--‘আরও বড় সাইজের মাল দেখান।’

দোকানি বেচারা তখন ফল-টল ছেড়ে অনেক উপরে উঠে গেছে। হয়তো বায়রন, শেলি,
কীটসদের সাথে গজল্লা শুরু করে দিয়েছে। কোনমতে বলল—‘এর থেকে বড় সাইজের মাল
আমি তো দূর, আমার বাপ-ঠাকুর্দা-চোদপুরষেও দেখেনি।’

বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল ইঙ্গিতাদি। বিশুটা আকাট গর্দভের মত পিছন থেকে
আঁচলটা তুলে দিয়ে বলল—‘দিদি, আপনার আঁচলটা নিয়ে যান।’

ইঙ্গিতাদি কেমন যেন ঝিরিঝিরি হাওয়া মার্কা চোখে তাকিয়েছিল তার দিকে। একটু
রহস্যমাখা হাসি হেসে বলেছিল—‘থ্যাক্স ইউ! ’

সেই ইঙ্গিতাদি! যে কোনওদিন শিফনের শাড়িতে পিন করত না! যে ঝগড়া করলেই বুকের আঁচল খসে পড়ে যেত! যে মেগাস্টিনিসকে বাঁকিয়ে বলতো-ম্যাগাস্টিনিস! যার বাড়ির চিলেকোঠায়...আঃ!

বাড়ির ড্রয়িংরুমে বসে এসব কথাই ভাবছিল বিশু। মাথার উপরে ফ্যান চললেও এসি'র ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমেজ টের পাছে। এটা সম্ভবত নতুন আমদানি হয়েছে। আরও অনেক কিছু নতুন দেখতে পাচ্ছে সে। দেওয়ালে এক মহিলা খোলা পিঠ দেখাচ্ছেন। তার পাশে বেশ নাছবুদুড়ি গণেশ। আসবাবপত্র সব লেটেস্ট ফ্যাশনের। বোঝাই যাচ্ছে এ বাড়ির গণেশ দিলখোলা!

--'আ-রে বিশু!, আচমকা একটা পরিচিত স্বর-কতদিন পর!'

বিশু উত্তসিত দৃষ্টিতে মুখ তুলে তাকাল। কিন্তু দেখেই ব্যোম্কে গেছে! এ কে! এটা কে! উর্ধ্বাঙ্গে স্যান্ডো গেঞ্জি! হারাধন কাকুর নাকি! না অবনীদার! কোমরের সবচেয়ে নীচের বিপজ্জনক অংশ থেকে একটা শর্টস ঝুলছে! উন্মুক্ত নাভি! তাতে আবার একটা ড্রাগনের ট্যাটু! এক্সুনি বুঝি নেমে এসে জ্বালিয়ে দেবে! ছেট করে ছাঁটা চুলে সোনালী রঙ করা! এক হাতে জ্বলন্ত সিগ্রেট! অন্য হাতে গ্লাসের মধ্যে সন্দেহজনক তরলবস্ত!

--'ই-ই-ই-ইঙ্গিতাদি....! তুমি!'

ইঙ্গিতাদির ব্রিটনি স্পিয়ার্স সংস্করণ তার সামনে এসে মখমলের মত পা দুটো মেলে বসল--'হাঁ রে! কেমন আছিস?'

বিশু তখন বীতিমত ঘামছে। কোনমতে বলল--'এ সিটা একটু বাড়িয়ে দেবে পিজ?'

ও.

--'হ্যালো'?

--'হ্যালো। পুঁটিরাম নার্সারী?'

ওপ্রান্ত থেকে এমন একটা অন্তর্ভুক্ত নাম শুনে ব্যায়ামবীর রাবন, তথা বাবন ঘাবড়ে গেল। পুঁটিরাম নার্সারী! এমন নামের কোনও নার্সারী আছে নাকি! সে আমতা আমতা করে বলে--'না...এটা তো নার্সারী নয়। আপনার বোধহয় ভুল হচ্ছে'।

--'সে কি!', ওপ্রান্ত থেকে ব্যথিত স্বর ভেসে আসে--'এমন বলতে পারলেন আপনি? আমার ভুল হচ্ছে না! আপনারই ভুল হচ্ছে'।

তার চোখ প্রায় ঢ়াঁও করে চাঁদিতে উঠে পড়েছে। অনেকটা চোখওয়ালা নারকোলগুলো যেমন হয়, তেমনই চাঁদি ছুঁয়ে পিট্টপিট্ট করে তাকিয়ে থেকে সে কিছুক্ষণ ভাবল। তার কি করে ভুল হয়? এটা তার নিজের বাড়ি। নিজের ফোন। নিজের নম্বর। এবং সে খুব ভালোভাবেই জানে যে এটা কখনই পুঁটিরাম নার্সারী নয়--হতেই পারে না!

সেকথা বলতেই ওপ্রান্তের লোকটা কনফিডেন্টলি বলল--'পুঁটিরাম নার্সারী আছে। আপনি জানেন না।'

--'আমার বাড়ি-- আর আমি জানি না!', বিরক্ত হয়ে বলল বাবন।

--'না জানেন না। আপনার বাড়ির সামনে একটা পুকুর আছে। তাই না? এখন বলুন সেটাও জানেন না!'

--'না, জানি। আছে।'

--'তবে? তাহলে পুঁটিরাম নার্সারীও আছে। আর তার প্রোপাইটার হরিকৃষ্ণ বাবুও আছেন। ফোনটা তাঁকে একটু দিন তো।'

--'হরিকৃষ্ণবাবু!' সে ফের অবাক। এই হরিকৃষ্ণবাবুটা আবার কে? ঐ নামে এই তল্লাটে কেউ আছে বলে তো মনে হয় না!

--'আচ্ছা। হরিকৃষ্ণবাবু না থাকলে...' লোকটা গলা মিহি করে বলল--'... হীরালালবাবুকেই একটু দিন!'

এতক্ষণে সব ব্যাপারটা একমুহূর্তে বুঝতে পারল বাবন। লোকটা আদৌ কোনও পুঁটিরাম নার্সারী বা হরিকৃষ্ণবাবুকে খুঁজছে না। ঐ হীরালালবাবুর খোঁজ করাই তার উদ্দেশ্য! সে একেবারে তেলেবেগুনে জুলে উঠে অশ্বাব্য গালিগালাজ দিতে শুরু করল--'গুয়োরের বাচ্চা, হারামি, খান্কির ছেলে। হীরালালবাবুকে খোঁজা হচ্ছে! তোর গাঁড় না মেরে দিয়েছি শালা ...'

ও প্রাণে খিক্খিক্ করে চাপা হাসির শব্দ। পরক্ষণেই লাইনটা কেটে গেল। রিসিভারটা দড়াম্ করে রেখে দিল বাবন। পাড়ার বিচ্ছুচ্ছেগুলোর উৎপাতে তার প্রাণ যাওয়ার উপক্রম! প্রথম প্রথম এত গালাগালি দিত না সে। ফোনে কেউ হীরালালবাবুকে খুঁজলে সপাটে বলে দিত--'তিনি একটু আগেই দেহত্যাগ করেছেন। এইমাত্রই তাকে পুড়িয়ে আসছি।' কিন্তু ছেলেগুলো নাছোড়বান্দা। সকাল-সন্ধ্যা, দিন-রাত্রির খালি ফোন করেই চলেছে। কি? না, হীরালালবাবু আছেন? না, নেই। হীরালালের চোদ পুরুষ জাহানামে গেছে! ধৰ্ক থাকলে সেখানে গিয়ে খোঁজ বাঞ্ছেও!

বাবন যে 'হীরালালবাবু' নামটা শুনলেই ক্ষেপে লাল হয়ে যায়, রীতিমত হাইপার হয়ে ওঠে এটা প্রথম আবিষ্কার করেছিল প্লেটোনিক ক্লাবের পিকুল। এক নম্বরের বজ্জাত ছেলে। প্রথম প্রথম সে একাই ফোন করে খিস্তি শুনত। এটা তার একরকমের মনোরঞ্জন! পরে তার গলা চিনতে পেরে পিয়েছিল বাবন। তখন হারামজাদা গলা পালটে মেয়েদের গলায় কথা বলতে শুরু করল। শুরুতেই 'হীরালালবাবু' নাম বললে কেটে দেবে বলে প্রথমে একচোট ভুজুং ভাজুং দিয়ে নিত। তারপর সময়মত মোক্ষম পাঞ্চের মত মোক্ষম প্রশ্ন--'হীরালালবাবু আছেন?' বাবন রেগে গিয়ে রাজ্যের নোংরা নোংরা খিস্তির দোকান খুলে বসত। আর পিকুল ভারি মজা পেত।

এখন পিকুলের কাছ থেকে তথ্যটা ক্রমশই ছড়িয়ে পড়েছে। সবসময়ই ফোনটা বাজে। কেউ অফিসের ফাঁকে, কেউ কলেজের টিফিনে, কেউ আবার ক্লাব, বা দোকান থেকে ফোন করে হীরালালবাবুকে খোঁজে! এমনকি এস টি ডি, আই এস ডি করেও পার্সিক প্রশ্ন করে - 'হীরালালবাবু আছেন?'

ওরা জানে, যে করেই হোক মাকড়াটাকে হীরালালবাবুর নামটা শোনাতেই হবে। তাহলেই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত শিং উঁচিয়ে জগঘন্স করবে ব্যাটা! নোংরা নোংরা খিস্তি ঝাড়বে। আবার কেউ কেউ খিস্তির বন্যার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বলে--ও দাদা, কাল এগুলো হয়ে গেছে। স্টকে নতুন কিছু নেই?

বোঝো! একটা লোক রেগে লাল হয়ে যাচ্ছে, রাগে দাপাদাপি করছে--আর কয়েকটা লোক তাতে মজা পাচ্ছে! বাবন ভেবে পায় না, মানুষেরা মানুষকে ব্যথা দিয়ে এত আনন্দ পায়

কেন? এ যেন একটা বাঘকে খাঁচার মধ্যে তুকিয়ে তাকে সড়কির খোঁচা মারা। বাঘটা আর্তনাদ করবে। গর্জন করবে। কিন্তু খাঁচার মধ্যেই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মরবে। আর বাইরে কতগুলো লোক তা দেখে অস্তুত পৈশাচিক আনন্দ লাভ করবে! কি আশ্চর্য এই দেশ! কি আশ্চর্য মানুষের এই বর্ষর বিনোদন!

সে আপনমনেই পানীয়ের ফ্লাস্টা তুলে নেয়। আজকাল একটু বেশি মদ খাচ্ছে। মদ খেতে তার ভালো লাগে না। কিন্তু না খেয়েও থাকা মুক্তিল। রাতে কয়েক পেগ পেটে না পড়লে শুন আসে না। সবসময়ই অস্থিরতা তাকে তাড়া করে বেড়ায়....!

ফের টেলিফোনটা বাজছে।

বাবন জানে ফোন তুললেই কি হবে। তবু সে রিসিভারটা তুলল।

--'হ্যালো...আমার একটু জরুরী দরকার আছে'।

বাবন ক্লান্ত গলায় বলে--'বকুন'।

--'আমার একটা চাকরীর খুব দরকার। বাবা অসুস্থ। অ্যাক্সিডেন্টে ছুটো পা কাটা গেছে...'।

আরও কত কি বকবক করে বলে গেল লোকটা। বাবন হঁ হঁ করে শুনে যাচ্ছে। অবশ্যে কাজের কথায় এল লোকটা--সরি স্যার, আপনার নামটা জানা হয়নি। আপনিই হীরালালবাবু তো?'।

একডজন বাচ্চা বাচ্চা কাঁচা খিস্তি দিয়ে বলল সে--ওরে হীরালালের রসিক নাগর, আমি হীরালালের পোষা রেঙ্গির বাপ! বুঝেছিস শালা!,'

লোকটা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বলল--'আরে বাঃ! দারুণ মজার ব্যাপার তো! কাল আবার ফোন করবো'।

বলেই কুটুঁৎ করে লাইনটা কেটে দিল।

বাবন রাগে চিড়বিড় করতে করতে মদের ফ্লাসে উত্তেজিত কয়েকটা চুমুক দেয়। এই লোকগুলো তাকে কি ভাবে! সার্কাসের ক্লাউন! সামনাসামনি পড়লে সবক, টাকে দেখে নিত। ইয়ার্কি! দেখতে সে খারাপ হতে পারে। কিন্তু তার শরীরের ইস্পাতকঠিন মাস্ল্যগুলো একদম সলিড! এই 'চাই কিলো'র হাত একবার পিঠে পড়লে বুঝতে পারত কার সাথে পাঙ্গা নিয়েছে।

হংখের বিষয় ফোনে কিলোনোর উপায় নেই। থাকলে এতদিনে সবক, টাকে ভীমকেলিয়ে কীচক বানিয়ে দিত।

ভাবতে ভাবতেই তার মনটা টনটনিয়ে উঠল। থার্ড পার্সন প্ল্যারাল নাস্বারদের দোষ দিয়ে আর লাভ কি! সবচেয়ে কাছের মানুষটাই যে এমন দাগা দিয়ে যাবে, তা সে কখনও ভেবেছিল! অনিন্দিতা তাকে ছেড়ে চলে যাবে, তাও আবার ঐ বাপে খ্যাদানো, মায়ে তাড়ানো, ছয়টিকিবাবু হীরালালটার সঙ্গে পালিয়ে যাবে--এমন সন্তানার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি বাবন। অনিন্দিতার কথা মনে পড়তেই বুকের ভিতরটা ল ল করে উঠল। অনিন্দিতা তার বিয়ে করা ডবকা বৌ। বাবনের নিজস্ব তিনটে জিম আছে। গোল আলুরা, আর প্যাঁকাটি মার্কা তেজপাতারা সেখানে হ্শহাশ করে ব্যায়াম করত। মেদ জিনিসটা ট্রাঙ্গফারেব্ল হলে কত সুবিধাই না হত। সাম্যবাদের নিয়ম অনুযায়ী হেঁকা আর সিঁড়িঙ্গে লোকগুলোর মধ্যে চর্বি

খানিকটা সমান ভাবে ভাগ করে দিলে বেশ কয়েকটা হষ্টপুষ্ট কেষ্ট পাওয়া যেত। কিন্তু তাতে একটা ইকোনমিক প্রবলেম আছে। জিম আর যোগা সেন্টারগুলো চলত কি করে?

যাই হোকু, সেই জিমের টাকায় দিব্য চলে যাচ্ছিল। সংসারে কোনও সমস্যা ছিল না। তবে অনেকদিন কেটে গেলেও কোনো ছানাপোনা হল না দুজনের। সমস্যা বাবনেরই ছিল। অনেক কিছু করেও যখন কিছু হল না, তখন অনিন্দিতার শখ হল থিয়েটার করার। চেহারাটা ভালো ছিল। অভিনয়টাও অল্পবিষ্ণুর জানত। আর এই থিয়েটারই হল যত নষ্টের গোড়া। এই কালো কুচকুচে ভৌদড়টার মধ্যে কি দেখল অনিন্দিতা কে জানে! ভিতরে ভিতরে আশনাই চলতে শুরু করল। তারপর অবশেষে একদিন পাখি ফুডুৎ! অনিন্দিতা চলে গেল। তার সাথে গায়ের গয়না-টাকাপয়সাও হাওয়া! রেখে গেল শুধু একটা চিরকুট। তাতে লেখা ছিল—‘আমি হীরালালের সাথে চলে যাচ্ছি। তোমার সাথে থেকে থেকে আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে। একটা সন্তানের মুখ এতদিনেও দেখাতে পারলে না! আজ একটুকরো সবুজ ঘাসের দিকে তাকিয়ে বলছি, আমি রিস্ক, ক্লান্স, ত্বক্ষার্ত! আমায় খোঁজার চেষ্টা কোরো না। করলেও পাবে না। আমি কি ডরাই সবুজ ভিখারী রাঘবে! প্যায়ার কিয়া তো ডরনা ক্যায়া! চিরকুটটা পড়ে বাবন হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায়নি। পরক্ষণেই ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শেষ চিঠিটায় অন্ত নিজের কথা লিখতে পারতে অনিন্দিতা! ঢ্যাম্না, হিজড়ে বলে গাল দিলেও কিছু মনে করতাম না। কিন্তু শেষপর্যন্ত ‘প্রফুল্ল’, ‘রক্তকরবী’, ‘মেঘনাদবধ’, আর ‘মুঘল-এ-আজ্ম’, থেকে ঝোঁপে ঝোঁপে কতগুলো লাইন লিখে দিয়ে গেলে! এই হতভাগা হীরালালের বাচ্চা তোমায় এমন নাটুকে বানিয়েছে যে একটা মৌলিক লাইনও মাথায় এলো না! ছ্যাঃ!

ভাবতেই মাথা গরম হয়ে গেল তার। কতবার ভেবেছে ভুলে যাবে। হয়তো এতদিনে ভুলেও যেত। কিন্তু এই ফোনগুলো কিছুতেই ভুলতে দেয় না। অমোঘভাবে কিড়িং কিড়িং করে বাজে। আর ফোন ধরলেই অন্য প্রান্ত থেকে উদ্যত প্রশ্ন—‘হীরালালবাবু আছেন?’

লোকগুলো মজা পায়। কিন্তু বোঝো না, প্রত্যেকবার এই নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতরে তির্ক্তির করে রক্ষণ হয়। একটা ভীষণ জ্বালা তিড়িক্ তিড়িক্ করে ওঠে। মরে যেতে ইচ্ছে করে বাবনের। কিন্তু কোনওদিনই মরা হয় না। আসলে মরার সাহসই নেই। বেঁচে থাকার সাহসও নেই। তাই বোতলকে আশ্রয় করে রোজ রাতে জীবন-মৃত্যুর মাঝাখানে রোজ লাট খায় বাবন। ভরপেট মাল খেয়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। এলোমেলো পায়ে হাঁটে। পাশ দিয়ে হৃশহৃশ করে চলে যায় লরি, ট্যাক্সি। মোটা মোটা টায়ারগুলো তাকে ছুঁই ছুঁই করেও ছোঁয় না। উদ্ধা মাতাল হয়ে রোজ বাবন মৃত্যুর সাথে ছোঁওয়া-ছুঁয়ি খেলতে বেরোয়! কোনওদিন হয়তো টায়ারগুলো ছুঁয়ে ফেলবে তার দেহ। অনিন্দিতা কি জানতে পারবে? অনিন্দিতা কি কাঁদবে? বোধহয় না।

আপনমনেই হেসে ওঠে বাবন। তারপর প্লাস্টা শেষ করে ঠক্ করে নামিয়ে রাখে টেবিলের উপরে। বেশ রাত হয়েছে দশটা বাজে। এখন তাকে বাইরে বেরোতে হবে। দরকারি কাজ আছে।

8.

--‘একটা শাড়ির দাম পাঁচশো টাকা! শ্লা- ঢ্যাম্নামি হচ্ছে?’

আপনমনেই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাবন দেখল এক ভদ্রলোক শাড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায় চিংকার করছেন। তার চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে পারিষদবর্গ। পরণে একটা হাতাগোটানো পাঞ্জাবি। স্টাইলিশ জিল। পায়ে বুট জুতো। দাঢ়ি-গোঁফের বালাই নেই। কামিয়েছেন, না মাকুল্দ-ঠিক বোৰা গেল না! হাতে পাইপ! সেই পাইপে গোটা দুয়েক টান মেরে বললেন--' এক হাজার টাকায় দিবি কি না বল্কি!

সে কথাটা শুনে ঘাবড়ে গেছে। আড়চোখে দেখল দোকানিরও একই অবস্থা! ভদ্রলোকের ইয়ার-দোষ্টদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল--'ইয়ে, মানে...ভাই, এক হাজার টাকাটা পাঁচশ টাকার চেয়ে বেশি'।

ভাই! তার মানে ইয়ার-দোষ্ট নয়! চ্যালা! মানে পন্ট্ৰ! আৱ চ্যালাদেৱও কি চেহাৰা! বাবনকেও বলে 'ওদিকে যা'! লোকটা কে? উঠতি কোনও ডন নাকি! এতদিন তো লাটু-মণ্ডনের চ্যালাদেৱ দৰদবাতেই টেঁকা যেত না! লাটু অবশ্য নিজে বিশেষ অপাৰেট কৰে না। তাকে মাঝেমধ্যে রাস্তায় দেখা যায়। রীতিমত সুন্দৰ দেখতে! বেশ কঢ়ি কঢ়ি মুখ! টকটকে ফৰ্সা গায়ের রঙ! ছিপছিপে পাতলা চেহাৰা। একটা ষাঁড়ের মতন বাইকে চেপে হশহাশ কৰে চলে যায়। কিন্তু তার শাগরেদদেৱ উৎপাতেই প্ৰাণ যাওয়াৰ জো! তার উপৰ আবাৰ একটা নতুন এসে জুটেছে!

--'বেশি?', ভদ্রলোক একটু ভাবলেন--'ঠিক আছে তবে একশো টাকায় দে'।

--'একশো টাকা!', দোকানি একেবাৰে নীলচাষীদেৱ ভঙ্গিতে হাতজোড় কৰে ফেলেছে--'হজুৱ মা বাপ, আমোৱা শুয়োৱেৱ বাচ্চা। পাঁচশো টাকার জিনিস একশো টাকায় দিলে খাৰ কি?' ভদ্রলোক জুৎ কৰে পাইপে ফেৱ টান মাৰলেন। প্ৰথমে মনে হল সন্তুষ্ট হয়েছেন। পৰক্ষণেই ত্ৰুটি কৰে বাজখাই গলায় বললেন--'আবে ন্যাকাচোদা...কায়দা কৰে আমায় শুয়োৱ বলছিস্ক! হাৱামেৱ পিল্লা! এই পচা, দে তো আমাৰ চিক্নাটা...'

দোকানি পায়ে হমড়ি খেয়ে পড়ে--'হজুৱ, আপনাকে শুয়োৱ বলিনি। নিজেকে শুয়োৱেৱ বাচ্চা বলেছি'।

--'তার আগে কি বলেছিস্ক চিৱুট?', পচা ততক্ষণে চিক্না তথা একখানা ভোজালি এগিয়ে দিয়েছে। সেটা দোকানিৰ গলায় ছুঁইয়ে বললেন তিনি--'আমি যদি তোৱ মা-বাপ হই, আৱ তুই যদি শুয়োৱেৱ বাচ্চা হয়ে থাকিস, তবে আমি কি হলাম! অ্যাঁ?...মাজাকি মাৱছিস্ক? শ্বা...আজ তোৱ আসল যন্ত্ৰটাই কেটে দেবো...! বাড়ি ফিৱে মাগীৰ সামনে লুঙ্গি খুলে হাততালি দিয়ে নাচবি-হিজড়ে শ্বা!'।

--'ভাই', পিছন থেকে পচা এগিয়ে আসে--'ছেটভাই বলেছে পাড়ায় ঝাড়পিট-লাফড়াবাজি নয়। আবে চিৱুট, শাড়িটা এক পাতায় দিবি? না.....'

দোকানি হাঁউমাউ কৰে ওঠে--'না...না...কিছু দিতে হবে না হজুৱ। ওটা ফ্ৰি...।'

এতক্ষণে ভদ্রলোক হাসলেন। হেসে বললেন--'গুদ্ধ!'

বাবন সন্তুষ্ট! বাপ্ৰে! এ কি ভাষা! ভাষা না ডাস্টবিন! সে নিজেও শব্দগুলো ব্যবহাৰ কৰে। কিন্তু গালিগালাজ হিসাবে। যাৱ নৰ্মাল ভাষাই এই, তার গালিগালাজ কোন্ শৰেৱ হবে!

--'আঃ ভাই-ফের লোচা!', পিছন থেকে আরেকজন এগিয়ে এল--'গুদ
মানে...ইয়ে...ইয়ে...'। সে আঙুল দিয়ে কিছু একটা বোঝাল। তারপর বলল--'ওটা গুড!
গুড হবে'।

--'ওঃ!' ভদ্রলোক শুধরে নিলেন--'গুড, এবার একটা গামছা দে'।

বলতে বলতেই পিছন ফিরে চোখে সানগ্লাস চাপালেন। এই রাত দশটায় চোখে সানগ্লাস
চাপানোটা কেমন স্টাইল, সেটা ঠিক বোঝা গেল না। চ্যালা চামুভাদের বললেন--'ওকে
চারটে নীলপাতি দে। এসব কেসে বেশি কঙ্গুসি ঠিক না'।

বাবন খ, হয়ে গোটা ঘটনাটাই দেখছিল। হাতা গোটানো পাঞ্জাবি পরা, রাত্রে চোখে
সানগ্লাস দেওয়া, পাইপ খাওয়া ডন এই প্রথম দেখছে। সাঙ্গোপাঙ্গ সহ ভদ্রলোক তথা ডন
সাহেব চলে গেলে সে আন্তে আন্তে কাপড়ের দোকানির দিকে এগিয়ে গেল। সে বেচারি
চারশো টাকা পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু তখনও ঠক্ঠক্ত করে তার হাঁটু দুটো কাঁপছে!

--'উনি কে?', বাবন কৌতুহলী স্বরে জিজ্ঞাসা করে--'লাটু মন্তান নিজে বলে তো মনে হল
না! না অন্য কেউ'।

--'লাটু না'। দোকানি কাঁপাকাঁপা গলায় বলে--'উনি লাটুর গার্জেন'।

--'ও! লাটুর বাবা!'।

--'সর্বনাশ!', সে আধহাত জিভ কাটে--'বাবা কেন হবেন? উনি লাটুর মা!'।

বাবন প্রায় এক পাউন্ডের হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর আপনমনেই বলে--'মা
এত ডেঙ্গারাস! সেইজন্যই ছেলের এত দম!'।

--'ছেলে কে?', দোকানিও এবার বিশ্বরূপদর্শন করাল--'ছেলে কাকে বলছেন মশাই?'।

--'কেন? লাটু? উনি তো লাটুর মা'। বাবন সবিস্ময়ে বলে--'তাই না?'।

--'হ্যাঁ। উনি লাটুর মা। কিন্তু লাটু ওনার ছেলে নয়! মেয়ে!'।

হায় আল্লা! এ কি কল্পা! কয় কি মিলে! লাটু মন্তান...নবগ্রামের ত্রাস...মূর্তিমান
আতঙ্ক...যার নামে গোটা চতুর কাঁপে...সে নাকি মেয়ে!

--'মেয়ে ভাই'।

--'কেন? মেয়েরা কি ভাই হতে পারে না? মা আর মেয়ে গুভাগিরিতে ব্যাটাছেলেদেরও হার
মানিয়েছে'। দোকানি টাকাগুলো গুনে গুনে ক্যাশবাক্সে রাখতে রাখতে বলল--'দেখছেন না,
কেমন কতগুলো ষষ্ঠাকে পোষা বেড়ালের মত সাথে নিয়ে ঘোরে!'।

--'কিন্তু...লাটু...মেয়ে!'।

বাবনের চোখের সামনে যেন একটা কুমীর দাঁতে ক্লিপ আটকে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছে।
অথবা একটা বাঘ খুব মন দিয়ে লাল রঙের নখপালিশ লাগাচ্ছে। কিংবা একটা গভার নাকে
নথ লাগিয়ে...!

--'কোথায় থাকেন মশাই? জানেন না? লাটুর আসল নাম লতিকা! লাটু মন্তান হওয়ার
আগে ঐ নামই ছিল।' দোকানদার লাটুর ইতিহাস বিবৃত করে।

লাটুর বাপ ছিল নামকরা মন্তান। কিন্তু লোকটা গ্যাং ওয়ারে খুন হয়ে গেল। বাড়িতে রুকে
তাকে খুন করেছিল অন্য গ্যাংের লোকেরা। লতিকার বয়েস তখন দশ। তাকে নিয়ে খাটের
তলায় লুকিয়ে বসেছিল তার মা। খাটের তলার অন্ধকারে বসে সে সজল চোখে দেখেছিল

তার বাবাকে চপার দিয়ে কোপাচ্ছে অপোনেন্ট গ্যাঙের সর্দার নুট মঙ্গল। বাবার রক্তের ছিটে এসে লেগেছিল তার চোখেমুখে। কিন্তু মুখে টুঁ শব্দটিও করেনি। ভয়ে, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে, মায়ের কোলে মুখ গুঁজে বোবাকান্না কাঁদছিল।

নুট মঙ্গলকে চিনে রেখেছিল তার দু চোখ। নুটুর বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সঙ্গাত্তের নেশা ছিল। একরকমের বিকৃত ঘোনইচ্ছা বলা যেতে পারে। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই তার কাছে গেল লতিকা। তারপর নিভৃতে নুটুর নিজের ছুরি দিয়েই কোপের পর কোপ মেরে শেষ করল তাকে।

সেই প্রথম তার হাতে “মেহেন্দি” লেগেছিল। মাত্র দশ বছর বয়েসেই। হিংসাই তাকে হিংসা শিখিয়েছিল। নাবালিকা হওয়ার দরুণ তেমন শাস্তি তাকে দিতে পারেনি আইন। আঠেরো বছর অবধি জুভেনাইল কাস্টডিতে থাকার পর মুক্তি পেয়েছিল লতিকা।

এরপর লতিকা থেকে লাটু মন্ডান হতে তার সময় লাগেনি। ফ্রক, চুড়িদার ছেড়ে সে শার্ট-প্যান্ট পরল। চুল ছোট করে কাটল। হাতে চুড়ির বদলে চেইন। কোমরের বেল্টে চাকু, পিস্তল ছুটোই থাকে। ক্যারাটেতে ব্ল্যাকবেল্ট, শার্প শুটার! বাইরে থেকে ছিপছিপে চেহারা হলে কি হবে, চিতাবাষের মত তার ডোলে-শোলে! আঞ্চলে জ্বলন্ত সিগ্রেট! বাবার শাগরেদের জুটিয়ে নিয়ে সে আবার দল গড়ল। শক্তি আর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়েই পুরুষদেরও টেক্কা দিয়েছে। জীবন তাকে শিখিয়েছিল বেঁচে থাকতে হলে দাঁত নখ থাকাটা জরুরী। নিরীহ প্রাণী হলে মাংসাশীদের শিকার হতেই হয়। শিকার হওয়ার চেয়ে শিকারী হওয়াই পছন্দ করল লতিকা। তাই নারীদের লালিত্য, কমনীয়তা সব ছুঁড়ে ফেলে লতিকা ওরফে লাটু মন্ডান এখন মূর্তিমান আতঙ্কের নাম!

সব ঘটনা শুনে চুপ করে গেল বাবন। কিছু বলারও ছিল না। চুপচাপ এলোমেলো পায়ে এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে। আড়চোখে দেখল লাটুর মা তখন খই, আর হাঁড়ি কেনার দিকে মন দিয়েছেন!

সে খুব মন দিয়ে মহিলাকে দেখছে। এতক্ষণ একটা বিত্ক্ষা থেকে লক্ষ্য করার প্রয়োজন বোধ করেনি। এখন কি মনে করে যেন কৌতুহলী চোখে দেখতে লাগল। ছোট করে ছাঁচা চুল। শ্যামলা রঙ হলেও মুখে একটা তরতুরে কমনীয়তা আছে। মাঝে মাঝেই হাতের পাইপটায় টান মারছেন। লাটুর মত হিলহিলে নয়। বরং বেশ ভারি চেহারা। আর কষ্টস্বর! তার কথা না বলাই ভালো! ‘কষ্টে যেন বজ্জ লজ্জাহত’। খই ঠিক কিনলেন না। বলা যায়, বুক করলেন! দশকর্মা ভাস্তারের লোকটাকে শাসিয়ে বললেন—‘ সময়মত যদি না পাই, তবে তোর পুঙ্গি বাজবে, মনে রাখিস্’।

বাবনের কৌতুহল ক্রমশই বাড়তে থাকে। কিসের মার্কেটিং করছেন ভদ্রমহিলা! শাড়ি, গামছা, হাঁড়ি, খই....! পুজো? বিয়ে? না অন্যকিছু!

--‘খাটিয়া বুক হয়ে গেছে ভাই’। আরেকটা মুষকো এগিয়ে এসে বলল--‘ ধূপ, সেন্ট কিনে নিয়েছি, নার্সারিতে ফুলের অর্ডার দিয়েছি। গাড়ি কি বুক করবো? কোন্ গাড়ি নেবে? লরি? ম্যাটাডোর?’

--‘ধূ-উ-স পাগলাচোদা’। সম্মেহ ভঙ্গিতে বললেন তিনি--ওসব ফালতু চিজে যাবো না। ঐ যে কাঁচের গাড়িগুলো একেবারে বিন্দাস রাপচিক মাল রে, কি নাম?’

-- 'স্বর্গরথ ভাই?'

-- 'হ্যাঁ। ওটাই একটা বায়না কর। যেতে হলে রাজার মত যাবো শ্লা! তার সাথে তোদের জন্য একটা পেন্নায় বাস। কি যেন নাম?'

-- 'ভলভো। কিন্তু এত আগে কি ভলভো দেবে?'

মহিলা ছিক করে খুতু ফেললেন--' দেবে না মানে! দরকার হলে দুগনা রোকড়া দিবি!

পয়সা দেখলে নিজের নীচের ডাঙ্গাটাও দেবে, গাড়ি কি চিজ?'

আশেপাশের লোকগুলো খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল। বাবন তখনও কনফিউশনে কিসের মার্কেটিং হচ্ছে? ধূপ, ফুল, সেন্ট, খাটিয়া, গাড়ি—কি সর্বনাশ! কাউকে যমের দোরে পাঠানোর প্ল্যানিং হচ্ছে নাকি! তারই অন্তিমযাত্রার প্রস্তুতি! অ্যাঁ! এ তো ফুলটু জঙ্গিস কেস! ডনরা মানুষ খুন করে সেটা জানা ছিল, কিন্তু তার অন্ত্যেষ্টির বন্দোবস্তও আগে থেকে করে রাখে, এমন তো কোথাও শোনেনি! এমনকি স্বর্গরথের পিছন পিছন যাওয়ার জন্য ভলভোও বুক করছে। কেসটা কি?

মহিলার সাঙ্গেপাঙ্গদের মধ্যে একজনকে একটু নরমসরম মনে হচ্ছিল। সে তুলনায় একটু অল্পবয়স্ক। সদ্যই হয়তো দলে নাম লিখিয়েছে। সে ব্যাটা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে চুপচাপ সব দেখছিল। বাবন গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে তাকেই জিজ্ঞাসা করল--'ভাই, একটু শুনবেন?'

ছেলেটা তার দিকে ভাসাভাসা চোখে তাকাল--'আমি ভাই নই। রাম-লক্ষণ দুই ভাই, আর সব চুদির ভাই।' মহিলার দিকে আঙুল তুলে দেখায় সে--'এ যে ভাই!'

লেং হালুয়া! 'ভাই, বলে ডাকাও বিপদ! কি বলে ওকে ডাকবে ভেবে পায় না বাবন।

অনেক ভেবেচিত্তে বলল--'তা দাদা, কিসের মার্কেটিং হচ্ছে?'

বলতেই একেবারে হ্যাঁক করে কেঁদে ফেলল ছেলেটা! চোখের জলে, নাকের জলে একেবারে একাকার! গুভাদের এরকম সেন্টু খেতে খুব কমই দেখেছে! এ তো টেক্টাল ইমোশনাল!

ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে বেশ কিছুক্ষণ কেঁদে 'ফোঁ-ও-চ' করে সশব্দে নাক মুছে বলল সে--'বড় ফেলবার পরের মার্কেটিং হচ্ছে'।

তাহলে তো ঠিকই ধরেছিল বাবন! নির্ধাৎ কারুর লাশ ফেলার মতলব! সে গলা খাটো করে জিজ্ঞাসা করে--'কোনও মার্ডার কেস?'

ছেলেটা চোখের জল মুছতে মুছতে বলে--'না। ন্যাচারাল ডেথ'।

-- 'কার হল?'

-- 'হয়নি এখনও।' সে আরেকচোট ফোঁচ ফোঁচ করে উত্তর দেয়--'তবে হবে'।

-- 'কা-র?'

ব্যাটা আঙুল তুলে মহিলার দিকে দেখায়--'ভাইয়ের'।

কিছুক্ষণের জন্য বাবনের মনে হল তার মাথায় একটা সাইবার ঝিঁ ঝিঁ বসে গ্যাঁ-ও গ্যাঁ-ও করে ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ গাইছে। অথবা সে একটা কুয়োয় পড়ে গিয়েছে। অন্ধকার কুয়োর মধ্যে শ্যাওলা নয়, সর্বেফুল ফুটে আছে আর তার মধ্যে কাজল নাচছে--কুছ কুছ হোতা হ্যায়...। কিম্বা একটা লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে ফঁৎ ফঁৎ করে মাঞ্চুরিয়ান ভাষায় কথা বলছে, যার বিন্দুবিসর্গও সে বুঝতে পারছে না!

--'হাঁ টা বন্ধ করুন দাদা'। ছেলেটির গলা শুনতে পেল সে-'এত মশা মাছি, ধূলো বালির
মধ্যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে ডাব্ল ওয়াট লাগবে। খচা হয়ে যাবেন'।

এতক্ষণে খেয়াল হল যে তার চোয়াল 'বোরা গুহালু'র মতন ঝুলে পড়েছে! বোরা গুহালু
কখনও দেখেনি বাবন। কিন্তু নাম শুনলেই মনে হয় এমন জায়গায় সব বোরিং পার্কিংরাই
যায়। আর আলুর শেপের গুহা দেখে এসে ফাঙ্গা মারে।

যাই হোক, কোনমতে হাঁ টা বন্ধ করে সে বলে-'মানে?'।

ছেলেটি যা বলল তার মর্মার্থ অনেকটা এইরকম-

লাটুর মা-তথা বড় ভাইয়ের বুকে কি যেন হয়েছে একটা শিরা ক্রমশই ফুলতে শুরু
করেছে। মাঝেমধ্যে নাক দিয়ে খুব রক্তও পড়ে। বড় ভাইকে ছেট ভাই, মানে লাটু
অনেকবার নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিয়েছে কিন্তু হয় ভাই নিজেই পালিয়ে এসেছে, নয়
নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ প্রায় হাতজোড় করে সাবমিশন ফি এর ডাব্ল টাকা দিয়ে পেশেন্টকে
ফেরত পাঠিয়েছে। ভাই বেচারির দোষ কি! তার লাক্ষে বিরিয়ানি আর মুর্গ মুসল্লম না হলে
চলে না। রাতে মাত্র হাফ ডজন পরোটার সাথে, মাট্টন কষা, ঘুগনি আর রামের বোতল
ছাড়া ভাই চোখে অঙ্ককার দেখে! হাসপাতালের লাপসি তার পোষাবে কেন? তাই একদিন
কিছেন গিয়ে কুককে তারই হাতা খুন্তি শিলনোড়া দিয়ে অল্প করে পিটি দিয়েছিল।

আরেকবার কোন্ এক হতভাগা ডাঙ্গার ভাইকে অজ্ঞান করে বুকে কাটাকুটি করার তাল
করছিল। ভাই দুষ্টুমি করে অজ্ঞান করার মুখোশটা তার নাকেই দিয়ে দিয়েছিল। ওটা নেহাঁই
ছেলেমানুষী। কিন্তু হতচাড়া হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তা তো বুঝলই না, উলটে ভাইকেই ফেরৎ
পাঠিয়ে দিয়ে বলল-'যতদিনে ওঁর ট্রিটমেন্ট হবে, ততদিনে আমাদের একটা ডাঙ্গারও জ্যান্ত
থাকবে না। ওঁকে বাড়িতেই রাখুন। প্লিজ হাসপাতালে পাঠাবেন না। পাঠালেই পুলিশে ফোন
করবো'।

ভাই নিজেও জানে সে ছ'মাসের বেশি বাঁচবে না। বুকের শিরাটা ফেটে গেলেই কেস খতম।
কিন্তু মরার পর তাকে সজ্ঞার জিনিসপত্র দিয়ে যা তা করে শৃশানে পাঠানো হবে, তা তার
বহুত না-পসন্দ! তাই সে এখন খেকেই নিজের মৃত্যুর শপিং করে রাখছে। এমনকি শ্রাদ্ধের
কার্ডও পছন্দমত ছাপিয়ে ফেলেছে। শুধু ডেটাটা বসানো বাকি।

বাবন দেখল মহিলা দিব্যি হাসিমুখে শপিং করছেন। চ্যালাচামুভাদের সাথে রীতিমত হাসি
মশকরা করে প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কিনছেন। কেউ বলবে যে এসব আসলে তার নিজের
মৃত্যুরই শপিং!

নেশা করলে বোধহয় মানুষ বেশি সাহসী হয়ে পড়ে। অনেক পাঁচুরাম তখন নিজেকে শের খাঁ
ভাবতে শুরু করে। বাবনের ঘাড়ে বোধহয় চেঙিস খাঁ এর প্রেতাঞ্চা ভর করেছিল। সে টলতে
টলতে গিয়ে দাঁড়াল মহিলার সামনে-'শুনুন'।

চ্যালাবৃন্দ সন্দিক্ষ দৃষ্টিতে তাকে মাপতে শুরু করেছে। মহিলা অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে তাকে
দেখছেন। মুখে কিছু না বললেও তার দৃষ্টি যেন বলল-'প্রসিড'।

--'আপনার মরতে ভয় করে না?'।

শোনামাত্রই চতুর্দিকে হাঁ হাঁ রব উঠল। অন্তত হাফ ডজন চাকু কিস্বা চপারের ঘা খেয়ে
জুলিয়াস সিজার হয়ে যেত বাবন, বাঁচালেন বড়ভাই। হাত তুলে ধেয়ে আসা অস্ত্রকে
থামালেন। একটু বিস্থিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। যেন প্রশ্নের কারণটা বোঝার চেষ্টা করছেন।
বাবন তার পায়ের কাছে ততক্ষণে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়েছে। কি রোম্যান্টিক বসা! রোমিও
বোধহয় জুলিয়েটের সামনে এমনভাবেই বসেছিলেন। চোখছুটো সামনের নারীটির চোখে রেখে
বিড়বিড় করে বলল—‘আপনার মরতে ভয় করে না? আমার যে ভয় করে। আমার বাঁচতেও
ভয় করে! আপনার বাঁচতে ভয় করে না?’

অতবড় দোর্দঙ্গপ্রতাপ ‘বড়ভাই’ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন মাতাল লোকটার দিকে।
কেউ দেখল না, যে চোখে কখনও ভুলেও জল আসেনি, সেই চোখছুটোয় সামান্য রক্তিমাভা
জমেছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তার পদানত মাতাল লোকটা বিড়বিড় করে বলেই
যাচ্ছে—‘আপনার বাঁচতে ভয় করে না?... বাঁচতে ভয় করে না... বাঁচতে ভয় করে না...!’

৫.

যখন বিশু বড়ি খেয়ে সাঁচীস্তুপ হয়ে বসে আছে, আর বাবন লাটু-মস্তানের মায়ের পায়ে
মাতাল হয়ে ল্যাদ্ খাচ্ছে, ঠিক তখনই ক্লাবের ছেলেরা তাদের জরুরী মিটিং করছিল। বিষয়—
অসভ্য চোখ!

--‘বলো কি? ইন্টারন্যাশনাল দেবদাস বিশু! অথবা বৌ পালানো রাবণ!, পিকুল সুব্রতদার
কথা শুনে ঢোক গেলে—এই তোমার প্রিলিমিনারি সাসপেন্ট!,

সিগ্রেটে আয়েশ করে টান মেরে সুব্রতদা বলল—‘ঠিক তাই।’

--‘যাঃ!,’ পিকুলের বিশ্বাস হয় না—‘আমার মনে হয় না!’,

--‘তোর মনে না হলে কি হবে! সুব্রতদা একদম থার্ড আম্পায়ারের মত কনফিডেন্ট—
ওই দুটোরই একটা না হয়েই যায় না!’,

--‘কেন?’

--‘আরে, সাইকোলজি...সাইকোলজি...। বলতে বলতেই সুব্রতদা সোজা হয়ে বসে
রাকিং চেয়ারটাকে দোলাতে শুরু করেছেন। এখন তাকে শার্লক হোমস্ কম, মিস্ মার্পল বলে
বেশি মনে হচ্ছে! অনন মশাপ্রফ গায়ের লোম আর বুলেটপ্রফ গোঁফজোড়া না থাকলে দিবিয়
মিস্ মার্পল বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু সুব্রতদাকে ঐ দুটো ছাড়া ভাবা যায় না! ওকে
মশারা কামড়াতেও ভয় পায়। ক্ষিন তো নয়, শালা আমাজনের জঙ্গল! মশারাও কনফিউজ্ড
হয়ে যায়। কামড়ানো তো দূর, ওর গায়ে বসলেই এইসান লোমে জড়িয়ে মড়িয়ে একসা
হয়ে যায় যে ফুলটু চিকুনগুনিয়া কেস! করুণ সুরে ভনভন করতে করতে বেচারারা ফেরার
পথ খুঁজতে থাকে! কামড়ানো তখন মাথায় উঠেছে! আর গোঁফের কথা না বলাই ভালো!
মশা তো তুচ্ছ প্রাণী, বুলেট, চাকু—এমনকি বোফর্সের গোলাও ও গোঁফ ভেদ করতে পারবে
না!

সেই দুর্ধর্ষ সুব্রতদা আস্তে আস্তে বললেন—‘দ্যাখ্, ওরা কেউ মুনি ঝঁঝি নয়। আগেকার
দিনের মুনি ঝঁঝিদেরও সুবিধা ছিল। দিবিয় চোখাটি বুঁজে বসে থাকতেন। অঙ্গরারা যতই
নাকের সামনে ধেই ধেই করে নাচুক মনে মনে ভাবতেন—‘তুই মাগী সব ঝুলিয়ে নেচে মুঁ,
আমি শালা কিছুতেই চোখ খুলছি না!’, কিন্তু এখন সে সুবিধা নেই। টেলিভিশনের সামনে

চোখ বৌঁজার উপায় নেই! তুই যাবি কোথায়? চ্যানেল যতই বদলা, কোথাও মন্দিকা
শেরাওয়াত, কোথাও রাখী সাবন্ত জিনিসপত্র দুলিয়ে নাচছে। সেই সব দেখে ফ্রাস্টু খেতেই
হবে। তার উপর বিশের অবস্থা ভাব'। তিনি সিগ্রেটে শেষ সুখটানটা মারলেন—
‘ইন্টারন্যাশনাল দেবদাস। পারো আসে যায়, পারো বদলায়, কিন্তু কপাল বদলায় না! আর
রাবণের একেই বৌ পালিয়েছে। তার উপর তোরা দিনরাত লোকটাকে ফোন করে
হীরালালবাবুর নামকীর্তন শোনাচ্ছিস। এ পরিস্থিতিতে ফ্রাস্টুর চূড়ান্ত হয়ে কি করতে পারে?’
--‘কি করতে পারে?’ ইযুথ ক্লাবের হাবু বলল—‘বড়ি খেতে পারে, মদ খেতে পারে। বেশি
হলে ক্লু ফিল্ম দেখতে পারে’।
--‘ধূস্ গান্ডু! ক্লু ফিল্মেও এ ফ্রাস্টুর ইলাজ নেই। আরো গভীর ভাবে ভাব’। তিনি ভুরু
ছুটোকে প্রায় চাঁদির কাছাকাছি তুলে নাচাচ্ছেন—‘থিঙ্ক... থিঙ্ক...’।
হলোদা ফের ফস্ফস্ক করে বিসর্গ ছুঁড়তে যাচ্ছিলেন। তার আগেই তাকে থামিয়ে দিয়েছে
পিকুল—এসব রন্ধাঁর টেকনিক ছাড়ো মামা! আমরা সারাদিনরাত এক করে পটিপোজে বসে
থিঙ্ক করতে থাকি, আর তুমি বসে বসে থিঙ্কার বানাও! ওসব চলবে না গুরু। অত পাঁপড়
বেলতে পারবো না। সরাসরি বলো, কি বক্তব্য! তুমি কি থিঙ্ক করেছ?’
--‘খেলে যা! সব থিঙ্ক করা দেখছি আমারই কপালে!’ তিনি হেসে বললেন—‘বেশ, শোন্।
সেক্ষেত্রে একটা রাস্তাই আছে ক্লু ফিল্ম বা বই টই নয়, একেবারে লাইভ পানু দেখা। যেটা
বেডরুম বা বাথরুমে বেশি দেখা যায়।’
পাঁচু তিনি চারটে হিক্কা তুলে বলল—‘ও এম জি!’,
--‘ও এম জি!’, সুব্রতদা বললেন—‘এম জি মানে তো মহাগুরু। মহাগুরুকে ডাকছিস না
কি!’,
--‘না... না...’। পাঁচু এক্সপ্লেন করে দেয়—‘ও এম জি-হল ওহ মাই গড়!—এর
শর্টফর্ম!’,
--‘লেং হালুয়া!’, সুব্রতদার মুখ ঠিক ভাজা পাঁপড়ের মত হয়ে গেল—‘এই হল তোদের
দোষ! সবকিছুতেই শর্টকার্ট খুঁজবি! এমনিতেই বোজ পাত্রপাত্রীর কলামে—পঃ বঃ, উঃ পঃ
কঃ(উচ্চ পদস্থ কর্মচারী), কেঃ সঃ চাঃ(কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরি), হঃ হাঃ, ফুঃ ফাঃ—এর
ঠ্যালায় টিকতে পারি না, তার উপর তোদের এই যাচ্ছতাই শর্টফর্ম! সব কটা শালা পি
এস পি!’,
--‘পি এস পি!’,
--‘পরম সুবিধাবাদী পার্টি। এবার তিনি মুখটাকে শালপাতার ঠোঙার মত করে বললেন—
এই জন্যই ভালাগে না! হচ্ছিল একটা দরকারী কথা। তার মাঝখানে যত রাজ্যের শর্টহ্যান্ড
নিয়ে টপকে পড়ল।’,
--‘পিলিজ কন্টিনিউ...’। শাঁকালুদা আধো আধো উচ্চারণে আলোচনা জারি রাখতে
বললেন।
--‘লক্ষ্য করে দ্যাখ’,। সুব্রতদা বলতে শুরু করেছেন—‘এখনও পর্যন্ত যে ক’টা কেস
ঘটেছে, যেখানে যেখানে ঘটেছে—সবক’টাই রাবণ আর বিশে, দুজনেরই বাড়ির কাছাকাছি
মায়ার বাথরুম, শান্তিবৌদ্ধির বেডরুম, মজুমদার বাড়ির ছেলের বেডরুম— প্রত্যেকটা স্পট

ରାନ୍ତାର ଉପର। ଉଁକି ମାରତେ କୋନ୍ତ ଅସୁବିଧେ ନେଇ। ମଜୁମଦାର ବାଡ଼ିର ଛେଲେର ବୌଭାତେ ଦୁଜନୀଇ ନେମନ୍ତନ ଖେତେ ଏସେଛିଲ। ଆର ଯତଦୂର ଆମାର ମନେ ପଡ଼େ, ଦୁଜନେଇ ବିଶେ ରାତରେ ଦିକେ ଏସେ ହାଜିର ହେୟେଛିଲ'।

-- 'ସେ କି! ତୁମି ଜାନଲେ କି କରେ!'.

-- 'କ୍ୟାଟାରିଙ୍ଗେ ଦାୟିତ୍ବ ତୋ ଆମାଦେର ଉପରଇ ଛିଲ'। ତିନି ବଲେନ-- 'ବିଶେ ଏସେଛିଲ ରାତ ଏଗାରୋଟା ଚଲିଥେ, ଆର ରାବନ ପୌନେ ବାରୋଟାଯା। ଆମରା ତଥନ ଖାବାର ଦାବାର, ବାସନ-ପତ୍ର ସବ ଗୁଛେଛି। ଏମନ ସମୟ ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଏସେ ହାଜିର। ରାବଣ ପୁରୋ ବେହେଡ ମାତାଳ। ବିଶେଟୀଓ ବଢ଼ି ଖେଯେ ଟଲଛିଲ। ଖାବାର ଖାବେ କି, ପୁରୋ ଲାଟ ଖାଚେ! ତବୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବଲେ କଥା। ସୁଗନ୍ଧିଟା ଶେଷ ହେୟେ ଗିଯେଛିଲ। ଡିମେର ଡେଭିଲଟାଓ। ତବୁ ପୋଲାଓ-ମାଂସ କିଛୁ ବାଡ଼ିତି ଛିଲ ଏଇ ରଙ୍କେ! ମୋଦା କଥା, ଓରା ନେମନ୍ତନ ଖେୟେଛିଲ। ଆର ସବଚୟେ ଇନ୍ଟାରେସ୍ଟିଂ ବ୍ୟାପାର...'

ସୁବ୍ରତଦାର କଠ୍ଠ୍ବ ଏମନ ନାଟୁକେ ହେୟେ ଗେଲ, ଯେନ ଏଖନେଇ ଭୂତେର ଗଙ୍ଗୋ ବଲତେ ଶୁରୁ କରବେନ!

-- 'ଓରା ଦୁଜନେ ନେମନ୍ତନ ଖେଯେ ତଥନେଇ ଚଲେ ଯାଯି ନି। ଅନେକ ରାତିର ଅବଧି ଦୁଟୋ ଓଖାନେଇ ସୁରାହିଲ। ଏମନକି ଚିତ୍କାର ଚେଚାମେଚିର ଆଗେଓ ରାବଣ ଆର ବିଶେକେ ଐ ଜାନଲାର ସାମନେ ସୁରଘୁର କରତେ ଦେଖେଛି। କିନ୍ତୁ ଘଟନାର ପର ବେବାକ ହାଓୟା! ମାନେ, କଥନ ଯେ ପାତଳା ହେୟେ ଗେଛେ ଟେରଇ ପାଇନି। ତୋରା ଯା ବଲିସ୍, ଆମାର ସନ୍ଦେହ ହୟ, ଏ ଦୁଟୋର ଏକଟାରଇ କୀର୍ତ୍ତି ଏସବ!'
ନିଜେର ବକ୍ତବ୍ୟ ପେଶ କରେ ସୁବ୍ରତଦା ଚାପ କରେ ଗେଲେନ। ପିକୁଲ ଅନେକକଣ ଧରେ ଉଶଖୁଶାହିଲ। ଏବାର ବଲଲ-- 'କିନ୍ତୁ ଓରା ପାତଳା ହଲ କି କରେ? ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକକ୍ଷେତ୍ରେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଦୁଟୋ ଚୋଖ ଦେଖା ଗେଛେ। ମୁଖ କେନ ଦେଖା ଯାଇନି? ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନଯ, ଚୋଖଦୁଟୋଓ ଅସାଭାବିକ! ଯାରା ଦେଖେଛେ, ତାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକେରଇ ପ୍ରାୟ ଏକ କଥା। ଭୟକ୍ଷର ଚୋଖ!'

-- 'ଓସବ ଗଙ୍ଗୋ ଛାଡ଼'। ସୁବ୍ରତଦାର ଚଟପଟେ ଉତ୍ତର-- 'ଶ୍ରେଫ ଗାଁଜା ଆର ଗୁଲ! ଆମି ତୋର ବାଥରୁମେ ଗିଯେ ହଠାତ ଉଁକି ମାରଲେ ତୋରଓ ପିଲେ ଚମକେ ଯାବେ, ଆର ତୁଇ ଓ ବଲବି-- 'ଭୟକ୍ଷର ଚୋଖ'!

ପିକୁଲେର ମନେ ହଲ ସୁବ୍ରତଦା ଶ୍ରେଫ ଅନ୍ଧକାରେ ଟିଲ ମାରଛେ! କିନ୍ତୁ ମୁଶକିଲ ହଲ ଓର ବାତେଲା ହଜମ କରତେଇ ହବେ। ମାଝେମଧ୍ୟେ ମାଲଟା ଏମନ ଝୋଯାବ ଦେଖାଯ ଯେ, ମନେ ହୟ ଓ ନବଗ୍ରାମେ ଜଞ୍ଜିଇ ଭୁଲ କରେଛେ। ଇନ୍ଫ୍ୟାଟ୍ ଭାରତରସେ ଜଞ୍ଜିଇ ବିଶାଳ କ୍ୟାନ୍ଚାଲ କରେ ଫେଲେଛେ। ଆମେରିକାଯ ଜଞ୍ଜାଲେ ଏତଦିନେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟେର ଅୟାଡ଼ଭାଇସର ହେୟେ ଯେତ। ଓବାମାର ପାଶାପାଶି 'ଓ ମାମା'...

'ଓ ମାମା' କରେ ସୁରତ। ଆରଓ କି କରତ କେ ଜାନେ!

ଯାଇ ହୋକୁ! ଏଖନ କି କରଣୀୟ?

ସବାଇ ମିଲେ ଠିକ କରା ହଲ-- ଚାଁଦା ତୁଲେ ଏ ତମାଟେ ନାଇଟଗାର୍ଡ ରାଖା ହବେ। ଗୋଟାକ୍ୟେକ ସାବଜି, ପଁ ପଁ କରେ ହିସ୍ଲ୍ ବାଜିଯେ ଡାଙ୍ଗା ହାତେ ସୋରାଫେରା କରଲେ ବିଶେ କିମ୍ବା ରାବଣେର ଉଁକିବୁଁକି ବନ୍ଧ ହବେ।

ଏ ତୋ ରାତର ବେଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଲ। ଦିନେର ବେଳାଯ?

-- 'ହାମରା ଆଛିଃ କି କଥେ! ହଲୋଦା ଫେର ଖାଲି ଗ୍ୟାସେର ପାଇପେର ମତ ଫସଫସାଚେନ-- 'ବ୍ୟାନ ଦିଯେ ଦେଖିଃ ରଖ୍ଯ ଘାମ ଏଥ ଖରେ ଦେଖିଃ ହାମରାଇ ଫାହାରା ଦେଖିଃ। ଛୋଖେ ଛୋଖେ ରାଖିବୋଃ! ଥବୁ ମା-ଭୋନଦେର ଇଞ୍ଜଥ...'

ভোঁ: মাতৈঁ: ভৌঁ:ভোঁ:! বিদেশি সংস্কৃত ফের শুরু হয়ে গেছে দেখে সুন্দর বললেন—‘ দিনের বেলায় আমাদেরই একটু অ্যালার্ট থাকতে হবে। বাড়িতে, আশেপাশে নজরদারি করলেই যথেষ্ট’।

সমস্ত আলোচনা মাথায় করে বাড়ি ফিরল পিকুল। মাথায় গোটা আলোচনাটা বড় বেশি ফড়ফড়াচ্ছিল। তার উপর বাড়িতে দাদু আর ঠাকুর্দার ভয়াবহ ডিস্কাশন! সে তো ডিস্কাশন নয়, শব্দব্রহ্মের গুষ্টির পিণ্ডি!

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়! পিকুলের দাদুর বয়েস সাতাশি পেরিয়েছে, আর ঠাকুর্দা নৰই ছুঁইছুঁই! রোজ সকালে বিকেলে রাত্তিরে দুজনে পাশাপাশি বসে ঠেক মারেন। সে গজন্মার কথাবার্তা অনেকটা এইরকম—

দাদু বলবেন—‘বেয়াই, নস্যে তেমন ঝাঁজ আর নাই’,

ঠাকুর্দা বলবেন—‘আমাদের জমিতে শস্য আর হল কই! সব পঙ্গপালে খেয়েছে!’,

—‘হ! রঙ্গলালের দোকানের নস্যটায় ঝাঁজ ছিল বটে। তয় এখন আর পাওয়া যায় না। সে নস্য লইয়া বড় হইলাম। এহন ঐহানে জোতার দোকান হৈছে!’,

দাদু জুতোকে ‘জোতা’ বলেন। প্রচুর খাবারদাবার রান্না হলে বলেন—‘আইজ দেহি খাওনের অ্যাক্রে জোতাবিষ্টি’।

খাওয়ার সাথে জুতোবৃষ্টির কি সম্পর্ক তা পিকুল জানে না। ছোটবেলায় দু-একবার বদমায়েশির জন্য জুতোপেটা খেয়েছে বটে। কিন্তু বেসিক্যালি জুতো খেতে একটুও ভালো লাগে না।

দাদুর ‘জোতা’কে ঠাকুর্দা ঠিক ‘তোতা’ শুনবেন। এবং প্রতিবাদ করবেন—‘না না... তোতা ফসল তেমন খায় না। তবে লক্ষাগাছ হলে তখন অল্লবিস্তর খায়। বেশিরভাগটাই কাকে খায়’।

‘কাক’ টাকে দাদু একেবারে জন্টি রোডসের মত ডাইভ মেরে ‘বাঘ’ হিসাবে ক্যাচ কট কট করেছেন। গণ্ডীর মুখে বলবেন—‘যা কইছেন। বাঘছাপ নস্যই হইল নস্যের রাজা!’,

অর্থাৎ বেশিরভাগ সময়ই সিনটা এইরকম। একজন নস্য নিয়ে কথা বলবেন, একজন শষ্য নিয়ে। একজন দাড়ি কাটা নিয়ে কথা বলবেন তো অন্যজন রোদে চাঁদিফাটা নিয়ে আলোচনা করবেন। একজনের বিষয় সাইকেল, তো অন্যজনের মাইকেল মধুসূদন! আর অন্তুত ব্যাপার, দুজন দিব্যি পাশাপাশি বসে খোশমেজাজে কথা বলে যান দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় নিয়ে। কেউ কাউকে ইন্টারাপ্ট করেন না!

পিকুলের ভালো নামও দুজন দুরকম জানেন। পিকুলের ভালো নাম আভোগ। বাবা আদর করে রেখেছিলেন। ঠাকুর্দা ও দাদু যখন নাতির নাম জানতে চেয়েছিলেন, তখন বাবা জানালেন, নাতির নাম—‘আভোগ’!

দাদু বললেন—‘‘অবোধ’! খাসা নাম হৈছে!’,

ঠাকুর্দা ভ্রুটি করে বললেন—‘এটা কি নাম রেখেছিস! ছেলের নাম ‘আপদ’!’,

আপদই বটে! অবশ্যে অনেক চেষ্টার পর তিনি বুঝলেন যে নাতির নাম ‘আবেশ’।

ফলস্বরূপ আভোগকে একজন ‘অবোধ’ নামে চিনলেন, অন্যজন—‘আবেশ’, হিসাবে।

কারণ? আর কি! দুজনেই বদ্ধ কালা! দুজনের একজনও কানে শুনতে পান না। পিকুলের মনে হয়, দুজনের একজনকে মুখ্যমন্ত্রী, এবং অন্যজনকে বিরোধী নেতা হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিলে চমৎকার হত। দুজনেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে যা খুশি বলে যেতেন। কেউ কারুর ভাষণ শুনতে পেতেন না। নো ঝগড়া-চেলামেলি-চাপানটোর। দেশে শান্তি বজায় থাকত।

আজ দুজনেই সিরিয়াস আলোচনা করছেন। দাদু আলোচনা করছেন সংবাদে সাহিত্য নিয়ে। আর ঠাকুর্দা সংসারে দায়িত্ব নিয়ে! দুজনেই দুজনের মুখভঙ্গী দেখে পরম আনন্দ লাভ করছেন। হাসি হাসি মুখে গল্ল করে যাচ্ছেন। আহা কি ঠেক! এমন ঠেক এ দেশে বেঁচে থাক!

পিকুল বাড়িতে ঢোকার আগে সুব্রতদার কথামতো চতুর্দিকটা একবার দেখে নিল। বলা যায় না। মালটার কথা সত্যি হলেও হতে পারে। হয়তো বিশে বা রাবণ অন্ধকারে ঘাস্পি মেরে কোথাও বসে আছে। তাদের বাড়ির উল্টোদিকেই রাণাজীকাকুদের বাড়ি। আর ডানদিকে পিয়ালীদিরা থাকে। দুই বাড়িতেই অল্লবয়সী সোমত মেয়ে আছে। দেখতে হলে হাইটেক মালই দেখা উচি�ৎ। এক্সপায়ারি ডেট ওভার হয়ে গেছে, এমন মডেল দেখে লাভ কি! অতএব বিশ বা রাবণের টার্গেট ঐ দুটো বাড়িই হতে পারে।

পিকুল বাইরে দাঁড়িয়ে টিকটিকিগিরি করতেই ব্যস্ত। এমন শখের কাজ সে আগে কখনও পায়নি। ভাবতেই নাক শুলশুল করে উঠল। কানের ভিতরে ‘ট্যাং ট্যারাং’ করে জেমস্ বন্ডের মিউজিক বাজছে। ভাবছিল, বাবার কালো রঙের ব্লেজারটাকে আপন করে নিলে কেমন হয়। সাদা টুপিটাকে একটু জুতোর কালির পালিশ লাগালেই কালো হয়ে যাবে। আর কালো ট্রাউজার তো বাবার আছেই। স্টোকেও বেমালুম মায়া করে দিতে হবে।

আরও অনেককিছুই ভাবতে যাচ্ছিল সে। তার আগেই ঠাকুর্দার ডাক শুনতে পেল—‘রাতের বেলায় ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?’

পিকুল মাথা চুলকিয়ে উত্তর দিল—‘এই, একটু নজর রাখছি।’

কি কুক্ষণে যে উত্তরটা দিয়েছিল! এক বুড়ো বলল—‘কি? গজল গাইছিস? তা একা একা গাইছিস কেন? এখানে এসে গা, আমরাও শুনি।’

আরেকজন বক্তব্য রাখল—‘হজম করতাছস্! কি হজম করতাছস্?’

পিকুল ক্ষেপে গিয়ে উত্তর দেয়—‘হাওয়া।’

--‘দাওয়ায় দাঁড়িয়ে গাইবি? তা বেশ তো। গা না। বারণ করেছে কে?’

--‘খাওয়া হজম করতাছিস? কর্ব। চ্যাতস্ ক্যান্?’

আর গজল! পিকুলের ইচ্ছে করছিল গজল নয়, গজাল নিয়ে এসে দুই বুড়োর কান সাফ করে! ভুল হয়েছে। বিধানসভায় নয়, এই দুই পান্নিককে রাষ্ট্রদূত করে পাকিস্তানে পাঠানো উচি�ৎ! কাশ্মীর সমস্যা দুদিনে মিটে যাবে। উপরওয়ালা ভগা এই ভদ্রলোকদের কানহানি করে নিরীহ লোকদের প্রাণহানির বন্দোবস্ত প্রায় করেই দিয়েছেন!

আপনমনেই গরগর করতে করতে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। এখন তার চাপের অন্ত নেই। কলেজের সেমিস্টার প্রায় দোখ পাকিয়ে ‘মারিকিরি পকাই দিব’ বলে তেড়ে আসছে। তার উপর সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে করতে প্রাণ গেল। অ্যাসাইনমেন্টের ভিড়ে জান কয়লা! এর চেয়ে আদিম মানব হয়ে যেতে পারলে ভালো হত। পড়াশোনার বালাই নেই।

জামাকাপড়-আন্ডারওয়ার কাচাকুচি করার কোন চাপ নেই। বিন্দাস পাতা-টাতা পরে বসে থাকো। নিতান্তই গৱ, ছাগল তেড়ে না আসলে পোশাক সলামত থাকবে। টারজান ঐ পাতার পোশাক পরে বলেই না লোকটাকে হ্যাবক সেক্সি লাগে! তার জায়গায় স্যান্ডোগেঞ্জি আর চার্ডি পরলেও সে সেক্সি অ্যাপিল আসে না!

পিকুল অনেকবার গুহামানব হতে চেয়েছে। কিন্তু প্রবলেম একটাই। গুহায় হাশু করাটা বেশ চাপের। সেখানে কমোড নেই। জলের কল বা টয়লেট পেপার নেই। পাতা-টাতা দিয়ে মোছা যায় বটে, কিন্তু যদি কপালদোষে পাতাটা বিছুটির হয় তাহলে একেবারে ছড়িয়ে ছিয়াশি!

এছাড়া গুহামানবেরা ডিওডের্যাবন্টও মাখে না। গুহামানব আর পিকুলের মধ্যে স্নান না করাটা কমন ব্যাপার। কিন্তু পিকুল ডিওডের্যাবন্ট লাগায়। নয়তো নিজেই নিজের গায়ের গক্ষে টিংকতে পারে না। একেবারে যাকে বলে ভোমরাখাসির গক্ষ!

সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে দোতলায় উঠতেই বাথরুমে ছপচপাত শব্দ শুনতে পেল সে। নির্ধারিত মা স্নান করছেন। এই এক মহিলা! শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা-ভীম সাবানই ভরসা! অন্য সাবান তিনদিনও টিংকবে না! কারণ মা দিনে তিন থেকে চারবার স্নান করেন। এবং বাথরুমে দুকে গণসঙ্গীত গাইতে গাইতে তালে তালে সাবান মাখেন। গণসঙ্গীতের বিটের সাথে সাথে সাবান ঘষা খায়। ফলস্বরূপ স্যান্টাক্লজের দাঢ়ির মত সাবানের ফেনা ছড়িয়ে টড়িয়ে একসা। ‘এই উজ্জ্বল দিন, ডাকে স্বপ্ন রঙিন...’ টিক্ চিক্ টিক্ চিক্ টিক্ চিক্। তার সাথে সাবান ঘষা খেয়ে আমসি হচ্ছে। বাবা অনেকবার বলেছেন—‘বাথরুমে দুকলেই তোমার গণসঙ্গীত মনে পড়ে কেন? রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারো না?’ বেশ স্নো, চিমে তালের টপ্পাঙ্গের গানও তো গাইতে পারো। এ-ই ক-রে-ছ ভা-লো নিঠুর হে-এ-এ-এ! আহা, কবিগুরুর গানে সাবানের ফুল সাধ্রয়! ’

কিন্তু গায়ে জল পড়লেই বোধহয় মায়ের ভিতরের প্রতিবাদী স্বত্ত্বা হাঁই-মাঁই করতে করতে জেগে ওঠে। অগত্যা সাবান বেচারির হাল খাণ্ডা হয়ে যায়।

আজও যথারীতি গণসঙ্গীত চলছে। মা চিৎকার করে গান গাইছেন—‘ওরা আমাদে-এ-র গান গাইতে দেয় না-আ-আ-আ! নিশ্চো ভাই আমার পল র-ব-স-ন...’

কে তাকে গান গাইতে দেয় না কে জানে! আর এই পল রবসনটাই বা কে! মা ফেসবুকে কোনও বিদেশি বয়ফ্রেন্ড জুটিয়েছেন না কি! বলা যায় না। যা দিনকাল পড়েছে!

ভাবতে ভাবতেই নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল পিকুল। কিন্তু যাওয়া হল না!

এতক্ষণ মায়ের গান নির্বিশ্বেই চলছিল। হঠাৎ থেমে গেল! পরক্ষণেই বিকট চিৎকার!

এ আবার কি! গানের অন্তরা না কি! এমন প্রবল চাপের অন্তরা কম্পিনকালেও শোনেনি পিকুল। কিন্তু মা আজকাল ফেসবুকে বিদেশি বয়ফ্রেন্ডের সাথে চ্যাটিছেন। হতে পারে বিদেশী গানে এরকম চেমামেলিওয়ালা অন্তরা থাকে! যত ইউরোপীয় সঙ্গীত শুনেছে সে বেশির ভাগই ‘হা-হা-আ-আ-আ-আ, অথবা হ-উ-উ-উ-উ...’ করে নানান ক্ষেত্রে চিৎকার চেঁচামেচি! এই যদি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের নমুনা হয়, তবে রোজ বিকেলে যে ব্যাটা মিহিদানা বিক্রি করতে আসে, সেও পাশ্চাত্য সঙ্গীত গায়। লোকটার ব্যাডলাকই খারাপ! আজ যদি ও ব্রিটেনে মিহিদানা বিক্রি করত তবে এতদিনে সঙ্গীত-সম্রাট হয়ে যেত!

এসব ভেবেই প্রথমে চিংকারটাকে বিশেষ পাতা দেয়নি সে। কিন্তু তারপরই মায়ের আকুল আর্তি ভেসে এল-পি-কু-ল, পি-কু-উ-উ-ল!'

নাঃ, এটা গান নয়। কিছু লোচা আছে!

--'কি ব্যাপার?' সে বাইরে থেকে উত্তর দেয়-'আরশোলা না টিকটিকি?'

--'কে যেন বাথরুমের জানলার কাছে.....'

কথাটা সবে মায়ের মুখ থেকে খসেছে। কিন্তু পুরোপুরি খসার আগেই পিকুল লাফ মেরে ছুটেছে ছাতের দিকে। শা-লা অসভ্য চোখ! এক ছেলের মায়ের বাথরুমেও ফিল্ডিং দিচ্ছে বাঞ্ছেত! তাও পিকুলের বাড়িতে! দাঁড়া, একবার ছাতে উঠে নিই, তাঙ্গর তোর একদিন কি আমার একদিন! কিলিয়ে কঁঠাল না পাকিয়েছি....!

প্রায় বিহুৎগতিতে ছাতে উঠে গেল সে। মালটা পাতলা হওয়ার আগেই ক্যাঁক করে চেপে ধরতে হবে! সে রাবণই হোক, কি বিশে! ঘুষি মেরে অন্ত দশটা উইকেট না উপড়েছে....!

মায়ের বাথরুমটা দোতলায়। কাউকে জানলায় উঁকি মারতে হলে নিদেনপক্ষে বাথরুমের জানলার নীচের কার্নিশে উঠতে হবে। সে যেই হোক, সহজে ভোগা দিতে পারবে না। পিকুল ছাতে উঠে নীচের দিকে ঝুঁকে তাকায়। হ্যাঁ-যা ভেবেছে একেবারে মলিকিউলে মলিকিউলে ঠিক। হারামজাদা নীচের কার্নিশে দাঁড়িয়ে আছে! কিন্তু উঠল কি করে! জলের পাইপ বেয়ে! সে কথা নেই বার্তা নেই, লোকটার মাথার চুল সবলে খামচে ধরে-আ-বে শালা! মাজাকি পেয়েছিস-অ্যাঁ? তোর বাপের নাম যদি খগেন না বানিয়েছি বাঞ্ছেত! লাইভ পানু দেখা হচ্ছে...শুরোরের বাচ্চা!'

নীচের লোকটা কাঁটামাট করে উঠেছে-মাথার চুল ছাড় পিকুল...লাগছে....!'

--'লাগছে? এখনও লাগেনি। তার ক্রিকেট ব্যাটটা হাতের কাছেই পড়েছিল। সেটা দিয়ে দুমাদুম কয়েক ঘা কষিয়ে দিয়ে বলল-তবে এইবার লাগবে। ডাব্ল ওয়াট! মাগীবাজ শালা!'

--'আঃ...আঃ...!' লোকটা কাঁত্রে ওঠে-নাক ফেটে গেল।

--'তোর বিচি ফাটিয়ে ছাড়বো...ওঠ শালা...উঠে আয়!'

কার্নিশের উপরের লোকটা মার খেয়ে আঁক আঁক করছে প্রবল ঠ্যাঙ্গানির মধ্যেই সে কোনমতে হাঁকপাঁক করতে করতে ছাতে উঠে এল। পিকুল ব্যাটটাকে গদার মত করে বাগিয়ে ধরে। মালটার জিওগ্রাফি পালটে না দিয়েছে আজকে...! রাবণ হোক কি বিশে! কাউকে ছাড়বে না!

এতক্ষণ লোকটাকে ঠিকমত দেখা যাচ্ছিল না। কার্নিশটা অন্ধকার ছিল। ছাতে একটা বড় আলো লাগিয়েছেন বাবা। এবার তার আলোয় দেখা যাবে কোন্ শালা মুহু কালা, করছে! কিন্তু লোকটাকে দেখা যেতেই নিজের বিচি মাথায় উঠে গেল পিকুলের! এ কে! এ তো কোনও শালা নয়! এ তো বাবা!

বাবা কোনমতে কাতরাতে কাতরাতে বলেন-এসব কি হচ্ছে পিকুল। কথা নেই বার্তা নেই, ব্যাটপেটা করছিস্ত! আঃ, নাকটা গেল আমার...!'

--'কিন্তু...কিন্তু....!', পিকুল ততক্ষণে ফুলটু হাকলা-তু...তুমি ওখানে কি করছিলে?'

বাবা কুঁইকুঁই করতে করতে বললেন—‘কি আবার করবো! আমার একটা পায়রা কার্নিশে ঘাপ্টি মেরে বসেছিল। শত ডাকাডাকিতেও আসছে না। বাজপাখি অ্যাটাক করেছিল। ডানাটা জখম হয়েছে। তাই আমি নিজেই নেমে ধরে আনতে গিয়েছিলাম। তার মধ্যেই তোর ব্যাটের ঘা....!’, বলতে বলতেই থেমে গেছেন। নাকের ব্যথা ভুলে গিয়ে কড়া গলায় বললেন—‘আর ওসব কি ভাষায় কথা হচ্ছিল? অ্যাঁ...এসব নোংরা ভাষা কোথা থেকে শিখেছিস?...কোনও ভদ্রদের ছেলেপুলে এই ভাষায় কথা বলে....!’
—‘না...মানে...ইয়ে...তোমাকে বলিনি...আসলে কি একটা যেন পড়ছিলুম...’।
পিকুল কান চুলকুতে চুলকুতে সুড়ুৎ করে কেটে পড়ল। এখন বাবার সামনে থেকে পাতলা হয়ে পড়া বিশেষ প্রয়োজন! একেই বাবার পোষা পায়রা ইনজিওর্ড! দিন রাত ছাতে উঠে এইসব পায়রাদের ‘আয়...আয়...’, করে গলা ফাটিয়ে ডাকেন তিনি। একটা জখম হয়ে পড়লেই গুঁফো ‘লেডি উইদ দ্য ল্যাম্প’, হয়ে যান। সেই পায়রার দুঃখে নিশ্চয়ই মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। তার উপর পে়ন্নায় ব্যাট দিয়ে তাকে ঠেঙিয়েছে পিকুল! উল্লাট খিস্তি দিয়েছে! বাবা কি রিভেণ্জ না নিয়ে ছাড়বেন!

৬.

রাতের বেলায় নগ্ন হয়ে বিছানায় শুয়েছিল ইঙ্গিতা। এ সি চলছে ঠিকই। তবু যেন গরম কমে না!

সুইটজারল্যান্ডের ঠাণ্ডাটাই এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে আজন্ম পরিচিত পরিবেশটাকেও অচেনা লাগছে। আগে রাত্রে হাউসকোট বা নাইটি পরে শুতে যেত। এখন যেন তাও গায়ে চড়ানো যাচ্ছে না! সুইটজারল্যান্ডের ঠাণ্ডা থেকে আচমকা এই গরমে এসে পড়লে প্রাণ হাঁসফাঁস করতে থাকে! মনে হয়, গায়ের চামড়াটাও খুলে রাখতে পারলে ভালো হয়। অবনী আজ এ বাড়িতে আসবে না। সে এখন ক’টা দিন যাদবপুরে থাকবে। এমনিতেই দুদিন এখানে থেকেছে বলে শাশুড়ির মুখ তোলো হাঁড়ি। আরও কিছুদিন হলে বুড়ি ফেটে চৌচির হয়ে যেত। ইঙ্গিতার বেশ মজাই লাগে। দ্যাখ্ কেমন লাগে! দেখবি আর জ্বলবি, মুচির মত ফুলবি! ইশারা করে করে ঝগড়া করা! এবার কর, কার সাথে ঝগড়া করবি! ভাবতেই মন খারাপ হয়ে গেল ইঙ্গিতার। ঝগড়া তো তারও আজকাল করা হয় না। অবনী যেন একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে—যে ঝগড়া করবেই না! মালটা কিছুতেই বোঝে না, ঝগড়া করাটা ইঙ্গিতার হবি! ইঙ্গিতা যা বলুক, অবনী সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে একমত হয়ে যাবো। যদি বলে—‘সোনা, দেখো, সূর্যটা কি সুন্দর উত্তর দিক দিয়ে উঠছে’। অবনী সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড় বড় করে বলবে—‘তাই তো ডার্লিং! আমি তো একদমই লক্ষ্য করিনি!’,

ইঙ্গিতা নাক কুঁচকে বলবে—‘তোমার মাথায় গোবর পোড়া! সূর্য কি কখনও উত্তর দিক থেকে ওঠে?’,

অবনীর চট্টজলদি জবাব—‘তাই তো! সত্যিই আমার মাথায় গোবর পোড়া। ইউ আর অলওয়েজ রাইট সুইটি’।

এই করেই তাকে ঠাণ্ডা করে রেখেছে লোকটা। ইঙ্গিতা ইজ অলওয়েজ রাইট। রঙ হওয়ার কোনও চাঙ্গই নেই! কারণ রঙ হলেই ঝগড়া হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা। এমন লোকের সাথে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়াও করা যায় না! তাই অমন সাধের হিটিকেই বিসর্জন দিয়েছে সে। ইঙ্গিতা শুয়ে শুয়ে ভাবছিল, সে কি আদৌ সুখে আছে! অবনী স্বামী হিসেবে ভালো, কোনও সন্দেহ নেই। টাকাপয়সার কোনও অসুবিধে নেই। তা সত্ত্বেও দামি মদ, দামি সিগ্রেট কবে ধরল সে! শখের মাঝখানে কোথাও অসুখ লুকিয়ে নেই তো! আজ তার এক পুরনো বান্ধবী দেখা করতে এসেছিল। প্রথমেই ইঙ্গিতাকে সে চিনতে পারেনি। তারপর প্রায় আকাশ থেকে পড়ে বলল—‘তুই বাড়িতে গেঞ্জি আর শর্টস্ পরে থাকিস! কাকু জানেন?’

লেং হালুয়া! যে লোকটা চোখে দেখতেই পায় না, সে বুঝবে কি করে যে ইঙ্গিতা গেঞ্জি পরেছে না লঁজারে! আর শর্টস্, গেঞ্জির মধ্যে খারাপ কি আছে! সে তো বিকিনি পরে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছে না! বাড়িতেই পড়ছে বাবা চোখেই দেখেন না। আর দেখার মধ্যে আছে কুকুরটা। সে দেখলেই বা কি এলো গেলো! আজকাল মেয়েরা গেঞ্জি চাইডি পরে ম্যারাথন দৌড়চ্ছে, লেংটি পরে রেসলিং করছে, সুইমিং কস্টিউম পরে সাঁতার কাটছে, তলাকাটা মিনিস্কার্ট পরে টেনিস খেলে ফ্রাস্টু বাড়াচ্ছে—হাজার হাজার লোক দেখছে, সে বেলায় দোষ নেই। যত দোষ সব ইঙ্গিতার বেলায়!

এই যে ভোলা মুদি লোকাট লুজ লুঙ্গি পরে রাস্তায় পেট বের করে দাঁড়িয়ে থাকে, সেটা বুঝি দোষের নয়! আটমাসের পোয়াতির মত ভুঁড়ি গিঁটের উপরে লম্লম্ করে! নাভির নীচে বিপজ্জনক লুঙ্গির অবস্থান! যে কোনও মুহূর্তে খসে পড়ে কেলোর কীর্তি করতে পারে। কই, তাকে তো কেউ বলতে যায় না—কি কান্তি ভোলাদা! মন্দির শ্রেণীওয়াতের ঘাগরার মত

করে লুঙ্গি পরেছ! ঐটুকুই বা রক্ষা করার দরকার কি! নাগা সন্ধ্যাসী হয়ে যাও না!’

যত ডায়লগ সব ইঙ্গিতার স্যান্ডোগেঞ্জি আর শর্টসের বেলায়! চমৎকার একটা ঝগড়ার ক্ষোপ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুত কান্তি, কাজে লাগাতে ইচ্ছে করল না তার। বরং শান্ত গলায় বলে—‘বড় গরম বো। গায়ে সুতোও রাখতে পারছি না!’

বান্ধবী কেমন বিটকেলে দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার দিকে। ফিস্ফিস্ করে বলেছিল—‘তুই মদ-সিগ্রেট খাস্ সেটা কাকু জানেন?’

বোরো! সবই কাকুকে জানাতে হবে! এখন বিয়ে হয়ে গেছে তার। তবু রক্ষে নেই। যতসব টিপিক্যাল মিডল্ক্লাস সেন্টিমেন্ট।

আশ্চর্য! পরমাশ্চর্য! এবারও ক্ষোপ পেয়ে কাজিয়া করল না ইঙ্গিতা। উলটে বোর হয়ে গিয়ে একটা আকাশপাতাল হাই তুলে বলল—‘আমি রোজ রাতে তোর অবনীদার পাশে ন্যাংটো হয়ে গুই। সেটাও কি কাকুকে জানাতে হবে? কি বলিস্?’

বান্ধবী কি উত্তর দেবে ভেবে পায়নি। ঢেঁক গিলে বলল—‘তুই ভালো আছিস তো ইঙ্গিতা?’ এই প্রশ্নটা শুনলেই আজকাল মাথা গরম হয়ে যায় ইঙ্গিতার। যত রাজ্যের ভ্যান্ডারা! নেকু নেকু খানকি মাগী সব! ভালো আছিস তো?’ আমি ভালো থাকলে তোর কি বে? আমি ভালো থাকলে কি তোকে নোবেল দেবে? আর যদি না থাকি তাতেই বা কি? তুই কি আমাকে ভালো থাকাবি! নেহাং ইঙ্গিতার ঝাঁট নেই—নয়তো জ্বলে যেত! ড্যাম ইয়োর ভালো থাকা!

কিন্তু ওসব বলতে পারল না ইঙ্গিতা। বরং কিছুক্ষণ চপ করে থেকে আরও গোটা কয়েক হাই তুলে বলল—‘তুই আরও কিছু বলবি?’

ইঙ্গিত স্পষ্ট। এবার তুমি ফোটো। বান্ধবী বুদ্ধিমতী। কেটে পড়ল।

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেসব কথাই ভাবছিল ইঙ্গিতা। আজকাল ঘুমের ওষুধ না খেলে তার ঘুম হয় না। আগে একটা করে ট্যাবলেট খেত। এখন দুটো করে খেতে হয়। অথচ একটা ছেট্ট, নরম সরম, ছুরমুর ছানা গোটা সিন্টাই পালটে দিতে পারত! তার নিজের ছানা! মা হতে চায় সে। কিন্তু সে সন্তানবন্ধন দূর অস্ত! অবনীর ক্ষমতা নেই!

চোখ বুঁজে ঘুমের প্রতীক্ষা করছিল সে। এমন সময়ই হঠাত একটা নরম কোমল রোমশ বন্ধ তার পা বেয়ে উপরে উঠে এল! তারপরই একটা কুঁই কুঁই শব্দ। একটা ভেজা নাক তার গালে এসে পড়ল।

--‘কে রে!’ ইঙ্গিতা চোখ মেলে দেখে একটা পরিচিত মুখ ঝুলজুল করে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

--‘ঘোঁতন! এতরাতে চড়ে বেড়াচ্ছিস যে!’, সে ঘোঁতনকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিল। ঘোঁতন তার নরম বুকের উপরে মাথা গড়িয়ে দিয়ে আরামসে চোখ বুঁজল!

বুকের উপর একটা তুলোর বলের মত নরম তুলতুলে জিনিস! বুক ভাঙা দীর্ঘশাস পড়ল ইঙ্গিতার। এমন একটা তুলতুলে জিনিসের আকাঞ্চ্ছাই তো ছিল তার। একটা ছেট্ট, ক্রিট্টি, কুঁচি কুঁচি পু-পুচকি পুতুল! লাল লাল ঠোঁট, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, দুর্দান্ত খাওয়ার সময় বিসমিলা খাঁয়ের সানাইয়ের মত প্যাঁ সুর ধরত। আবার দুদুন খাওয়া হয়ে গেলেই নাক মুখ কুঁচকে একটা পুঁচকুরি হাই তুলে, গালে হাম খেত। অর্থাৎ পুঁচলিটা এবার ঘুম যাবে! তখন শুরু হত দুর্বোধ্য গল্প বলা—‘তারপরে তো কট্টি শিশি সিঁটকি করেছে—তারপরে কি হয়েছে...? তারপরেতে নেংটি পিশি গক করেছে—তারপরে কি হয়েছে...?’ মায়ের মুখের দুর্বোধ্য বিটকেল গল্প শুনে সে কখনও চোখ গোল গোল করত। কখনও ফৌকলা মাড়ি বের করে একচোট হেসে নিত। তারপর ছেট্ট ছেট্ট আঙুলে মায়ের চুলের গোছা জড়িয়ে ধরে ঘুম যেত।

নাঃ—সে সুখ বোধহয় এ জীবনে কপালে নেই। জড়িয়ে ধরে ঘোঁতনের শরীরের উষ্ণতা নিতে নিতে হঠাত কান্না পেয়ে গেল তার। একটা ছেট্ট মানুষের জন্য লোভ বড় মারাত্মক! এ ইচ্ছের কোনও শেষ নেই। একগাদা টাকা, মদ, সিপ্রেট, ঘুমের ওষুধও এই ইচ্ছের মুখে লাগাম পরাতে পারে না।

এখন মনে হয়, অবনীকে বিয়ে না করে যদি ঐ ছেঁড়া জুতো পরা, ভ্যাবলাকান্ত বিশেষাকান্ত বিয়ে করত তাহলে হয়তো এমন দিন দেখতে হত না। বিশেষাকান্তে ডিচ করে কি অন্যায় করেছিল সে? সহজ সরল ছেলেটাকে তো সে-ই নষ্ট করেছিল! কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। ভেবেছিল, ঐ পাগলাচোদাকে কে বিয়ে করবে! তার স্বপ্নের রাজকুমার খোড়াই অমন ল্যান্ড-বোদা! সে আসবে ঝকঝকে গাড়িতে চড়ে। চকচকে চেহারা, তকতকে আচার-ব্যবহার! বিশ কে? সে তো শ্রেফ একটা হাতের পুতুল! ছেট্ট একটা শখ মেটানোর জিনিস। পাইক মাস্টারবেট করো। আর ইঙ্গিতা তার ঘোবনের গরম মেটানোর জন্য শ্রেফ একটা পুরুষকে ব্যবহার করেছে। ব্যস্ত, এই পর্যন্তই!

বিশুটা বড় সরল ছিল। গেমটাকেই প্রেম ঠাউরে বসল। ‘ইঙ্গিতাদি... ইঙ্গিতাদি...’ করতে করতে ন্যাকাচোদার মত চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াত। ভালোই লাগত ইঙ্গিতার। বিশুকে নয়। বিশুর এই সদাব্যস্ত চাকর চাকর ভাব! তার মনোযোগ! বিশুর উপর উৎপাত করতে ভালো লাগত তার। যখন অনার্সের পরীক্ষা সামনে, তখন বিশু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ইঙ্গিতার ইগোয় হেবি লেগেছিল! এমন ড্রুক মেয়েকে ছেড়ে কতগুলো নীরস বইয়ের পাতার মধ্যে নাক গুঁজেছে হতভাগা! চলো—দেখিয়ে দিছি, আমিও মেনকা, উর্বশীর জাত!

দেখল বিশু! দেখিয়েই ছেড়েছিল ইঙ্গিতা! ফলস্বরূপ পরীক্ষা মায়ের ভোগে! তার সাথে সাথে বিশুর ফুটুর ডুম!

এখন মনে বড় পাপবোধ কাজ করো। বিশুকে না খেলালেই কি ভালো হত! ইঙ্গিতার একটা ছেট্ট খেলার জন্যই ওর সর্বনাশ হয়ে গেল। বিশু তার দিকে মনোযোগ দিয়েছিল বলেই সে আজকে ক্লার্ক! আর অবনী তাকে পাতা দেয় না বলেই অতবড় কোম্পানীর সি ই ও হয়ে বসেছে!

ভাবতে ভাবতেই উঠে বসেছে সে। প্রেম কাকে বলে! প্রেম মানে কি অনেক টাকার রোয়াব! প্রেম মানে কি মোটা পার্স! প্রেম মানে কি একটা মেয়ের আনুগত্য স্বীকার করে পোষা কুত্তা হওয়া! প্রেমের চোটে নিজের জীবন বরবাদ করা! শরীরে শরীরে মাখামাখি, লদ্কালদ্কি কি প্রেম? তাই যদি হয় তবে কে ভালোবাসে তাকে? কে ভালোবেসেছিল? অবনী? না বিশু?

মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল তার। পরক্ষণেই ভাবল—ধূস শালা, প্রেমের ছেঁড়া গেছে! এই বেশ ভালো আছি! পাপবোধ কিসের? একটা ছেলেকে নিয়ে একটু ইন্টু-পিন্টু করেছিলাম। সে মালটা বুঝল না কেন? আমাকে এড়িয়ে কেরিয়ারে মন দিল না কেন? আমি তো ওর জন্য মরতে যাইনি। বরং নিজের আখের দিব্যি গুচ্ছিয়েছি মালদার বর বাগিয়েছি। তবে? ওরে মাকড়া, পকেটে রেন্স না থাকলে কালীঘাটের মালগুলো পর্যন্ত ঘরে ঢুকতে দেয় না, ইঙ্গিতা তোকে পাতা দেবে! ইঙ্গিতা তো দূর, খেঁদি-পেঁচিরাও ভাও দেবে না। তোকে ক্লার্ক হতে কি আমি বলেছিলাম? ফিজিক্সে ব্যাক পেতে আমি বলেছিলাম? তুই গোলায় যা, কি জাহান্মে—তাতে আমার কি বে?

ভাবতে ভাবতেই অস্থিরভঙ্গিতে পাশ ফিরল সে। আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখ পড়ল জানলায়...! গরম লাগছিল বলে আজ দোতলার বেডরুমের জানলা খোলা রেখেছিল ইঙ্গিতা। জানলার ঠিক সামনেই একটা আমগাছ। হঠাত সে দেখতে পেল সেই গাছের উপরেই কে যেন বসে আছে! তাকিয়ে আছে এদিকেই... একটা কালো কালো আবছায়া...!

আর্টিচিকার করে উঠল ইঙ্গিতা। হাতের কাছেই টর্চটা ছিল। কিছু না ভেবেই আনতাবড়ি টর্চ জ্বলে ফোকাস ফেলল ছায়ামূর্তিটার উপরে! লোকটার মুখ স্পষ্ট দেখা গেল না! কিন্তু একজোড়া চোখ... একজোড়া বীভৎস চোখ... সে যে কি ভয়াবহ চোখ তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়! অসভ্যের মত, লোকলজ্জার মাথা খেয়ে তাকিয়ে আছে এদিকেই! দুচোখে লোলুপ বন্যতা! আরও কি যেন একটা অস্বাভাবিকতা ছিল সেই চোখে, যা দেখে তার রক্ষিত হয়ে গেল। মনে হল চোখছটো মানুষের হতেই পারে না! একজোড়া অমানবীয় চোখ!

পরিত্রাহি চিংকারে সারা পাড়াকে জাগিয়ে তুলল সে। চিংকার শুনে বাবা ঘুম থেকে উঠে—কি হল... কি হল...!, বলতে বলতে উঠে এসেছেন। আচমকা উঠে আসার দরুণ স্টিকটার

କଥା ଭୁଲେ ଗିଯେଛେନ। ସରେ ତୁକତେ ଗିଯେଇ ହୋଁଟ ଖେଁ ପଡ଼େ ଗେଲେନ। ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଅୟକଶନେ କୋନମତେ ସାମଲେ ନିଯେ ବଲଲେନ—'କି ହେଁବେ ମା? ଅମନ ଚେଂଚିଛିସ କେନ?' ଇତିମଧ୍ୟେଇ ସ୍ପିଙ୍ଗେର ମତ ସୌଂଠନ ଛୁଟେ ଗେଛେ ଗାଛଟାର ଦିକେ । 'ଭୋ ଭୋ, ସ୍ବୀକ ସ୍ବୀକ' କରତେ କରତେ ସେ ପ୍ରାୟ ଜାନଲା ଦିଯେ ଲାଫିଯେଇ ପଡ଼ତେ ଚାଇଛେ ଗାଛ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ! କୋନମତେ ତାକେ ଏକହାତେ ଚେପେ ଧରେ ସାମଲାତେ ସାମଲାତେ ବଲଲ ଇଞ୍ଚିତା—'ବାବା, ଗାଛ...ଏ ଗାଛ...କେ ଯେନ ଜାନଲାଯ...' ।

--'কে গাছে? আঁ?...' বলতে বলতেই তিনি এগিয়ে গেছেন জানলার দিকে। ইঙ্গিতা ততক্ষণে বেডকভারটা কোনওমতে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। আতঙ্কিত হয়ে বলল--জানলার কাছে যেও না বাবা! কি জানি...কে ওখানে...'

ঘোঁতন তখনও ছটফট করে ইঙ্গিতার কোল থেকে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে। কান দুটো
খাড়া করে গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। হিংস্ব দাঁত বের করে বলল—‘গৱ্রণ্বৱ্রণ্ব...’।
ওদিকে চেঁচামেচি শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসেছে। ছুটে এসেছে পাড়ার ছেলেরা।
নাইটপার্ডের ব্যবস্থা না হওয়া অবধি তারাই এখন পালা করে পাহারা দিচ্ছে। হাতে মোটা
মোটা গদার সাইজের টর্চ আর লাঠি! মধ্যরাত্রে মেয়েলি গলার চিৎকার শুনে বুঝতে অসুবিধে
হয়নি কি হয়েছে। উভেজিত ইঙ্গিতা ততক্ষণে বেডকভার পরেই উপর থেকে নীচে নেমে
এসেছে। আমগাছটার দিকে হাত তুলে বলল—‘ঐ... ওখানে... ওখানে কেউ বসে
আছে... জানলা দিয়ে উঁকি মারছে।’

ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମଧ୍ୟେ ଗାଛଟାକେ ଘିରେ ଫେଲିଲ ଛେଲେରା ! ଛୋଟୁ-ହାବୁ-ପାଁଚୁରା ଏକେବାରେ ବନବିଡ଼ାଲେର ମତ ଗାଛ ବାଇତେ ଶୁରୁ କରେଛେ । ନୀଚ ଥେକେ ସବ୍ରତଦା, ଶୀକାଳଦା, ହଲୋଦାରା ଟର୍ଚେର ଆଲୋ ଫେଲିଛେ ।

--'হাবু... সাবধানে'। সুব্রতদা নীচ থেকে চেঁচিয়ে বললেন--'নির্ধার্ত লোকটা ওখানেই আছে। পালাবার চেষ্টা করতে পারো। ডেসপারেট হয়ে যেতে পারো। লাস্টিটা শক্ত করে ধরে বাঞ্ছিস'।

--'ওকে সবুজ'। হাব উপর থেকে জ্বার দিল--'চৰে আলোটা এইদিকে ফেলো'।

--'লোকটাকে ঠিক কোথায় দেখেছিল ইঙ্গিতা?' সুব্রতদা ইঙ্গিতার দিকে তাকালেন--
পঞ্জাটি লোকেশনটা দেখাতে পারবি?

ইঞ্জিনীয়ার নামও বলে ভিত্তি গুড়গুড় করছিল। লোকটাৰ মোখোৰ মধ্যে কি যেন ছিল।

ମର୍ମିକ କି ତା ମନେ ପାଦଚେ ନା । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧତ ସେ ମୋଖ ।

କେବଳ ଏହାରେ ନାହିଁ ଏହାରେ ନାହିଁ ଏହାରେ ନାହିଁ

তার আঙুলের ডি঱েকশনে সবকটা টর্চের মুখ ঘুরে গেল। কিন্তু ডালটা বেমালুম ফঁকা! কেউ নেই! কিছু নেই!

--'হয় চেঁচামেটি শুনে পালিয়ে গেছে, নয়তো লুকিয়েছে'। সুব্রতদা দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বললেন--'ভালো করে খোঁজ! একটা ডাল, একটা পাতাও বাদ দিবি না! যাবে কোথায় হারামজাদা! চাঙ্গা চাঙ্গা ছান মার!', বলতে বলতেই ফের ফিরলেন ইঙ্গিতার দিকে--'তই ঠিক দেখেছিস? ওখনে কেউ বসেছিল?'

--'একদম। পা ঝুলিয়ে বসেছিল। জানলা দিয়ে ভিতরের দিকে দেখছিল। আর...। তার
কি যেন মনে পড়ে যায়—যখন টর্চের আলো ফেলেছিলাম তখন গলায় কি যেন একটা
চকচক করে উঠেছিল। চেইন চেইন গোছের'।

--'চেইন!' সুব্রতদা চিন্তিত মুখে বললেন--'মুখ দেখিসনি?'
ইঙ্গিতা মাথা নাড়ায়। চোখ দেখেই এমন ভির্মি খেয়েছিল যে মুখ দেখার সুযোগই পায়নি।
অন্যদিকে তখন পুরো গাছটার প্রায় প্যাটাপিত বের করে ফেলেছে ছেলেপুলেরা! তন্ত্রণ করে
খুঁজে ফেলেছে। কিন্তু নেই! কেউ নেই! কোথাও নেই!
হাবু বলল--'দাদা, কেউ নেই এখানে!'
--'পালিয়েছে নেমে আয়'। সুব্রতদার মুখে আফসোসের ভঙ্গি ফুটে ওঠে--'কিন্তু এত
তাড়াতড়ি গেল কোথায়...?'

ঘোঁতন এতক্ষণ রীতিমত লাফালাফি করছিল। হারাধন কোনমতে তাকে ধরে রেখেছিলেন।
একটু আলগা পেতেই সে সুড়ত করে নেমে পড়েছে। বিদ্যুতের মত ছুটে চলে গেল পিছনের
দিকে! কয়েক সেকেন্ড পরেই শোনা গেল তার ভয়ঙ্কর গর্জন!

--'ঘোঁতন কিছু পেয়েছে। যাবে কোথায় বাছাধন! কুইক'। সুব্রতদা প্রাণপণে সেদিকেই
দৌড়লেন। তার ল্যাংবোটরাও গেল পিছন পিছন। হারাধন ও ইঙ্গিতাও ফলো করল তাদের।
ঘোঁতন তখনও অবিশ্বাস স্বরে ডেকে চলেছে। তার সামনে একটা অঙ্ককার ছায়ামূর্তি উপুড়
হয়ে পড়েছিল। ঘোঁতনের চিংকারে মুখ তুলে নেশাজড়ানো গলায় বলল--'কেন রেকারিং
ডেসিমাল বাজাচ্ছিস ব্রাদার? বলেছি তো আফটারশেভ কিনে দেব। একটু শান্তিতেও ঘুমোতে
দিবি না!'

সুব্রতদা টর্চের আলো ফেললেন লোকটার মুখে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। বিরক্ত হয়ে বলল--
'য়াঃ শালা! তুই তো একদম টর্চ নিয়ে পার্টনার খুঁজতে লেগেছিস দেখছি! কিন্তু টর্চটা
ধরেছিস কিসে? তোর তো চারটেই পা! মাস্টারবেট করতে পারিস্না তো টর্চ ধরবি কি
করে? ন্যাজে পার্মানেন্টলি ফিঙ্গ করেছিস নাকি!'

ইঙ্গিতা এগিয়ে এসে বিস্ময়াহত গলায় বলে--'বি-শু! তু-ই!'

--'তোর গলার আওয়াজের কি হল মামা?' কুকুরটার দিকে তাকিয়েই বলল বিশু--'আবে,
নাম ধরেই বা ডাকছিস কেন? আমি তোর কোন শালার ব্যাটা...?'

ইঙ্গিতা এবার তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বলে--'বিশু, আমি'।
বিশু এবার তার দিকে তাকাল। কয়েকমুহূর্ত অপলকে তাকিয়ে থাকে। পরক্ষণেই ভেউ ভেউ
করে কেঁদে ফেলেছে। কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে ইঙ্গিতার কাছে এগিয়ে এল। তার পায়ের
উপর হুমড়ি খেয়ে পরে বলল--'এই নাও... বুক পেতে শুয়ে পড়েছি! নেচে নেচে হাড়-
পাঁঁজর সব ভেঙে দাও... কিন্তু তোমার চিলেকোঠার কসম্, তোমার পচে গলে যাওয়া
রোম্যান্সের কসম্, তোমায় ম্যাগাস্টিনিসের দিবিয়... বসন পরো... বসন পরো... বসন পরো
মা!'

৭.

--'রোজ সকালে যদি আপনার একশো গ্রাম পায়খানা না হয়, তবে বুঝবেন সিস্টেম ক্লিয়ার
হয়নি। পেটের ভিতরে দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয়--ভদ্রসমাজ নাকে ঝুমাল দেয়। তাই ব্যবহার
করুন গঞ্জরাজ চুড়ন...!'

'গঞ্জরাজ চুড়ন' এর ক্যানভাসারের চিংকারে রোজ সকালে ঘুম ভাঙে লাটুর। আর ঘুম
ভাঙতেই মুড় ডুম হয়ে যায়! যদি ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই কাউকে একশো গ্রাম পায়খানার

ফান্ডা শুনতে হয়, তবে মেজাজের পিণ্ডি চটকে যাওয়াই স্বাভাবিক! তার উপর সম্প্রতি তার মেজাজ একটা বিশেষ কারণেই খারাপ হয়ে আছে। মা ফসসা হতে চলেছেন। সেটা দুঃখের কথা হলেও স্বাভাবিক নিয়ম। জীবনে অনেককে ফসসা হতে দেখেছে লাটু। নিজের বাপটাকে চোখের সামনে খচ্ছা হতে দেখেছে। তাই জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছে এত সহজে সেন্টু খেতে নেই। সেন্টু খায়ও না লাটু। কিন্তু সম্প্রতি মায়ের বিত্তিকিছিরি অন্তিম ইচ্ছের জ্বালায় জেরবার সে! কি? না, লাটুকে বিয়ে করতে হবে। মা বলেছেন—'দ্যাখ্ লাটু, আমি তো ফৌত হচ্ছি। তারপর তোর কি হবে?'

লাটু একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে—'কি আবার হবে? যেমন চলছিল, তেমনই চলবে। তোলা, পার্লার, ডায়মন্ড হার্বারে হোটেলের ধান্দা—সব চলবে। অত মগজমারি কোর না। সব সেটিং হয়ে আছে। তুমি বিন্দাস শপিং করো।'

--'ধান্দার সেটিং আছে। কিন্তু তোর সেটিং?' মা চিন্তিত—'এখন আমি আছি। যখন থাকবো না তখন কে তোকে সেট করবে? শ্লা, মরদদের খুব চেনা আছে। একা মাল দেখলেই ফুটো হাতায়...।'

--'কার বাড়ায় অত জোর!' লাটু হাতা গুটিয়ে ফেলেছিল—'আমি মাল নই মা। আমি মস্তান। বেশি বাড়াবাড়ি করলে গাঁড়ে অটোম্যাটিক বড়ি গুঁতিয়ে দেব।'

--'এটা কাজের কথা নয় লাটু।' মা চোখ বুঁজে বললেন—'তুই এবার একটা পেম কর্ব। দুনিয়ায় কত ব্যাটাছেলে আছে। তাদের মধ্যে একটা নরম-সরম মাল দেখে লাটিয়ে নে! তাপ্পির বিয়ে কর্ব। আমি দেখে যাই।'

লাটু লাটাবে! মানে, প্রেম করতে হবে! লাটুর মাথায় প্রায় গোটা ব্রহ্মান্তরাই ভেঙে পড়ল! সে ক্যারাটের প্যাঁচে একসাথে পাঁচ-ছ' জনকে লাট করে দিতে পারে! অটোম্যাটিক রিভলবারের এক গুলিতেই মানুষকে টপকে দিতে পারে। কালীপুজোর সময়ে রামদার এক কোপেই ছাগলের মুস্তু ধড় থেকে আলাদা করে দিতে পারে। পুলিশের সাথে সেটিং করতে পারে। কলার তুলে বাইক চালাতে পারে। তোলা না দিলে হ্রম্কি দিতে পারে। সিগ্রেট, মদ খেতে পারে। বারে গিয়ে বিকিনি পরা চিক্নিদের নাচ দেখে আহুদে লাউঘন্ট হতে পারে। দুরকারে অপোনেন্টের বড়িও ফেলে দিতে পারে।

কিন্তু প্রেম! সেটা কি! কিভাবেই বা করে!

--'মা....!' সে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। তার আগেই মা বাজখাঁই গলায় বলেন—'নো মা....নো মামা....ওনলি লভ....আর-এই পচা....কি যেন?'

--'ম্যারেজ ভাই।'

--'ইয়েস,' মা শব্দটায় এমফ্যাসিস করলেন—'ম্যা-রে-জ! হেপি ওয়েন্ডিং।'

--'ভাই, গলতি।' পচা শুধরে দেয়—'ওয়েন্ডিং আমাদের বিজনেসে হয়। ওটা ওয়েন্ডিং।'

--'ঐ একই হল।' মা লাটুকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বলেন—'একদম প্রেগনেন্ট সেটিং।'

--'প্রেগনেন্ট নয় ভাই, পার্মানেন্ট।'

--'ধু-স্না!' মা পাইপে টান মেরে মুখ টুখ আলুভর্তাৰ মত করে বললেন--'কি কিছাইনেৰ জবান ৱে! কোনটা পার্মানেন্ট কোনটা প্ৰেগনেন্ট...সব মাইৱি যেঁটে যায়। সে যাই হোক, তোকে ঈ ম্যারেজ না ওয়েল্ডিং কৱতোই হবে। এটা আমাৰ আখিৰি ইচ্ছা। লাস্ট উইচ'

--'ভাই, উইচ মানে ডাইনি। ওটা উইশ!'.

—‘আবে চিরকুট...’ পায়ের জুতো খুলে পচাকে ঠ্যাঙ্গাতে শুরু করলেন মা—ডায়লগ হচ্ছে
আমার আর লাটুর মধ্যে। তুই বাল থেকে থেকে করাপ্ট করছিস কেন বে?’
জুতো পেটা খেতে খেতেই ফের শুধরে দেয় পচা—করাপ্ট নয় ভাই, ইন্টারাপ্ট...’

-- 'শ্ব... তেরি তো... !'

সেদিন বেচারা পচার ওয়াট লেগেছিল। আর লাটুরও ওয়াট লেগেছে। মানে এখনও লাগছে।
মায়ের লাস্ট উইশ বলে কথা। অগত্যা সকলেই উঠে পড়ে লেগেছে তাকে 'পেম, করানোর
জন্য!

ବାଇରେ ତଥନଓ କ୍ୟାନଭାସାରଟା ଚିଂକାର କରେ ଚଲେଛେ—ରୋଜ ସକାଳେ ଯଦି ଆପନାର ଏକଣୋ ଗ୍ରାମ ପାୟଖାନା ନା ହୁଁ...’।

ଲାଟୁର ମାଥାଯ ଦାବାନଳ ଲେଗେ ଗେଲ । ଶାଲା, ରୋଜ ସକାଳେ ଏକଶ୍ଚୋ ଥାମ ପାଯଖାନା ର ଚିଙ୍କାରେ ସୁମ ବରବାଦ କରେ । ଆଜ ଓକେ ନାନି ନା ମନେ କରିଯେଛେ ଲାଟୁ . . . !

সে পাঞ্জাবী আর লুঙ্গি পরে শুয়েছিল। রোজ রাতে তাই শোয়া লুঙ্গিটাও যা তা ফ্যাংরা নয়।
বীতিমত বার্মিজ লুঙ্গি। অনেক কসরত করে আনিয়েছে। সেই বার্মিজ লুঙ্গির গিঁট ভালো করে
বাঁধতে বাঁধতে উঠে বসল লাটু। একটা কিং সাইজ সিগ্রেট ধরিয়ে ডাকল—এই শালা পচা,
কাবুল, সোনা, কোথায় বে শুয়োরের বাচ্চারা!'

‘ছোট ভাইয়ের’ হাঁকডাক শুনে সব ছল্টে এল।

-- 'कि घ्येचे भाई?'

একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল লাটু—'ঐ ক্যানভাসারের বাচ্চাটাকে দেকে আন্ তো। হারামজাদার চিম্পানিতে রোজ ঘুমের পুঁজি বাজে। দেখি, ওর গন্ধরাজ চুড়নের দৌড় কত। দেকে আন্ শালাকে। একট চমকে দিই'।

ଚ୍ୟାଲା ଚାମୁଭାରୀ ଆଦେଶ ପାଲନ କରତେ ଚଲେ ଗେଲା। ଲାଟୁ ଗଣ୍ଡିର ମୁଖେ ସିଗ୍ରେଟ୍ ଟାନ ମାରତେ ଲାଗଲା। ମେଜାଜ ପୁରୋ ଖାଣ୍ଡା ହେଁ ଆଛେ ଯାକେଇ ଦେଖିଛେ, ଇଚ୍ଛ କରିଛେ ତାକେଇ ଏକଗାଦା ଥିଣ୍ଡି ଦିଯେ ଲାଟୁ କରେ ଦିତେ। ଶାଳା, ଜୀବନେ ଆର କିଛୁ କରାର ପେଲ ନା, ଏଥିନ ପ୍ରେମ କରତେ ହବେ। ଦୋର୍ଦ୍ଦନ୍ତପ୍ରତାପ ଲାଟୁ! ସେ କିନା ପ୍ରେମ କରବେ! ବିଯେ କରବେ! କୋନ୍‌ଓଦିନ ବାଘେର ମୁଖେ 'ମିଂଟ', ଡାକ କେଉ ଶୁଣେଛେ? ଆରେ, ପ୍ରେମ କାକେ ବଲେ, ତାଇ ଜାନେ ନା ସେ! ମାଝେମଧ୍ୟେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିଛେ 'ଭ୍ୟାଲେନ୍‌ଟାଇନ ଡେ' ତେ ଛେଲେମେଯେରା କିସବ ଲୋଚା କରେ ବେଡ଼ାଯା। ଝୋପେ ବସେ ଚୁମ୍ବାଚାଟି କରେ। ମେଯେରା କେମନ ନ୍ୟାକେଷ୍ଟରୀ ମାର୍କି ହଲିଯା ବାନିଯେ ଐଶ୍ୱର ରାଇଯେର ମତ କରେ ବଲେ—'ଇଶ୍ୱରଶ୍ଶ, ... ତୁମି ନା ଏକଟା ଇଯେ!'.

এই 'ইয়ে'র মতলব আজও বুঝাল না লাটু। 'ইয়ে' মানে কি অসভ্য? যদি অসভ্যই হয় তবে অত নেকিয়ে বলার কি হয়েছে? অসভ্যতা করলে দিতে হয় কানের গোড়ায় দুই কানচাপাটি...! তাহলেই শালাদের বিচি মাথায় উঠে যাবে। দুনিয়ায় কারুর অসভ্যতায় কেউ খুশি হয়েছে, আহ্বাদে গলে জল হয়েছে—তা এই প্রথম দেখছে লাটু। তার সাঙ্গেপাঞ্জরা

অনেকবার তাকে প্রেমের ফিল্ম দেখানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু লাটুর ভালো লাগে না। কি সব নায়িকারা রঙীন জামাকাপড় পরে ধেই ধেই করে নাচে! আর প্রেমিককে দেখলেই তার ঘাড়ে চড়ে বসে থাকে! ন্যাকাশশী! আবে, ওটা ব্যাটাছেলের প্যায়ার না পেয়ারাগাছ-যে চড়তে হবে! আর ছেলেগুলোও একেবারে গেঞ্জি পরে নায়িকাকে নিয়ে এমন কসরৎ করতে থাকে, যেন ওটা ফিমেল নয়, ডাষ্টেল! লোকে আবার তা দেখে হাততালি দেয়! হাততালি দেওয়ার কি আছে! অমন কসরৎ তো লাটুও করতে পারে। সে নিজে ছ-ফুট লম্বা! অমন ডোলে শোলে তারও আছে। দাও না একটা ব্যাটাছেলে। লাটু তাকে নিয়ে রীতিমত ওয়েট লিফটিংও করতে পারে। তার কজির জোরও ফালতু নয়!

লাটু সিগ্রেটে আরেকটা জৰুর টান কষিয়ে নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করল। ঝোকড়া গচ্ছা দিয়ে ওসব খাজা ফিল্ম দেখার কোনও মানে হয় না। বেঁচে থাক তার ফেভারিট ঝাড়পিট। ততক্ষণে পচা-কাবুল-সোনারা ক্যানভাসারটাকে ধরে এনেছে। একটা চারফুটি নাটা লোক! তার সিঁড়িঙ্গে চেহারা দেখে অবাক হয় লাটু। এই শুকনো পিঁয়াজকলি মার্কা বডি থেকে ঐরকম ক্যানেক্সারা পেটানো ভলিউম বেরোয়!

--'কি বে হাফটিকিট?' সে ভুরু কুঁচকে বলে--'বেশি চর্বি চড়েছে তোর?'
ক্যানভাসারটা লাটুকে বোধহয় চিনতে পারেনি। সে সবিনয়ে বলে--'মুখ দেখেই বুঝেছি দাদা। একদম ঠিক জায়গায় এসেছি। সকালে পেট সাফ না হলে মেজাজ বিগড়ে থাকাই স্বাভাবিক। একবার গন্ধরাজ চুড়ন ব্যবহার করেই দেখুন। দুমিনিটে সব সাফ হয়ে যাবে'।

--'সাফ হবে?' লাটুর মুখ আরও গস্তীর হল--'ক, শিশি চুড়ন আছে তোর?'
--'পঞ্চাশ শিশি,'। ক্যানভাসার উৎসাহিত--'আপনি অর্ডার করলে আরও এনে দিতে পারি'।
--'পঞ্চাশ শিশিতেই হবে'। সে নির্লিপ্ত মুখে বলে--'পঞ্চাশ শিশি কিনব। কত মালু বল'।
টাকা পয়সা বিনা প্রতিবাদেই মিটিয়ে দিল লাটু। তারপর হেঁকে বলল--'ভোলা মুদির দোকান
থেকে দাঁড়িপাল্লাটা নিয়ে আয় তো! বলবি আমি চাইছি, দাঁড়িপাল্লা বাটখারা একদম পারফেক্ট
কন্ডিশনে থাকা চাই। পাল্লা বা বাটখারায় ঘাপলা দেখলে ওকে লাল করে দেব'।

--'আনছি ভাই...'।
কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাল্লা বাটখারা এসে হাজির। লাটুর পট্টরেরা তখনও বুঝে উঠতে
পারেনি, দাঁড়ি পাল্লা বাটখারা দিয়ে ভাই ঠিক কি করবে!

লাটু প্রথমে পাল্লা বাটখারা নেড়েচড়ে দেখল। নাঃ, কোনও ঘাপলা নেই। তারপর সিগ্রেটটাকে
অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে ক্যানভাসারের দিকে তাকিয়েছে--'এক শিশি গিললে একশো গ্রাম
পায়খানা হয়? গ্যারান্টি?'

--'টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি স্যার। একবার ইউজ করেই দেখুন'।
--'দেখছি'। লাটু একটা শিশি কাবুলের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে--'নে এটা শালাকে গেলা!'
কথা নেই বার্তা নেই হঠাত যেন বাজ এসে পড়ল ক্যানভাসারের মাথায়। একি! লোকটা
নিজে খাবে না! উলটে তাকেই খাওয়াবে!
সে লাফ মেরে পালাতে যাচ্ছিল। তার আগেই তাকে শাগরেদৱা চেপে ধরে ফেলেছে।

তারপর? তারপর আর কি! লোকটাকে পাকড়াও করে পুরো পঞ্চাশ শিশি গন্ধরাজ চূড়ন
গেলাল লাটুর দলবল। যখন পঞ্চাশতম শিশি শেষ হল, ততক্ষণে সে বেচারা হেদিয়ে
পড়েছে।

--'ওয়ে পাইরেটেড খুচরো পয়সা!', লাটু উঠে দাঁড়িয়েছে--এক শিশিতে যদি একশো গ্রাম
হয়, তবে পঞ্চাশ শিশিতে পাঁচ কিলো হোনে কা মাংতা হ্যায়। ঐ পালা বাটখারা রেডি
আছে। আগে তুই শালা পাঁচ কিলো হাগবি--তারপর এখান থেকে বেরোবি! যদি একগ্রামও
এদিক ওদিক হয় তবে...,' সে পাঞ্জাবির পকেট থেকে সাপের মত চিকন নতুন পিস্তলটা
বের করে এনেছে। সেটা ক্যানভাসারের মাথায় ঠেকিয়ে হিসহিসিয়ে বলল--'তোর জিওগ্রাফি
হিস্ট্রি সব পালটে যাবে। যদি এখনই মায়ের ভোগে যেতে না হয় তবে পাঁচ কিলো হেগে
দেখা। পালাবার চেষ্টা করলে আমার পন্টরুড়া তোর লাশ ফেলে দেবে! খোপরিতে চুকল?'
গান পয়েন্টে রেখে যদি কেউ একথা বলে তবে 'না, বলার হিস্ত কোনও তিস্ মার্ খাঁ--
এরও নেই। ক্যানভাসার কোনমতে মাথা নাড়ুল।

--'আর আমি কে সেটাও জেনে রাখ,'। লাটু কোমরে হাত দিয়ে বলে--'আমার নাম লাটু
মন্তান। একদম অরিজিন্যাল। কোনও শাখা নেই। নাম শুনলে আচ্ছা আচ্ছা পাব্লিকও মুতে
দেয়...'।

সে আর বলতে! কাবুল ফিক করে হেসে ফেলল--'মালটার প্যান্টুল পিলা হয়ে গেছে ভাই,
এখনই মাপবো?'।
আধখানা চোখ করে তার দিকে তাকাল লাটু। চোখের ইশারায় তার দলবলকে লোকটার
উপর নজর রাখতে বলে আন্তে আন্তে টয়লেটের দিকে চলে গেল। এখন তার অনেক কাজ।
এই চরিশ বছরের জীবনে যা করেনি আজ তাই করতে যাচ্ছে। প্রথমে শাড়ি কিনতে হবে।
আরও কি সব কিনতে হবে। বিউটি পার্লারে যাবে। সেখানে মোমপালিশ মারতে হবে। সে
এক ভীষণ কাল্পনিক! অবশ্যে সেজেগুজে সন্ধ্যাবেলা একটা ছেলের সাথে মিট করতে যাবে।
পচা--সোনারা ইন্টারনেট থেকে ছেলেটার প্রোফাইল বের করেছে। তার ফটো দেখে মা কাঁৎ
বলেছেন--'এই মালটাকে দেখে আয় লাটু। বেশ ব্যোম্ ভোলানাথ ভাব। সাত বুলেটেও রা
কাড়বে না'।

অগত্যা! যেতেই হচ্ছে লাটুকে। মায়ের 'লাস্ট উইচ', বলে কথা! লাস্ট উইচের ধাক্কায় সে
যে স্যান্ডউইচ হচ্ছে তা আর কে দেখে!

কিন্তু মাঠে নেমেই লাটুর জান কয়লা। সে একা কোথাও যায় না। কিছু শাগরেদ সবসময়ই
তার সাথে থাকে। কিন্তু শপিং মলে তুকে তারা একেবারে হটোপাটি লাগিয়ে দিল। একজন
একখানা নীল শাড়ি তোলে তো আরেকজন লাল শাড়ি। চতুর্দিক থেকে একডজন শাড়ি নিয়ে
তারা লাফালাফি করছে--'ভাই, এইটা পরে দেখো, মা কসম, পুরো রাপচিক আইটেম
লাগবে তোমায়। একদম শ্রীদেবী'!

এমন দিনও এল যেদিন মন্তানকে আইটেমও সাজতে হচ্ছে! যে মেয়েটি হাসি মুখে শাড়ি
দেখাচ্ছিল সে বলল--'কার জন্য কিনছেন দাদা? গার্লফ্রেন্ড?'

চটাস করে একটা শব্দ! মেয়েটির কানের গোড়ায় ডাব্বেল ভাঁজা হাতের এক মোক্ষম
কানচাপাটি বসিয়ে দিয়েছে লাটু--'তোর গার্লফ্রেন্ডের ভাই হয়েছে! আমায় লেবু পেয়েছিস!'।

মেয়েটি চড় খেয়ে হতভস্ব হয়ে গেল। বিস্ময়ে তার চোখের পলক পড়ে না।

--'ধুস্ শালা। খালিপিলি দিমাগ চাটছে মালটা'। লাটু বলতে বলতেই পরণের শার্টটা খুলে ফেলেছে--'দ্যাখ্ শালি। দেখেছিস্? এবার বল্ কার জন্য কিনছি...।'

দলবলের মধ্যে হাঁ হাঁ করে ভীমা ছুটে এল--'ভাই এটা পান্নিক প্লেস! এখানে এমন করে শার্ট খোলে না!'

--'কেন?' ভুরু কুঁচকে বলল লাটু--'তোদের সলমন খান সবার সামনে শার্ট খোলে না? না তার একারই রাইট আছে!'

--'ভাই, সলমন খান ছেলে, তার ব্যাপার আলাদা! কিন্তু তুমি তো...।' কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল ভীমা। ভাই যেমন খেপে গেছে, কথাটা পুরো শেষ করলে তার জানের ফাঁড়া আছে।

কিন্তু উপরওয়ালার অশেষ কৃপা। লাটু আস্তে আস্তে শাস্ত হল। দেরি হলেও ব্যাপারটা বুঝেছে সে। আশেপাশের পান্নিকরা হাঁ করে তার দিকেই তাকিয়ে আছে দেখে তার তীব্র দৃষ্টি নরম হয়ে আসে।

সেলস্গার্লের অবস্থা তখন খারাপ। তার মাথা রীতিমত বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। তবু চাকরিটা রাখতে হবে। কোনমতে বলল--'নিজের জন্য কিনছেন দিদি'?

--'আমি তোর কোন্ নাগরের দিদি বে!,' লাটু ফের চটে গেছে। সে জানে যে সে মেয়ে। কিন্তু মানতে চায় না।

বিপদ দেখে ভীমাই এগিয়ে গেল। ফিসফিস করে বলল--'এ আইটেম, ভাইকে দিদি বললে ফের কানচাপাটি লাগিয়ে দেবে। ভাই বল্-ভাই'।

মেয়েটি খাবি খেয়ে বলল--'ও আচ্ছা। ভাই, আপনার জন্য শাড়ি দেখাবো?'

--'এতক্ষণ ধরে কি তোর সামনে আমি স্যাড সং গাইছি!'

অনেক লোচা, কিছাইনের পর অবশেষে একটা টকটকে লাল রঙের শাড়ি পছন্দ হল লাটুর। হাই প্রোফাইলের মাল্লু। তবে চিজটাও হাই প্রোফাইল।

সেল্সগার্ল ভয়ে ভয়ে বলে--'ভাই, এর সাথে ম্যাচিং ব্রা, ব্লাউজ, শায়া আছে? না দিয়ে দেবো?'

মুখ বিকৃত হয়ে গেছে লাটুর। শাড়ি কিনেও শাস্তি নেই। বিরক্ত হয়ে বলল--'যা যা দেওয়ার দিয়ে দে। দিমাগ চাটিস্ না।'

--'সাইজ কত?'

সেরেছে! মা থাকলে বলতে পারত। কিন্তু ঘটনা যে লাটু পিস্তলের বুলেটের সাইজ থেকে তোপের গোলারও সাইজ জানে। অথচ নিজের ব্রায়ের সাইজটাই জানে না।

--'নো প্রবলেম ভাই। আমি মেপে নিছি'।

মেয়েটি একটা ফিতে দিয়ে মেপে নিয়ে বলল--'চৌত্রিশ'।

--'চৌত্রিশ হলে চলবে না রে চিকনি। ওটাকে আরও বাড়া'।

ভীমার দিকে হাঁ করে তাকাল লাটু। বলে কি হারামী! বুকের সাইজ বাড়াতে হবে!

--'ভাই, তুমি আজকালকার চিরকুটগুলোকে চেনো না। হারামজাদারা মেয়ে দেখতে এলেই আগে বুকের দিকে তাকায়। ভীমা বলে--'স্পঞ্জ ব্রা নেই!'

লাটু শপিংমলের ছাতের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল—ভীমাও কত কিছু জানে! ক'দিন আগেই বিয়ে করেছে কি না! ব্রা নিয়ে বোধহয় সে থিসিসই করে ফেলেছে! থিওরিটিক্যাল নয়, প্র্যাকটিক্যাল!

অনেক হঙ্গমার পর শপিং শেষ হল। শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ, ম্যাচিং জুয়েলারি, হিলজুতো—সব কিনে ফিরল লাটু। মা পরিয়েও দিলেন। কিন্তু ফের ঝঞ্চাট! শাড়ি পরে নড়তে চড়তেই পারে না সে! কখনও কুঁচি খুলে যায়, কখনও আঁচল লপাং লপাং করে খসে পড়ে আবার কখনও বা শাড়িতে পা বেজে হড়ুম করে আছাড় খায়। তার উপর ব্রা নামের জিনিসটাও কি টেনশনপয়দাকারী মাল! জীবনে অনেক শক্ত শক্ত অস্ত্র অপারেট করেছে লাটু। কিন্তু এই সামান্য চিজটা কখন শাড়ির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়, কখন পৈতের মত উঁকিরুঁকি মারে সেই ভেবেই ভয়ে ল্যাম্পপোস্ট হয়ে আছে! স্পঞ্জ ব্রা পরে তার বুক দুটো যেন কেমন ভয়াবহ হয়ে আছে! মনে হচ্ছে দুখানা গ্রেনেড তার বুকের উপর কেউ বসিয়ে দিয়েছে! বেশ কয়েকবার আছাড় খেয়ে শেষে কাতর ভাবে মাকে বলল—‘মালকোঁচা মেরে পরা যায় না?’ মা এমন করে তাকালেন যেন পারলে মেয়েকে জ্বালিয়ে দেন। তারপর থেকেই মুখে কুলুপ এঁটেছে লাটু। আজ তার কথা বলার দিন নয়।

একা শাড়িতে রক্ষা নেই, তার উপর হিল জুতো দোসর। পরে হাঁটতেই পারে না! ত্রিভঙ্গমূরারি বা বাঁকা শ্যামের মত একবার এদিকে একবার ওদিকে বেঁকছে।

--‘অত হিলছ কেন ভাই?’

সোনার কথার উত্তরে অশ্বিনৃষ্টিতে তাকে একবার মেপে নিল লাটু। হিলছে কি সে নিজের মনের আনন্দে! এই হতভাগা হিল তাকে হিলিয়ে ছাড়ছে! এর চেয়ে একজোড়া রণপা পরে গেলেও বোধহয় এত অসুবিধা হত না!

--‘ভাই... ভাই...’ কাবুল আহ্নাদে দৈত্যকুলের পেন্তাদ হয়ে বলল—‘আঁচলটা বুকের একসাইড দিয়ে ফেলো। মানে ক্লিভেজটা দেখাও। ফুল্টু অ্যাটম বস্ব লাগবে মামা!’, হায় ভগা! শেষ পর্যন্ত তার ব্যাটাছেলে পল্টনদের কাছ থেকে অ্যাডভাইস নিতে হচ্ছে! কটমট করে একবার তার দিকে তাকিয়ে হাল ছেড়ে দিল সে।

এরপর বিউটি পার্লার! সেখানে এক হতচাড়ি পুটুত পুটুত করে তার অমন সুন্দর ভুরুটার উপর দিয়ে প্রায় ট্র্যাক্টরই চালিয়ে দিল! মুখে কিসব মাথিয়ে, ভূত সাজিয়ে, ঠাণ্ডা গরম সেঁক দিয়ে অতিষ্ঠ করল। অনেক অত্যাচারের পর যখন ছাড়া পেল লাটু, তখন আয়নায় নিজের মুখ দেখেই আঁতকে উঠল! এই আইটেন্টা কে রে ভাই! এই লাটু! ধুস, এ তো হোর্ডিঙের চিকনিগুলোর মতই লাগছে! আবে শা-লি!... খানকিমাগী! এ কি করেছিস!

মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ঘুঁষি বাগাছিল সে। কিন্তু তার আগেই আশেপাশের মেয়েগুলো হেসে বলল—‘দারুণ দেখাচ্ছে! একেবারে হিরোইন!’,

এত বড়ো কমপ্লিমেন্টের পর কি আর ঘুঁষোঘুঁষি করা যায়। অগত্যা রঙচঙ মেখেই বেরিয়ে এল সে। তার দলবল তাকে দেখে সিটি মেরে বলল—‘ওঁ: ভাই....! পুরো রাপচিক আইটেম! ক্রেজি কিয়া রে! পাগলা ক্ষীর খা!’,

হাঁড়ির মত মুখ করে, কোনমতে বেঁকতে বেঁকতে সেদিন ছেলে দেখতে চলল লাটু মন্তান! যাওয়ার পথে মা কালীর মন্দির দেখে প্রণাম করল। সে প্রণাম তো প্রণাম নয়, সীতিমত

হমকি। কপালে হাতজোড় করে মনে মনে বলল সে-' উপরওয়ালা, মাকড়াটা যদি আমায় না-পসন্দ করে তবে জোড়া পাঁঠা দেব। আর যদি মালটা আমায় পছন্দ করে ফেলে তবে তোমায় শুন্দি মন্দিরটাই না উড়িয়েছি তো আমার নাম লাটু মন্তানই নয়!'

৮.

সেদিন রাতে ফ্রাস্টু খেয়ে একটু বেশিই বড়ি খেয়ে ফেলেছিল বিশু।

আসলে হয়েছে কি, সেরাতে তো ইঙ্গিতাদির বাড়ির পিছনে সে ল্যাদ্ খেয়ে পড়েছিল। মাকসম্, একটুও পিপিং টম গিরি করেনি। শুধু কোমরভাঙা ঢাম্না সাপের মতই পড়ে পড়ে ল্যাদ্ খাচ্ছিল! ওদিকে কোন্ হতভাগা কে জানে, ইঙ্গিতাদির জানলায় উঁকি মেরে গেছে! আর এই হাড়ে হারামজাদা, হারামীর হাতবাল্ক ঘোঁতন শেষমেষ তাকেই কেস খাওয়ানোর জন্য খুঁজে পেল! হবে না কেন! ফ্রাস্টুই ফ্রাস্টু চেনে।

তারপর থেকেই বিশুর সাড়ে সরোনাশ হয়েছে! ক্লাবের ছেলেপিলেরা এসে তাকে চমকে দিয়ে গেছে। বলেছে-'এরপর থেকে যদি কোনও মেয়ের বাড়ির একশো গজের মধ্যেও তোকে দেখি হতভাগা, কিলিয়ে মাথা সন্দেশ বানিয়ে দেব। মাথা থেকে ডাঙ্ডা-সব শালা চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। পুলিশও আইডেন্টিফাই করতে পারবে না, এটা মেল না ফিমেল!'

লেং হালুয়া! খায়া পিয়া কুছ নেহি, প্লাস তোড়া চান্সিস লাখ কা! একটা সিন দেখাও তার ভাগ্যে জুটল না, তার আগেই পার্সিক এসে তাকে চমকাচ্ছে! একে কি বলবে বলো? শালা, ব্যাড লাকই খারাপ!

তার উপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতন সবাই ইতিউতি ফিসফিসাচ্ছে। মেয়েগুলো তাকে দেখলেই এমন করে তাকায়, যেন এখনই সে বুক টিপে দেবে! এই তো, বিঞ্চিপিসির মত চিরকেলে বৈক্ষণ, অহিংস মানুষও সেদিন তাকে কলেজ যাওয়ার পথে বলেই ফেললেন-'বাবা বিশু, তুমি তো ভালো ছেলে ছিলে। আগে আইবুড়ো মেয়েদের দিকেই নজর দিতে! এখন বাপু এয়োদেরও ছাড়ছ না! কোন্দিন হয়তো বেধবাদের ঘরেও চোখ রাখবে! কি কলিকাল! হ-রে-কৃ-ষ্ণ!'

বিশুর আর সহ্য হয়নি। দাঁত খিঁচিয়ে বলল-'কাকে ডাকছেন পিসি? কৃষ্ণ! তিনি কি ভালো কাজটা করেছেন শুনি! রাধা কি আইবুড়ো ছিলেন? না চন্দ্রাবলীর বিয়ে হয়নি?'

পিসি সেকথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন-'মৱ্ মুখপোড়া! ভগবানের সাথে নিজের তুলনা করিস? তোর এই ভেঁটকিচোপায় নুড়ো না জ্বলে দিয়েছি....!'

বোবো! 'কৃষ্ণ করলে লীলা, আমরা করলে বিলা'! ধরা না পড়লে কানু, আর ধরা পড়লেই পানু! কি দিনকাল পড়েছে!

যাই হোকু, ভেঁটকিচোপা জিনিসটা কি সেটা সে বোঝেনি। কিন্ত পিসি যে খচে লাল হয়েছেন তা বুঝতে তার কষ্ট হয়নি! অগত্যা মানে মানে সেখান থেকে মায়া হয়ে গেল বিশু! মানে প্রায় মিলিয়েই গেল পঞ্চভূতে!

তারপর থেকেই তার মন খারাপ! মন এতই খারাপ যে দুটোর জায়গায় টপাং টপাং করে চারটে বড়ি খেয়ে ফেলেছে। একবার টেস্টপরীক্ষার সময়ে টেনশনে এতগুলো বড়িই খেয়ে ফেলেছিল সে। গুণে দেখেছিল যে চারটে বড়ি খেয়ে নেশা হতে হতে মিনিমাম আধুনিক লাগবে। তাই সময় নষ্ট করা আর কেন? পরীক্ষার সেকেন্ড হাফেই বড়ি চারটে গিলে

ফেলেছিল। এরপরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত! তার হাতের লেখা প্রায় ইসিজি মেশিনের লাইনের মত নাচতে নাচতে একসময় স্ট্রেট হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ মাল খালাস! এবং ফুটুর ডুম!

কলেজের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট তাকে ডেকে বলেছিলেন—'বাবা বিশু, গোটা কলেজ, প্রিসিপাল, এমনকি হস্তরেখাবিদও তোমার হাতের লেখা উদ্ধার করতে ফেল মেরেছেন! যদি তুমি এই যুয়ুৎসুলিপি উদ্ধার করতে পারো তবে লাজ্ডু, নয়তো গাজ্ডু!'

সেই শেষ! সেই ঘটনার পর থেকে বড়ি খেলেও একসাথে চারটে বড়ি কখনও খায়নি সে। কিন্তু আজ মনের দুঃখে খেয়ে ফেলেছে!

দুঃখ এতটাই ভসভসিয়ে উঠেছে যে টলতে টলতে সে রেলওয়ে ট্র্যাকের উপরে হাঁটতে লেগেছে! এই অর্থহীন জীবন রাখার কোনও মানে হয় না। এ তো জীবন নয়, শালপাতার ঠোঙ্গা! অথবা চায়ের ভাঁড়! কেউ দিব্য চুকচুক করে চা খেয়ে, বা নুলো বের করে বিনাস্ তেলেভাজা সাঁটিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে ডাস্টবিনে! শালা, সব জায়গাতেই ফেল্টুস! পরীক্ষায় ট্যারা হল, প্রেমে ভেড়া হল, এমনকি এক প্রেমিকার আবদারে মাথা মুড়িয়ে নেড়াও হয়েছে! জীবনে আর ক্যারা করতে বাকি কি রেখেছে বিশু! সবই তো হল। এবার হয় ট্রাক, নয় রেলওয়ে ট্র্যাক।

নাঃ, উপরওয়ালা! তোমার উপর কোনও রাগ নেই বিশু। যখন ওর ভাগ্যলিপি লেখার পালা এসেছিল, তখন বোধহয় তুমিও মেনকা ডট কম দেখে ফ্রাস্টু খাচ্ছিলে। তাই ভুল করে কপালে ফ্রাস্টু শব্দটাই লিখে ছেড়ে দিয়েছে! জন্ম থেকে আজ ইন্তক তাই ফ্রাস্টুই খেয়ে আসছে বিশু। ফ্রাস্টু খেতে খেতে বাঁচো। না পারলে মরো! ঐ ঘোঁতনের জীবনে তবু চিবোনোর জন্য কিছু হাড় আছে। বিশুর তো নিজের হাড় ক, খানা বাঁচানোই সমস্যা হয়ে উঠেছে! কোন্দিন উদো ফের জানলায় উঁকি মারবে, আর তার পিণ্ডি বুধোর, তথা বিশুর ঘাড়ে চাপিয়ে পাড়ার ছেলেরা তার পিণ্ডি চটকে পিণ্ড বানিয়ে দেবে! ঈশ্বর, সেদিন দেখার জন্য বিশু বাঁচতে চায় না! তুমি বিশুকে মেরে ফেলো!

--'এত রাতে রেললাইনে কি করছিস্ বে?' পিছন থেকে একটা গলার আওয়াজ আচমকা ভেসে এল। এমন বাজখাঁই গলার স্বর যে বিশুর পিলে চমকে গিয়েছিল। কোনমতে টলতে টলতে পিছনে ফিরল--'কে?'

--'তোর বাপ'। পিলে চমকানিয়া কর্তৃপক্ষ বলল--'কি করছিস রেললাইনে?'

--'প্যাভিলিয়নে ফিরছি'। বিশু আড়ষ্ট স্বরে উত্তর দেয়--'অনেক খেলা হয়েছে। রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে গ্রীনরুমে ফেরার তাল করছি'।

--'তুই মাতাল না পাগল?', কর্তৃপক্ষ বলল--'এক্সুনি ট্রেন এসে পড়বো। এখান থেকে ফোট। নয়তো কাল সকালে টু-পিস হিসাবে বিকোবি!'।

--'না, এখন আসবে না'। বিশু নিশ্চিন্ত স্বরে বলে--'টাইম টেবিল দেখে এসেছি। ডাউনে ট্রেন আসতে এখনও সাত মিনিট বাকি। তার উপর শুনলাম ট্রেন লেট আছে'।

কিছুক্ষণ ওপাশের স্বরটা চুপচাপ থাকল। তারপর আস্তে আস্তে বলল--'আস্তহত্যা করছিস্? মানে সুইসাইড?'।

--'ভাবছি করবো'।

-- 'কেন?'

-- 'এমনি'।

কথা নেই বার্তা নেই, ঠাঁই করে একটা চড় এসে পড়ল তার গালে-

-- 'শা-লা। মাঝরাতে কেওড়ামি হচ্ছে! সুইসাইড করতে কেউ টাইমটেবিল দেখে আসে! আমায় ছাগল ঠাউরেছিস বোকাচোদা! ফের যদি চামচিকের মত চিকচিক করিস তাহলে তোর বড়পার্টের সবক টা ফাইল এইসান করাপ্ট করবো যে বর্ণপরিচয় পড়েও চেনা যাবে না!'।

যাচ্ছলে! এ কোন্ বাপের খঙ্গের পড়ল বিশু! এ যে রীতিমত ধমকাচ্ছে! শুধু ধমকাচ্ছেই না, রীতিমত হেডমাস্টারের মত পেল্লায় চাঁচিও হাঁকড়াচ্ছে! এ আবার নতুন করে কি কেলো!

চড়টা খাওয়ার সময়ে রিনরিন করে একটা চাবি বা চুড়ির শব্দ পেয়েছিল সে। এখন থাপ্পড় খাওয়ার পরে মাথাটাও একটু পরিষ্কার হয়েছে। একটা মেয়েলি পারফিউমের গন্ধও পাচ্ছে বিশু। এর মানে কি? যে চড়টা মারল সে কি মেয়ে! কিন্তু মেয়েদের এমন মৌক্ষম হাত হয় নাকি! হাত তো নয়—বাঘের থাবা! একটা খেয়েই আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার উপক্রম হচ্ছে। আরেকটা সাঁচিয়ে দিলে নির্বাং উপরওয়ালার কোলে বসে পিট্টু খেলতে হবে! তাছাড়া মেয়েরা কি এই ভাষায় কথা বলে! মেয়েদের কি এরকম খাম্বাজ কষ্টস্বর হয়!

চোখ পিটপিট করে ছায়ামূর্তিটাকে দেখার চেষ্টা করল বিশু! ওরে বাবা! এ তো বাপ নয়, মা বটে! রীতিমত লম্বা হিলহিলে চেহারা! আবছা অক্ষকারেও বুঝতে পারল মানুষটার পরনে আর যাই থাক্, শার্ট-প্যান্টুল নেই, বরং শাড়িই বলে মনে হচ্ছে! দেহরেখা বোঝা যাচ্ছে! জিনিস বটে! একেবারে সেভেন আপের কার্ডি বোতল!

তার হঠাং করে কান্না পেয়ে গেল। আচমকা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল বিশু। ছোটবেলায় মা একবার থাপ্পড় মেরেছিল। ছাতে শুকোতে দেওয়া আচার সবটা খেয়ে ফেলেছিল বলে। জীবনে মেয়েদের লাখি অনেকবার খেয়েছে। কিন্তু অল্পবয়েসে মা চলে যাওয়ার পর আর কোনও মেয়ে তাকে চড় মারেনি। হঠাং করে সেই ছেট্ট বিশুর কথা মনে পড়ে গেল। কি ছিল দিনগুলো! আর এখন কি হয়েছে!

-- 'আবে! এ তো মহা হালুয়া!' মেয়েটি বলল--'মেয়েছেলের মত নাকে কান্না কাঁদছিস কেন? চুপ কর... নইলে দেব আরেক কানচাপাটি...'।

কেলো করেছে! আরেকটা চাঁচি খেলে মরেই যাবে বিশু। সে কোনমতে ফৌঁপাতে ফৌঁপাতে চুপ করল।

মেয়েটার বোধহয় করুণা হয়। একটু নরম সুরে এবার বলে--'মাইন্ড খাস্ না। আজ আমার মিটার ডাউন হয়ে আছে। কিন্তু তুই এখানে কি মাড়াচ্ছিস? সত্যি সত্যিই সুইসাইড করতে যাচ্ছিল না কি!'

-- 'বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না!', বিশু নাক টানতে টানতে বলে--'চরিত্র মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ! তার থেকে বড় কিছু হয় না। সেটাই যখন চলে যায়...'।

মেয়েটা একটা সিগ্রেট মুখে দিয়ে ফস্ করে লাইটার জ্বালাল। সেই আলোতেই তার মুখ দেখতে পেল বিশু। এ কে রে! স্বর্গ থেকে কোনও অঙ্গরা নেমে এসেছে না কি! উর্কশী না

মেনকা! ছেট করে ছাঁটা চুল। লম্বাটে পানপাতা মুখ! চোখ যেন মিশৱীয় তুলিতে আঁকা! এমন সুন্দরী মেয়ে জীবনেও দেখেনি সে। ইঙ্গিতাদিও এর সামনে নস্য!

--' তুই তো দেখছি মোবাইল-ইশপের গশ্ম! এই রাতছুপুরে কি তোকে জ্ঞান দিতে বলেছি?' বলতে বলতেই সিগ্রেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়েছে সে--'বিড়ি খাবি?'

--'না। আমি খাই না।'

--'খেলে যা!' সে এবার হাসল--মামা, তুই কোথা থেকে আমদানি হয়েছিস বে? বিড়ি খাস্ না, টাইম টেবিল দেখে সুইসাইড করিস, কান চাপাটি খেয়ে বাচ্চাদের মত ফেউ ফেউ করে কাঁদিস, আবার ঢপের জ্ঞানও দিস্। তো কি হয়েছে তোর চরিত্রে? কেউ রেপ করেছে?'

বিশু হাঁ করে কিছুক্ষণ সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে কি! তারও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছিল--তুমিই বা কোথা থেকে এসেছ বাপু! রাতে একটা পুরুষের সাথে ট্রেনলাইনের উপরে দাঁড়িয়ে গজম্বা করছ! ভয় ডরের নাম নেই! কথায় কথায় বিরাশি সিকার ঢড় হাঁকাছ! দিবিয় ফুকফুক করে সিগ্রেট টানছ! তার উপর একজন পুরুষকে জিজ্ঞাসা করছ যে সে রেপড় কি না!'

কিন্তু আরেকখানা পেন্নায় থাক্কড়ের ভয়ে চেপে গেল সে। মিউমিউ করে বলল--'তুমি যেই হও, আমার থেকে একশো গজ দূরে দাঁড়াও। পাড়ার লোকেরা দেখলে আমার হাড় ভেঙে দেবে।'

সুন্দরী সজোরে হেসে উঠল--'আমাকে দেখলে হাড় ভাঙবে না। নিজেদের হাড় বাঁচানোর চেষ্টা করবে। এবার বল্ তো, কি হয়েছে?'

কেন বলল জানে না বিশু। কাকে বলছে তাও জানে না। কিন্তু সব কথা বলেই ফেলল। ইঙ্গিতাদির বাড়ির কেলোটা সবিস্তারে বলল। পাড়ার ছেলেদের হমকি, লাঞ্ছনা, যন্ত্রণার কথা--সব বলল। এমনকি পাড়ার সবাই যে তাকে 'অসভ্য চোখ', বলে সন্দেহ করছে তাও জানাতে ভুলল না। বলতে বলতে যখন তার চোখে জল প্রায় আসতে চলেছে এমন সময়ই দেখে...--

ট্রেন! সদ্য সদ্যই স্টেশন থেকে ছেড়েছে এত রাতে লাইন ক্লিয়ারই থাকে। জোরালো সবুজ সিগন্যাল দেখে ট্রেনের ড্রাইভার মনের আনন্দে স্পিড তুলেছে... দ্রুত বেগে সাঁ সাঁ করে এই ট্র্যাকেই আসছে!

প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল বিশু। ট্রেনটা যে স্পিডে আসছে তাতে মৃত্যুর সঙ্গে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছে তারা। মেয়েটি তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। ট্রেনটা ওদিকে ক্রমশই এগিয়ে আসছে।

কোনমতে ধরা গলায় বলল সে--'ট্রেন!'

--'ট্রেন! কোথায়!', সুন্দরী পিছন ফিরে দেখার আগেই জোরালো আলো আর জোরালো হইস্ল জানান দিল-ট্রেন আসছে!

--'ট্রেন আসছে! আর তুই শালা দেবদাসগিরি করছিস!', মেয়েটি চেঁচিয়ে বলে--'আবে, সাইড হ। নয়তো ট্রেন তোকে সাইজ করে দেবে!'

একটু আগেই মরার কথা ভাবছিল বিশু। কিন্তু কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল! এখন তার ফের বাঁচতে ইচ্ছে করছে। আবার নতুন করে বাঁচার স্পন্দন তার মধ্যে কখন যেন জম্বু নিয়েছে! সে রেলওয়ে ট্র্যাক থেকে বিদ্যুৎগতিতে সরে গেল।

কিন্তু মেয়েটার কি হল? সে সরছে না কেন? এক্ষনি ট্রেন এসে ওকে দুটুকরো করে দিয়ে যাবে! ও কি বুঝতে পারছে না যে ট্রেনের ধাক্কায় একমুহূর্তে ওর সুন্দর শরীরটা দলামোচা পাকানো একটা লাশে পরিণত হবে! নাকি মৃত্যুকে দেখে স্তুতি হয়ে গেছে!

--'তুমি কি করছ?' অসহিষ্ণু স্বরে বলল বিশু-'ট্রেন আসছে যে!'

ঠাঙ্গা গলায় জবাব এল-'জানি'।

--'এই ট্র্যাকেই আসছে'।

--'আমার চোখ দুটো কি বোতাম বলে মনে হচ্ছে তোর?' সে খিঁচিয়ে উঠল।

--'তবে সরছ না কেন?' বিশু ফুঁসে ওঠে-'ও_ও_ও! বুঝেছি! তুমিও আস্থাত্যা করতে চাও। একা একাই মরতে চাও। আমাকে দেখে হিংসে হয়েছে বলে ফোটাতে চাইছিলে! ওসব হবে না! রেলওয়ে ট্র্যাক কারও প্রাইভেট প্রপার্টি নয়। একা একা তোমায় আস্থাত্যা করতে দেবো না আমি। মরলে দুজনেই মরব'।

বিশু ফের ট্রেনলাইনে উঠে পড়ে। মেয়েটি তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায়-'তুই কোথাকার গান্ধু রে! আস্থাত্যা করবো কেন? কিন্তু আমার এই ঢ্যামনা জুতোর হিলটা শালা লাইনে আটকে গেছে, তাই নড়তে পারছি না!'।

--'জুতো আটকে গেছে! কি সর্বনাশ! কই দেখি!'

বিশু প্রায় হ্রমড়ি খেয়ে তার জুতোর উপর পড়েছে। প্রাণপণে টেনেটুনে খোলার চেষ্টা করল। ট্রেনটা তখন প্রায় কয়েকহাত দূরত্বে এসে পড়েছে। মেয়েটি অসহায় ভাবে ট্রেনের দিকে তাকাচ্ছে যে স্পিডে এগিয়ে আসছে তাতে হাত দেখালেও থামবে না। একমুহূর্তেই দুজনকে কচুকাটা করে চলে যাবে....!

সে বিশুর দিকে তাকায়-'তুই সর, এ জুতো খোলা যাবে না। একদম খাপে খাপ আটকেছে!'

--'ওর বাপ খুলবে....'

কোথা থেকে এত জোর পেল বিশু কে জানো। সে তখন জুতোর বকলস ধরে টানাটানি করছে। মেয়েটাও হাত লাগিয়েছে তার সাথে.... ওদিকে ট্রেন কয়েক হাতের মধ্যে এসে পড়েছে!.... তার জোরালো আলোয় দেখা গেল দুটো মানুষ রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে জীবন-মরণ লড়াই লড়ছে.... ট্রেন প্রায় ঘাড়ের উপর.... বিশুর চোখ বিস্ফারিত.... আসছে.... আসছে.... এসে পড়ল....।

কু-উ-উ-উ.... লম্বা সাপের মত গাড়িটা একটা বড় হইস্ল ছাড়ল। তারপর হড়মুড়িয়ে চলে গেল ট্র্যাকের উপর দিয়ে। দুটো লোকের কি হল তা জানতে তার বয়েই গেছে! হশহাশ শনশন করতে করতে ট্র্যাক কাঁপিয়ে, ইলেক্ট্রিকের তার কাঁপিয়ে সে নিজের রাস্তাতেই চলে গেল!

আর এ দুজনের? তাদের কি হল?

ট্রেন চলে গেল। আন্তে আন্তে একটা বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

ছুটো শরীর জড়াজড়ি করে পড়েছিল লাইনের পাশে। নিস্পন্দ! নিখর! প্রথম কয়েকমিনিট
কোনও সাড়া নেই। একেবারে মৃতদেহের মতই পড়ে আছে।

--'ওয়ে চিরকুট!', প্রথমে সাড়া দিল মেয়েটিই--'আছিস? না খাল্লাস হয়ে গেলি?',
কুঁইকুঁই করে উত্তর এল--'আছি'।

--'তবে উঠছিস না কেন?', সে বাঁধিয়ে বলে--'আমায় আয়েশা তাকিয়া পেয়েছিস না কি,
যে আয়েশ করে বুকটাকে তাকিয়া বানিয়ে শুয়ে থাকবি! বডি তোল্'।

বিশু একদম ছেলেমানুষের মত শুয়েছিল। অনেকদিন বাদে কোন নারীর বুকে এমন মাথা
রেখে শুয়েছে সে। ছোটবেলায় ভয় পেলেই মায়ের বুকে এরকম মাথা গুঁজে শুয়ে থাকত।
আজও তার বড় ভয় লেগেছে। ছুটে আসা ট্রেনটাকে দেখে হাল পাতলা হয়ে গিয়েছিল। আর
অদ্ভুত ব্যাপার, মায়ের বুকে যে নিষিণ্টতার গন্ধ ছিল, এই নারীর বুকেও অবিকল সেই
একই গন্ধ! এই গন্ধ বহুদিন পায়নি। এই গন্ধের জন্য কাঞ্চল হয়ে ছিল! ইলিতা, রাণী,
মৌমিতা, বসুধা, শিরিণ কিম্বা হালফিলের রঞ্জনা-কারুর বুকে এমন মায়াময় গন্ধ ছিল না!
সেখানে শুধু মাংসের চটচটে গদগদে গন্ধ!

কিন্তু এই নারী কে! মায়ের বুকের গন্ধ এর বুকে এল কি করে!

--'কি হল বে! একটা মেয়েছেলের সাথে ঘষাঘষি করতে খুব ভালো লাগছে না! উঠবি
না...'।

বিশু দু হাত তুলে দিয়ে 'ভজ গৌরাঙ্গ' হয়ে বলল--'মেরো না... আমি তোমাকে ছুঁই নি।
এই দ্যাখো... আমার হাত!'।

--'তবে এখনও ল্যাদ্ খাছিস কেন? ওঠ্ট!'।

--'আমার শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে'। বিশু পাশ ফিরে মেয়েটার চোখে চোখ রাখল--
'তোমায় একদম আমার মায়ের মত লাগছে। তুমি কে বলো তো!'।

--'ধুস্ বাল! খালিপিলি সেন্টু খেতে লেগেছে!', মেয়েটা ধড়মড় করে উঠে বসে। শাড়ি
ঝোড়েবুড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে--'যাঃ শালা! শাড়িটা মায়ের ভোগে গেল!'।

জুতোটা শেষমুহূর্তে অনেককষ্টে রেললাইন থেকে ছাড়াতে পেরেছিল বিশু। কিন্তু শাড়িটা
বাঁচাতে পারেনি। আঁচলটা রেললাইনের পাশের কাঁটা গাছে আটকে গিয়ে পুরো ফেঁসে গেছে।

--'এইজন্যই এসব চাপের জিনিস পরতে চাই না!', মেয়েটাকে একটু অসহায় দেখাল--'কি
ফান্টুস চিজ রে বাপ! একটু টান মারলেই ফড়ফড় করে ছিঁড়ে যায়!'।

বিশু পুরনো দিনের নায়কের মত নিজের উইন্ডচিটারটা খুলে দিল। রাতের দিকে এদিকে ঠান্ডা
ঠান্ডা হাওয়া দেয়। সেজন্যই পরে এসেছিল। বিশু যতই ন্যালা ক্যাবলা হোক, মরার পর
উপরওয়ালার দরবারে হাঁচতে হাঁচতে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। তাই উইন্ডচিটার!

--'নাও, এটা পরে যাও', সে উইন্ডচিটারটা এগিয়ে দিয়েছে--'অসুবিধে হবে না। পরে
ফেরৎ দিয়ে দিও'।

সুন্দরী চোখ বড় বড় করে বলল--'তুই তো দেখছি এক নম্বরের ঘোঁচু! আমি থোড়াই তোর
আঙ্গানা চিনি! ফেরৎ দেব কি করে?'।

--'না পারলে দিও না!', বিশু সহজ গলায় বলে--'শাড়িটা খুব বিছিরি ভাবে ছিঁড়ে গেছে।
উপরে এটা চাপিয়ে চুপচাপ চলে যাও'।

মেয়েটা এবার হো হো করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতেই বলল— শালা আইটেম বটে
একটা! আজ সারাদিন আমার মুড় ঝুলে ছিল। কিন্তু এবার দাঁত না কেলিয়ে পারছি না!
সত্যি করে বল্ মামা, তোকে কোন বোকাচোদা মাগীখোর বলেছে! এমন ন্যালাবোদা মাকড়া
আমি সারাজীবনে দেখিনি! তুই যদি মাগীবাজ হোস্, তবে শালা মাগীবাজদের থুক ফেলে
ডুবে মরা উচিত! হাঃ হাঃ হাঃ...’

হাসতে হাসতেই উর্বশী উইন্ডচিটারটা গায়ে দিয়ে চলে গেল। তার চলে যাওয়ার দিকে
তাকিয়েছিল বিশু। মেয়েটা একদম ব্যাটাছেলেদের মত বুক চিতিয়ে হড়ুম দুড়ুম করে হাঁটে।
তা হোক্। তবু বড় মিষ্টি। ভারি সোজাসাপ্টা! আর সবচেয়ে ভালো কথা, এই একটা মানুষ
পাওয়া গেল যে বিশুকে চরিত্রহীন ‘অসভ্য চোখ’ বলে মনে করে না!

বুকের মধ্যে একটা চিড়িক চিড়িক টের পাচ্ছিল সে। আর কি দেখা হবে না? কে ছিল
মেয়েটা? নামটা তো জানাই হল না! নবগ্রামে তো মেয়ের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু এতদিন
কোথায় লুকিয়েছিল এই মেয়ে!

হঠাতে খেয়াল হল, মেয়েটার একটা জুতো তার হাতেই রয়ে গেছে। এই জুতেটাই টেনেটুনে
বের করে এনেছিল বিশু। ফেরৎ দেওয়ার কথা মনে নেই!

জুতেটা যত্ন করে দুহাতে চেপে ধরল সে। কপালে থাকলে এই জুতেই আবার খুঁজে দেবে
ওকে।

বিশু মৃদু হাসল। বাঃ উপরওয়ালা, ফ্রাস্টু পান্তিকের জীবনেও তবে রূপকথারা আসে। সে
কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর মনে মনে ওর নাম দিল—সিঙ্গারেলা!

৯.

ক্র্যাও-ক্র্যাও-ক্র্যাও-ক্র্যাও-ট্যারাং-ট্যারাং... চিচক্যাও!

কি আশ্চর্য! থোবড়া অমন ঝুলে গেল কেন? আরে কিছু না! এটু ব্যাকগ্রাউন্ড মুজিক দিছি
গো মামা! জেমস্ বড়ের থিম আর কি!

কারণ? আর কি! আমাদের পিকুল মাথায় টুপি পরে টিকটিকিগিরি করতে বেরিয়েছে। বাবার
কালো ব্লেজার, কালো ট্রাউজার-দুটোই বেচারার গায়ে ঢিলে হয়েছে। হবে না-ই বা কেন?
ওদের বাড়িতে একমাত্র বাবাই দুর্ভিক্ষের কারণ। বাকিরা সবাই ফলাফল! তাই বাবার
পোষাক তার গায়ে এইসান ঢিলা হয়েছে যে আরেকটা লোককে তার মধ্যে দুকিয়ে দেওয়া
যায়!

পিকুল কিছুতেই মনে নিতে পারেনি, এই ঢিলেবন্টুওয়ালা বিশু এরকম দুঃসাহসিক কাজ
করতে পারে! অন্য কেসগুলো তবু মনে নিতে রাজি ছিল। কিন্তু ইঙ্গিতাদির বাড়ির জানলায়
চোখ রাখার ধৰ্ম বিশের নেই! এই যন্তরকে যে চেনে সে জীবনেও জানলা দিয়ে উঁকি মারবে
না! কার ঘাড়ে কঠা মাথা যে মাগীর চিনানি শুনতে যাবে! তার উপর বিশে ইঙ্গিতাদির
এক্স বয়ফ্রেন্ড ছিল। দুজনে প্রচুর ‘চুক্রচুক্র’ করেছে। বিশেও যন্তরপাতি নেড়েচেড়ে হাতের
সুখ করেছে নিশ্চয়ই। যখন মর্নিং, ম্যাটিনি, ইভনিং শো দেখে দেখে দেখার আর কিছু
বাকিই নেই, তবে ফের নাইট শো দেখতে যাবে কোন দুঃখে! তাও আবার ঐ ঝুলস্য ঝুল
ধর্জা মার্কা ফিল্ম!

নাঃ বিশে নয়। অন্য কেউ। অন্য কোনও ছুপা রূস্তম! পিকুল মনে মনে ঠিক করেছে, আর সুব্রতদার ফান্ডা শুনবে না। প্রচুর ভাঁটিয়েছে মালটা। ভাঁটিয়ে কান পাকিয়ে দিয়েছে। এখন আর ভাঁট শোনার সময় নয়। কিছু করতে হবে। করে দেখাতে হবে।

‘আঠের বছর বয়স কি দুঃসহ’! যদিও পিকুল আঠেরো নয়, উনিষ। তবু স্পর্ধা তার কিছু কম নয়! রাতের বেলায় খাওয়া দাওয়া সেরে, নিজের ঘরে পাশবালিশকে মিলিং সুট পরিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, জলের পাইপ বেয়ে গোয়েন্দাপিরি করতে নেমে এসেছে। রাতের অন্ধকারে কালো পোষাকে সে তদন্ত করতে চলেছে। অসভ্য ঢেখের পিছনের রহস্য খুঁজে বের করবে। করতেই হবে। নয়তো সমস্ত নবগ্রামের ছেলেপুলের প্রেস্টিজে গ্যামাঙ্কিন।

--‘আরে, পিকুল না!‘

বিন্তিপিসি এত রাতেও রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। রোজ রাতে কাজকর্ম সারার পর মহা শান্তিতে গুড়াকু দিয়ে দাঁত মাজেন তিনি। তারপর পাড়ার কলে গিয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক খোঁয়াক খোঁয়াক করে সারা পাড়াকে জানিয়ে দেন যে তিনি এবার শুতে যাবেন! আজও গুড়াকুরাঙ্গা দাঁত বের করে বললেন--‘এটা কি পরেছিস বাবা! তোকে যে কাকতাড়ুয়ার মত দেখায়!‘

এটা কি কমপ্লিমেন্ট! না অন্যকিছু! পিকুল বুঝে উঠতে পারে না থ্যাক্স ইউ বলবে কি না!

বিন্তিপিসিকে চটানোও ঠিক নয়। তাই উপায় না দেখে দাঁত কেলিয়ে ‘হে...হে...’ করল।

--‘তা এত রাতে এরকম বিদ্যুটে সেজেগুজে যাস কোথায়? থ্যাটারে না কি!‘

থিয়েটারই বটে। শখের ক্রিয়েটারের শকের থিয়েটার। স্বনিয়োজিত গোয়েন্দার প্রথম কদমেই এমন একখানা বুক ভেঙে দেওয়ার মত কমেন্ট। তবু কিছুতেই দমছে না পিকুল। হঁ হঁ বাবা, উনিষ বছর বয়স কি দুঃসহ!

সে কান টান চুলকে বলল--‘এই যাচ্ছি একটু নজরদারি করতে...’।

গুড়াকুর ডিবে থেকে আরেকটু তামাক তুলে নিয়ে দাঁতে ঘসতে ঘসতে বললেন বিন্তিপিসি-

‘নজর রাখতে যাচ্ছিস? তা কার উপর নজর রাখবি বাপ?’

--‘এখনও ঠিক করিনি। সে চিন্তাপিত--তবে যা শুরু হয়েছে নবগ্রাম...’।

--‘যা বলেছিস? পুচ করে খানিকটা থুতু ফেলে বললেন তিনি--পারলে ঐ হাড়গিলে হতচাড়া বিশেষার উপর নজর রাখ। এসব ফচকেমি ওরই। আমি পরশুও ওকে নবনীতাদের বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। অনামুখো কোথাকার’।

নবগ্রামেও তবে এমন একখানা মিস মার্পল আছেন! পিকুলের ভূরু কুঁচকে যায়। বিধবা বিন্তিপিসির বিশেষ কাজকর্ম কিছু নেই। বুড়ি বিলাস সাদাসিধে লাইফ লিড করে। পিসোর পেনশন আর একতলার ভাড়ার টাকা দিয়ে একলা মানুষের দিব্যি চলে যায়। ছেলে থাকে বিদেশে। সেখানেই মেম বিয়ে করে সেট্ল হয়ে গেছে। মাকে সে ও টাকা পাঠায়। অথচ বুড়ির জীবনযাপনে কোনও বিলাসিতা নেই। একখানা সাদা থান পরে থাকে। সিন্দ-ভাত নিজের হাতেই রেঁধে খায়। দিনভর আর কোনও কাজ নেই। জানলার সামনে বসে কুচকুচ করে সুপারি-ভাজা সুপারি জাঁতি দিয়ে কাটে, আর লোকজনকে লক্ষ্য করে। এটাই বুড়ির হবি। ওর চোখ এড়িয়ে নবগ্রামে একটা ভিনদেশি কাকও আসতে পারে না।

গোয়েন্দার প্রথম কাজ তথ্য সংগ্রহ করা। আর সেকাজে হেল্ল করতে পারে বিন্তিপিসি।

ব্যস্ত। নিজের কাজে লেগে গেল পিকুল।

--'পিসি, একটু মনে করে দেখো তো...' সে বলে--'আর কাউকে দেখেছ যাকে তোমার সাস্পিশাস মনে হয়?'

--'কি পিশাচ!'

কেলো করেছে! সাস্পিশাসের বাংলা করে বলল পিকুল--'পিশাচ নয়, সাস্পিশাস--সন্দেহজনক'।

--'তা বাবা, বললিই যখন, তখন বলি'। প্রবল উত্তেজনায় আরও একটু গুড়াকু দাঁতে দিয়ে বললেন তিনি--' রাবণটাকেও আমার সন্দ হয়! ঐ যে কি 'পিশাচ' বললি না? ও হচ্ছে আস্ত একটা পিশাচ! রাতের বেলায় ওসব ছাইপাঁশ গিলে কি করে বেড়ায় কে জানে! সেদিন আমাদের বাড়ির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এমন হেঁড়ে গলায় গান গাইছিল যে রাধেগোবিন্দুর নাম জপতেই পারি না। ওদিকে একতলায় শিবুর বৌটা রাতে একা থাকে। শিবুর নাইটডিউটি কি না!'

--'তারপর?'

--'তারপর আর কি?', পিসি হাসলেন--'বুদ্ধি থাকলে উপায় আসে। উপর থেকে দিলাম একবালতি জল ঢেলে ব্যাটার ঘাড়ে। তারপর থেকে আর এদিকের রাস্তা মাড়ায় না মিলে!,' জল ঢালার কথায় পিকুলের মনে পড়ে গেল, একবার সে এমন করেই একবালতি জল ঢেলে দিয়েছিল বাবার বন্ধু সুবীরকাকুর টাকে! আসলে সুবীরকাকুর টাকটা তার লক্ষ্য ছিল না। নীচে দুটো বিড়াল বহুৎ রোঁয়া ফুলিয়ে কাজিয়া করছিল। মা বলেন বিড়ালেরা যখন ঝগড়া করে তখন মাথায় জল ঢেলে দিলে ঝগড়া নাকি আরও বেড়ে যায়। যদি আগের লাফড়ার কারণ মাছের কাঁটা হয়ে থাকে, তবে সেসব ছেড়ে জল নিয়ে ঝগড়া চলতে থাকে। একটা বিড়াল বলে--'শালা, হলোর বাচ্চা--তুই আমার গায়ে হিসি করে দিলি!', অন্যটা বলে--'হারামজাদা, হিসি তো তুই করেছিস'। এই নিয়ে তু তু ম্যাঁও ম্যাঁও চলতেই থাকে! সত্যিই তাই হয় কি না দেখতে গিয়েছিল পিকুল। কিন্তু জলটা বিড়ালদুটোর গায়ে না পড়ে পড়ল সুবীরকাকুর টাকে। ফলস্বরূপ তার তুমুল ব্যথা হয়েছিল। সে ব্যথার কথা না হয় এখন থাক। পরে জায়গামত বলা যাবে।

--'আর কেউ পিসি?'

পিসি একটু ভেবে বলেন--'এই ভোলা মুদিটাকেও সন্দ হয়! ওর চরিত্রি সুবিধার না। তাছাড়া তোদের ক্লাবের সুব্রত। বুড়ো বয়েসেও বিয়ে করেনি। কেন বল্ব দিকিন! নিশ্চয়ই কোনো মেয়েছেলে রেখেছে। তারপর আমাদের শান্তনুর ছেলেটা...।'

--'কে? হ্রস্ব!', পিকুল চোখ কপালে তুলে ফেলেছে। শান্তনুদার ছেলেটার মুখটা অনেকটা ছঁকের মত বলে প্রথমে সবাই ওকে ছঁকে বলে ডাকত। সেটারই স্মার্ট সংক্ষরণ হ্রস্ব! কিন্তু...!'

--'বল কি পিসি! হ্রস্বের তো মাত্র সাত বছর বয়েস!'

--'তাতে কি হয়েছে!', পিসি বললেন--'যার হয় তার সাত বছরেই হয়, যার হয় না সাতাশিতেও হয় না! জানিস? সেদিন বাসে উঠে দেখি ও ছেঁড়া বাবার কোল থেকে নেমে সিটের নীচে বসে কি যেন দেখেছে! ওর বাপ জিজাসা করতেই বলল, 'সামনের সিটের দিদিটা না লাল রঙের প্যান্ট পরেছে। তাই দেখছিলাম...'।

বোঁো! আজকালকার বাচ্চাগুলোও সব একেকটা বিষ মাল! পিকুলের হাসি পেয়ে যাচ্ছিল।
কোনমতে হাসি চাপল।

--'ছোঁড়া তো নয়, বিষের গোড়া!...' বিভিপিসি একের পর এক সবার পোল খুলতে
শুরু করলেন। কবে হলোদা কার বাড়িতে উঁকি মেরেছিল। শীঁকালুদার সাথে বৌদির বনে না।
পাড়ার কোন্ পান্নিক দুইখানা বিয়ে করে বসে আছে। কে তার বৌকে ধরে ঠ্যাঙ্গায়। হাড়কাটা
গলিতে কার সেটিং আছে....ৱাঁ...ৱাঁ...ৱাঁ। শুনতে শুনতে পিকুলের ভয় লাগছিল। কখন
তার নিজের বাপেরই কীর্তি শুনতে হবে কে জানে! যেভাবে বলতে শুরু করেছেন বিভিপিসি
তাতে সাত বছরের ভুক্স থেকে শুরু করে ইল্লিতাদির কুকুর ঘোঁতনও বাদ যাবে বলে মনে
হয় না!

--'ইয়ে...পিসি...আমি একটু এগোই...'। সে আমতা আমতা করে বলে--'চতুর্দিকটা
একটু চক্র মেরে দেখি...'।

--'যা বাবা'। পিসি কলের দিকে এগোতে এগোতে বললেন--'তবে যা যা বললাম মনে
রাখিস। আর বিশেষটার উপর কড়া নজর রাখিস'।

--'আচ্ছা...আচ্ছা...'। বলতে বলতে প্রায় ওখান থেকে কান্টি মারল পিকুল। বেশিক্ষণ
দাঁড়িয়ে থাকা গ্রীতিমত বিপজ্জনক। বিভিপিসি যে এমন পি এন পি সি মাস্টার তা কে
জানত!

এখন বেশ রাত হয়ে এসেছে। নবগ্রামের রাস্তা শুনশান। দু একটা ঘিয়েভাজা নেড়ি রাস্তায়
মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে। পিকুলের পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকাল। কিন্তু পাতা দিল না।
পিকুল ঘড়ির দিকে তাকায়। রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। দোকান পাট সব বন্ধ হয়ে গেছে।
নয়তো এই মুহূর্তে একটু ফোঁকাফুঁকি বিজনেসের দরকার ছিল। ইশ্শশ্শ, বাবার পকেট থেকে
গোটা দুই তিন গোল্ড ফ্লেক ঝেড়ে দিলে মন্দ হত না। সিগ্রেটে টান না মারলে মাথাটা ঠিক
সাফা হয় না। বাড়িতে সিগ্রেট খাওয়ার ক্ষোপ তেমন নেই। মা রোজ সরেজমিনে তদন্ত করে
দেখেন তার পকেটে একটা সিগ্রেটের প্যাকেট বা দেশলাই পাওয়া যায় কি না! পেলেই
অগ্নিকাণ্ড করবেন। সেই ভয়েই বাবার পকেট ঝেড়ে ঝেড়ে সাফ করে পিকুল। বাবার সাথে
ডিল হয়েছে তার। দিনে তিনটে সিগ্রেটের বদলে মাসে একটা করে পায়রার জোগান দিতে
হবে।

তা মন্দ কি! সিগ্রেট খেলে তবু নিজেকে পুরুষ পুরুষ লাগে। নয়তো এখনও পান্নিক তাকে
বাচ্চা ছেলে বলেই চালাবার তাল করছে। এমনকি দেৰীও বলেছিল পিকুলকে নাকি 'বয়,
লাগে, 'ম্যান' লাগে না!

হ্যাঁ, পিকুলকে 'ম্যান' লাগবে কেন? 'ম্যান', তো ঐ হারামীর হাতবাল্ব পল্টু! দেৰীর যে
কি পছন্দ ওকে! এমন কি 'ম্যান', যে ওকে দেখলেই ট্যান খেয়ে পড়তে হবে! ঐ তো
হাতের কতগুলো মাস্ল সম্বল! একবার পাঁঠার মাংসের দোকানে একটা কাটা পাঁঠাকে দেখে
কেমন যেন চেনা চেনা লেগেছিল পিকুলের। পরে ভেবে দেখেছে, পাঁঠাটাকে অবিকল পল্টুর
মত দেখতে। ঐরকমই ছাগলে দাঢ়ি। ঐরকমই মাস্ল ঠেলে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। ঠাঁটের
তলায় গুজিয়া দাঢ়ি, তাগড়াই জুলপি আর খানকতক ফর শো মাস্ল থাকলেই কি পুরুষ
হওয়া যায়! অত সহজ নাকি!

দেবীর কথা মনে পড়তেই ব্যথাটা বড় প্রবল হয়ে উঠল। পিকুলের জীবনের প্রথম ও শেষ ব্যথা দেবী, ওরফে দেবাদৃতা। দেখলেই কিরকম ভয় লাগে। মনে হয়—এখনই বুঝি এসে জিজ্ঞাসা করবে—'বল জাড়াপহ মানে কি?' অথবা 'ক্যাটাক্লিজম কাকে বলে?' 'ধৃষ্টদ্যুম্ন কে ছিলেন?' , 'কুঞ্চিটিকা বানান কি?'

দেবী এরকমই। কম কথা বলে। নাকের উপর একটা ভারি পাওয়ারের চশমা। চশমার নীচ দিয়ে এমন করে তাকায় যেন কলেজের প্রিসি তাকাচ্ছ! অসম্ভব পড়ুয়া মেয়ে। রাগী রাগী ভারি চেহারা। পিকুল তো তার পাশে নেহাঁই খড়কে কাঠি। তবু ঐ মেয়েটাকেই ভালোবাসে সে। হোক্ না মোটা। হয়তো মড় মেয়েদের মত সেক্সি নয়। কিন্তু ভালোবাসা তো রোগা মোটা সেক্সি বোরিং দেখে না। ওর মত গোলাপি ফুলো ফুলো পাঁউরঞ্চির মত গাল তো ক্যাটরিনা কাইফেরও নেই। বিপাশা বসু কি অমন ভায়োলিন বাজাতে পারে? না ঐশ্বর্য রাই ধর্মঘটের সমাস বলতে পারবে? সেসব শুধু দেবীই পারে, আর কেউ না।

অথচ ঐ মেয়েটা যে কি দেখল ছাগলদাঢ়ি পন্টুর মধ্যে তা ভগাই জানেন! পন্টু তো দেবীকে পাতাই দেয় না। ওর চেহারা নিয়ে ফিচলেনি করে। কখনও 'হাতি' বলে, কখনও 'ডাইনোসোর'। ওর লাইন রাপচিক মডগুলোর সাথে ইনস্টলমেন্টে চলে। দেবী সব জানে, তবু পিকুলকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওকেই ভাও দেয়।

দেবী কি বোঝে না যে পিকুলের কষ্ট হয়! পিকুল কি এমন অপরাধ করেছে? দোষের মধ্যে দেবীর বাবা, সুবীরকাকুর টাকে একবালতি জল ঢেলে দিয়েছিল! তাও তো সঙ্গে বালতিটাও ফেলেনি! বালতিটা ফেললে ক্রিমিন্যাল অফেল হত। কিন্তু শুধু জলটা ধর্তব্যই নয়। অথচ সেটাকেই ইস্যু করে তার পাতা কাট করে দিল দেবী। পিকুল অনেক অনুরোধ করেছিল। বলেছিল—'আমার ভুল হয়ে গেছে দেবী, প্লিজ আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করিস্ক না।' দেবী নিষ্ঠুরের মত উত্তর দিয়েছে—'বাবার মাথায় বিনা কারণে জল ঢালার আগে মনে ছিল না।'

সে কি বলবে ভেবে না পেয়ে অক্ষম যুক্তি দেয়—'সে তো তোরাও বিনা কারণে ঝপঝাপ করে শিবের মাথায় গ্যালন গ্যালন জল ঢালিস। তা নিয়ে কি কার্তিক বা গণেশ কমপ্লেন করতে আসে?'

দেবী তার মুখের উপর দমাস করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পিকুলের বুকেও চিড় ধরেছিল। আজও সেই চিড় মিলিয়ে যায় নি। ব্যথাটা আরও বেশি টনটনিয়ে ওঠে, যখন দেখে পন্টুর সঙ্গে এক বাইকে যাচ্ছে দেবী। হাসতে হাসতে দুজনে পাড়ার মোড়ে ফুচকা খাচ্ছে, কিস্বা মল থেকে শপিং করে ফিরছে।

কেন দেবী? লঘু পাপে এমন গুরু দণ্ড কেন? পন্টু কি তোকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারবে? প্র্যাকটিক্যালের খাতায় তোর নামের নামাবলী লিখে রাখতে পারবে? পন্টু কি তোর কথা ভেবে ভেবে রোগা হয়ে যেতে পারবে? তোর জন্য আমি কত কিছু করলাম। কচি কচি ঘাসের মত দাঢ়ি গোঁফগুলোকে বারবার শেভ করে বাঁশের মত করার চেষ্টা করলাম। গালপাট্টা রাখার চেষ্টা করলাম। বাইক কেনার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। রাবণের কাছে মাস্ক বাগাতে পর্যন্ত গেলাম। কিন্তু কে জানত রাবণ হীরালালবাবুর কেসটা ধরে ফেলেছে! হতচাড়ি ডাঙ্গেল ছুঁড়ে মারল! তোর জন্য ডাঙ্গেল খেয়ে কি পন্টু মাথায় আলু গজাতে পারবে?

ভাবতে ভাবতেই ফোঁৎ ফোঁৎ করে কয়েকটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল পিকুল। দেবী আর কখনও কথা বলেনি তার সাথে। আর কখনও দেখা হয়নি। অথচ সে দেবীকে এখনও ভালোবাসে। দেবীর ঐ পিপের মত গোলগাল চেহারার কথা ভাবলেই বড় ফ্রাস্টু খেয়ে যায়। মনে মনে, স্বপ্নে কতবার যে—‘আই লাভ ইউ দেবী’, বলেছে তার ইয়ত্তা নেই।

তার দীর্ঘশ্বাসের সাথে নারকেল পাছের পাতাগুলোও তাল মিলিয়ে শিরশির করে ওঠে। রাস্তায় এখন একা পিকুল। চতুর্দিকে আর কেউ নেই। আশেপাশের বাড়িগুলোর আলোও নিভে গেছে। জ্যোৎস্নার আলোতে চারদিকটা ছায়া ছায়া লাগছে। অন্ধকারের মধ্যে একটা স্নিঘ্ন আলো মুচকি হাসির মত ছড়িয়ে। তার মধ্যে পিকুল আর তার ছায়া হেঁটে চলেছে অজানার পথে! রবিকাকুর বাড়ির সামনে এসে আচমকা থমকে গেল সে! ও কে? চাঁদনি রাতে একটা ছায়ামূর্তি সুট করে চলে গেল না বাড়ির দিকে! দূর থেকে হলেও স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে পিকুল। একটা আন্ত মানুষের মূর্তি। পা টিপে টিপে গেট খুলে চুকে গেল ভিতরে। এতক্ষণে তো রবিকাকুদের শুয়ে পড়ার কথা! তবে ওটা কে!

উত্তেজনায় পিকুলের মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল। ওটা নির্ধাঃ সেই ‘অসভ্য চোখ’! রবিকাকুর মেয়ে বুলা ক্লাস টুয়েলভে পড়ে। দেখতে শুনতেও মোটামুটি। ইনফ্যাষ্ট ওর চোখদুটো রামট্যারা না হলে হয়তো সুন্দরীই বলা যেত! রবিকাকু মেয়েকে আগলে আগলে রাখেন। মেয়েদের ইঙ্গুলে পড়ান। ছেলেদের সাথে কথা বলা বারণ! কথা বললেই পিঠে কিল। এখনও মেয়েকে নিয়ম করে স্কুলে-কোচিঙ্গে ছাড়তে যান। পাছে মেয়ে প্রেম করে, এই ভয়ে তাকে একা একা বাড়ি থেকে বেরোতেই দেন না! অন্যদিকে রবিকাকুর বৌ, মৃণাল কাকিমাও বেশ ডবকা! একজোড়া তুমুল বুকের অধিকারিনী! সে বুক এতেটাই ভয়ঙ্কর যে একবার পাড়ার ডাঙ্গার মৃময়দা মহা বিপদে পড়েছিলেন! বেচারা ডাঙ্গার স্টেথোক্সোপ নিয়ে হার্টবিট শোনার চেষ্টা করেই যাচ্ছেন! কিন্তু প্রত্যেকবারই আটকে যায়! স্টেথোক্সোপটা কোথায় রাখবেন ভেবেই পান না! অবশ্যে লজ্জার মাথা খেয়ে ডাঙ্গার সাহেব বলেই ফেললেন—‘আপনার ও ছটো একটু সরাবেন প্লিজ?’
কেলো বলে কেলো! পুরোপুরি ডেঙ্গি কেস!

সেই বাড়িতেই চুক্তে যাচ্ছে হতভাগা! দাঁড়াও... তোমার লোভনীয় সিন দেখা ঘোচাচ্ছি! ফুলপ্রফুল প্ল্যানের উপরে ফের একবালতি জল না ঢেলেছে পিকুল!

পিকুলও অন্ধকারে মিশে গুঁড়ি মেরে রবিকাকুর বাড়ির সামনে চলে এল। চলো জওয়ান... টেক ইওর পজিশন! বদমায়েশটাকে একদম হাতে নাতে ধরতে হবে। যাকে বলে ‘রজ্ঞাত হস্তে’ পাকড়াও করা!

ছায়ামূর্তিটা তখন রবিকাকুর মেয়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। বাড়ির সব আলো নেভানো। একটা গনগনে আগুনের শিখা দেখতে পেয়ে বুঝল, ব্যাটা সিগ্রেট ধরিয়েছে। পিকুলের মনটা উশখুশ করে উঠল! এইমুহূর্তে একটা সিগ্রেট পেলে বড় ভাল হত। বুকের ভিতরটা উত্তেজনায় ধূকপুক করছে। এবার সে ধরবে, ইনফ্যাষ্ট ধরেই ফেলেছে ‘অসভ্য চোখ’কে! ঐ তো! হতচাড়া জানলায় উঁকিবুঁকি মারছে। এইবার ক্যাঁক করে ধরলে হয় না?

--‘ম্যাঁও... ম্যাঁও... ম্যাঁও...’

যাচ্ছলে! এমন বিড়ালের ডাক ডাকছে কেন? সিন দেখতে হলে চুপচাপ দ্যাখ! অমন বিড়াল ডেকে সবার ঘুম ভাঙনোর উপক্রম করার মানে কি! এ তো ভারি অন্তুত ব্যাপার!

পিকুল আর সময় নষ্ট না করে সাঁৎ করে গিয়ে দাঁড়াল লোকটার পিছনো। এক সেকেন্ড অপেক্ষা করল। লোকটা তার থেকে একহাত লম্বা! কি করে কায়দা করবে স্ট্র্যাটেজিটা ভেবে নিল। তারপরই বিদ্যুৎগতিতে লোকটার গলা ধরে ঝুলে পড়ল! চেঁচিয়ে উঠল-'পে-য়ে-ছি...পে-য়ে-ছি...'।

লোকটা প্রথমে ভ্যাবচ্যাক হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটা বুঝতে পেরেই প্রায় খন্ডযুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছে পিকুলের সঙ্গে। প্রাণপণে তাকে ঘেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু পিকুলও বাষের বাচ্চা! সে একেবারে লোকটার গলা জড়িয়ে ধরে সেঁটে আছে। যতই ষাঁড়ের মত লফ়ুম্প করো না কেন, এত সহজে ছাড়ছে না।

লোকটার গলা ধরে ঝুলতে ঝুলতেই সে তখনও হেঁকে যাচ্ছে-'পে-য়ে-ছি...পে-য়ে-ছি-ই-ই-ই!'।

চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ঘরের ভিতরে আলো জ্বলে উঠল। রবিকাকু লুঙ্গি সামলাতে সামলাতে 'কি হল...কি হল, বলতে বলতে বেরিয়ে এসেছেন। একটু দূরেই লাঠি হাতে পাড়ার ছেলেরাও ছিল। তারাও চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে এসেছে। এসে দেখে ভয়ঙ্কর কান্ত! একটা হ্যাট কোট পরা লোক আরেকটা লোকের সাথে প্রবল মারপিট করছে।

পাহারাদার দলের কনিষ্ঠতম সদস্য বাবাই কি করবে ভেবে না পেয়ে হাতের লাঠিটাই গদাম করে বসিয়ে দিয়েছে কোট পরা লোকটার উপরে। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে-'আবে হেপাটাইটিস বি, আমাকে ঠ্যাঙ্গাছিস কেন? আমি পিকুল'।

ততক্ষণে অন্য লোকটাকে পাড়ার ছেলেরা ধরে সাইজ করে দিয়েছে। পিকুল কোনমতে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল-'এই লোকটা কাকুদের জানলা দিয়ে উঁকি মারছিল। আরও কিছু করার তালে ছিল। আমি ধরে ফেলেছি'।

মৃণাল কাকিমাও চোখ কচলাতে কচলাতে বেরিয়ে এসেছেন। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি হাঁ। রবিকাকুকে বললেন-'আরে, এতো তারক!'।

রবিকাকুও এবার লোকটাকে ভালো করে দেখলেন-'তাই তো! আমাদের তারক! তুই এতোরাতে এখানে কি করছিস?'।

পিকুল উত্তর দেয়-'আপনাদের জানলা দিয়ে উঁকি মারছিল কাকু, শুধু তাই নয়-বিড়ালের ডাকও ডাকছিল!'।

তারক রবিকাকুদের দ্রাইভার। রবিকাকুর জেন্টা সে-ই চালায়। প্রথমে তো কিছুতেই মুখ খুলবে না! কিন্তু পাড়ার ছেলেদের দাওয়াই পড়তেই সব গলগল করে উগরে দিল।

সে কাকুর জানলায় চোখ রাখার তালে ছিল না। শ্রেফ পালাবার তালে ছিল। একা একা নয়, সহচরী সমেত! এবং সেই সহচরীটি অন্য কেউ নয়, স্বয়ং রবিকাকুর মেয়ে ঝুলা! বিড়ালের ডাকটা সিগন্যাল ছিল। এই হতভাগা পিকুল ঘাড়ে এসে না পড়লে এতক্ষণে তারা ভোঁ ভাঁ হয়ে যেতে পারত।

রবিকাকু কথাটা শুনে হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পেলেন না! ঝুলা নিজেও ততক্ষণে ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সমস্ত ঘটনা দেখে-শুনে আকাশপ্রমাণ হাঁ করে কানা জুড়ল! রবিকাকু

একটা কানচাপাটি বাগিয়ে তেড়ে গেলেন মেয়ের দিকে—‘তোকে এত চোখে চোখে রাখি। আর তুই তলে তলে এই চিন্দিচোরটার সাথে ভাগবার তাল করছিস্? আজ তোর সবক, টা হাড় না ভেঙেছি...’।

বুলার কপালে দুঃখ ছিল। পিকুলই বাঁচাল। এমনিতেই এঁচোড়ে পাকা হিসাবে তার যথেষ্ট সুনাম আছে। আজ সেই সুনামের সম্বহার করল সে। কাকুকে থামিয়ে বলল—‘কাকু, কিছু মনে করবেন না! ফ্যামিলির ড্রামা গুলো চার দেওয়ালের মধ্যে থাকলেই ভালো হয় না?’ পার্লিকলি মারপিট করে লাভটা কি হবে? আপনার মেয়ে কি শুধরোবে? যদি চাঁটা খেয়েই সবাই শুধরোত, তবে পুলিশের ট্রিটমেন্টেই এতদিনে সব চোর-লুচাগুলো সাধু-সন্ধিসি হত। বলতে বলতেই তার মুখ গম্ভীর হল—‘তাছাড়া মেয়েকে চাঁটানোর আগে নিজেকে চাঁটান। বুলার থেকে বেশি দোষ আপনার নিজেদের। মেয়েকে ছেলেদের সাথে মিশতে দেবেন না, কথা বলতে দেবেন না, সবসময় আগলে আগলে রাখবেন! এভাবে আটকে রাখলে ও বুবাবে কি করে যে ছেলেরা শুধু লাইন মারতেই জানে না, দোষি করতেও জানে। ছেলেরা দাদা হয়, ভাই হয়, বন্ধু হয়। এসব কিছুই জানে না বুলা। শুধু জানে ছেলে মানেই ই.টি! ফুলটু ব্যান্ড জিনিস। আর এই বয়েসে নিষিদ্ধ মালের দিকেই ছেলেমেয়েরা বেশি ঝোঁকে। ওকে যদি সমুদ্র, নদী না দেখান, তবে তো ও পচা ডোবা দেখলেও সমুদ্র ভেবে লাফিয়ে পড়বে! ভালো ছেলেদের সাথে কখনও মেশেনি বলেই এই হারামী তারকটাকেই দেবদূত বলে মনে হয়েছে। এতে বুলার যতটা দোষ, তার থেকে অনেক বেশি দোষ আপনাদের। কথাটা ভেবে দেখবেন’।

রবিকাকুর হাতের চড়টা হাতেই রয়ে গেল। কেমন যেন ‘বর্ণীয় জ’ এর মত মুখ করে তাকিয়ে আছেন পিকুলের দিকে।

--‘একটা সিপ্রেট দে তো।’ পাঁচুর কাছ থেকে একটা ক্লাসিক নিয়ে হাসল সে—‘আসি।’ গুরুজনদের সামনে স্টিম ইঞ্জিনের মতো ধোঁয়া ছাড়া উচিং নয়। তাই পিছন ফিরে সিপ্রেটটা ধরিয়ে আপনমনেই হাসতে হাসতে ফেরার পথ ধরল পিকুল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল—

দেখে যা দেবী, তোর জন্য আমি সমাজ সংস্কারকও হয়েছি। প্রেম যে মানুষকে কি কি বানায়!

১০.

--‘হীরালালবাবু আছেন?’

সকাল থেকে এই নিয়ে ন, নম্বর ফোন! খিস্তি দিতে দিতে ল্যান্ড থেয়ে পড়েছে বাবন। এই মুহূর্তে তার আর কাঁচা খিস্তি দিতে ইচ্ছে করল না। ধ্রাম করে টেলিফোনটা ক্যান্ডলে নামিয়ে রেখেছে সে। আগের রাতের হ্যাঁ ওভার কাটেনি। লাল লাল চোখ করে বেডকভারটার দিকে তাকাল সে। ধুস্ শালা, অনেক হয়েছে। এবার ঝুলে পড়লেই হয়। অন্তত বেজম্মা হীরালালটার নাম এ জম্মে আর শুনতে হবে না।

বোধহয় সত্যি সত্যিই ঝুলে পড়ত, কিন্তু তার আগেই বাধা! কতগুলো দানবের মত লোক তার ঘরে গদাম গদাম করে তুকে পড়েছে। এমন করে পা ফেলে তুকল যেন মানুষ নয়, ইয়েতি তুকছে!

--'কি ব্যাপার!', বাবন ঘাবড়ে গিয়ে বলল--'আপনারা কারা!'

--'চুপ বে!', একজন বলে--'চিনামিলি ভাইয়ের পছন্দ নয়!'

ভাই! কোন্ ভাই! সে আকাশ থেকে পড়তে পড়তেও ঘুড়ির মত গোঁতা খায়! কার ভাই!
কোথাকার ভাই!

--'আবে গান্ধু, বড় ভাইয়ের কথা বলছি'।

বলতে বলতেই বড় ভাই এসে ঢুকলেন। এইবার মনে পড়ল বাবনেরা সেরেছে! এতো লাটু
মন্তানের মা! এলাকার বড় ভাই! আজ পরণে একটা হলুদ রঙের পাঞ্জাবি যথারীতি হাতা
গোটানো। চোখের সানগ্লাসটা আগের বার কালো ছিল। এবারেরটা নীল! ঠোঁটের একপাশে
পাইপ ঝুলছে। গলায় সোনার হার। হাতের হাঁয়ের আঙ্গটি, বার্মিজ চুনী, পানা ঝলমল
করছে।

কেস্টা কি? আগেরবার মাল খেয়ে বাওয়াল করে ফেলেছিল। তারই বদলা নিতে এসেছে
নাকি! বাবন ভয়ে ভয়ে তাকায়। নির্ধারিত চ্যালাচামুভা নিয়ে পেঁদিয়ে তাকে পরোটা বানাবার
জন্য এসেছে।

বড় ভাই কিন্তু ঝাড়পিটের কোনও লক্ষণ দেখালেন না। বরং বাবনের সামনের সোফাটায়
আরাম করে বসে পড়লেন। চোখ থেকে রোদ চশমাটা সরিয়ে গুলগুল করে তার দিকেই
তাকাচ্ছেন। ভালো করে মাপছেন।

--'এই, চিরকুটো, তোরা এবার ফোট্। আমি পার্মানেন্টলি এখন কথা বলব,'।

পার্মানেন্টলি কথা বলবেন! বাবন ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। পার্মানেন্টলি কথা বলার অর্থ কি!

পার্মানেন্টলি খচ্ছা করে দেবে! সে এক মুহুর্তেই আশঙ্কায় ল্যাম্পপোস্ট হয়ে গেল।

--'ওঃ ভাই'। পচা বলল--'পার্মানেন্টলি নয়, পার্সোনালি'।

--'শ্লা, তোর পার্মানেন্ট, প্রেগনেন্ট, পার্সোনালের গাঁড় মারা গেছে'। প্রায় তেড়েই গেলেন
বড় ভাই--'ফুটবি না ফোটাতে হবে'।

অতবড় গভীরের মত লোকগুলো পিঁপড়ের মত সুড়সুড় করে কেটে পড়ল।

--'যতসব গান্ধু পান্নিক'। বড় ভাই এবার বাবনের দিকে তাকালেন--'মাইন্ড খাস্ না।

এগুলোর বড়ির মত ভেজাগুলোও নিরেট। দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? লাশ ফেল্'।

অ্যাঁ! লাশ ফেলবে! কি চাপের কথা! এমনি এমনি কি করে লাশ ফেলবে! আত্মহত্যা
করতে বলছে না কি!

--'ওয়ে, কানখাজুরা! কি হল? বস্'।

ও! বসতে বলছেন তিনি! বাপরে! এমন ভাবে বলছেন যেন বাড়িটা তারই। বাবন সেখানে
বেড়াতে এসেছে!

ভিজে বেড়ালের মত গুটিশুটি বসল সে, মানে লাশ ফেলল!

বড় ভাই তার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পিটপিটালেন। তারপর বললেন--'কি কেস বে?'।

--'অ্যাঁ?'।

--'তোর কেসটা কি?', তিনি আয়েশ করে পাইপে টান মারলেন--'বকে ফ্যাল, আজ কাজ
নেই। শুনি, তোর কি লোচা!'।

--'লোচা!', বাবন ঢোক গিলল। এ আবার কি জাতীয় আবদার! কি বলবে সে!

- 'দ্যাখ্ বাড়া, আমি কচি চিকনি নই'। বড় ভাই বলেন--'সেদিন মাল খেয়ে কি বকুচিলি যেন, বাঁচতে ভয় করে, মরতে ভয় করে--আরো কি সব ভাঁটাচিলি...'।
- 'ভুল হয়ে গেছে বড় ভাই'। সে প্রায় গলবন্ধ হয়ে বলে--'খুব ভুল হয়ে গেছে। মদ খেয়ে ভুলভাল বকে ফেলেছি। কথা দিচ্ছি আর কখনও মদ খাবো না...'।
- 'মাল খাবি না সে তো ভালো কথা'। তিনি মাথা নাড়েন--'মাল জিনিসটা বহৎ খানকি চিজ। একবার ধরলে চিপকেই থাকে। প্রথমে তুই মাল খাবি, তারপর মাল তোকে খাবে'। বলতে বলতেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন--'আমারও না খাওয়াই উচিত। না খেলে হয়তো লাশ ফেলার আগে আরও টাইম পেতাম। কিন্তু...'।
- থেমে গেলেন তিনি--'ছাড় ওসব খেজুর। তোর কথা বল। তোর ক্যাঁচালটা কি? বৌ বডি ফেলেছে? না ভেগে গেছে?'।
- 'পালিয়ে গেছে'। বাবন মুখ নীচু করে বলে।
- 'কেন বে?'।
- ভয়ে ভয়ে অনিন্দিতার ইতিহাস বিবৃত করে বাবন। সব শুনে আফসোসসূচক চুকচুক শব্দ করলেন বড়ভাই--'ম্যাড...রিয়েলি ম্যাড...'।
- বাইরে থেকে আওয়াজ এল--'স্যাড ভাই, ওটা স্যাড হবে'।
- 'শুয়োরের বাচ্চা!'। বাইরের আওয়াজ লক্ষ্য করে শব্দভেদী বাণের মত নিজের জুতোজোড়া ছুঁড়ে দিলেন বড়ভাই--'হারামী, বলেছি না ফুটে যেতো। তুই বোকাচোদা, বাইরে দাঁড়িয়ে সব কথা মাড়াচিস! চুতিয়া.....'
- বাইরে থেকে ফের আওয়াজ এল--'সরি ভাই সরি...'।
- 'সরি নয়, এবার সর। নয়তো মাইরি একেবারে দুনিয়া থেকেই সরিয়ে দেব তোকে। বাঞ্ছেত কাঁহিকা'। বড়ভাই আরও একচোট গালাগালি দিয়ে অবশেষে থামলেন। একটু দম নিয়ে বললেন--'হ্যাঁ, তোর স্টোরি জারি রাখ, শুনছি'।
- 'স্টোরি আর কি ভাই। সে ঐ হীরালালটার সঙ্গে চলে গেল। ব্যস্ত'।
- 'যাঃ শালা। মালটা চলে গেল, আর তুই যেতে দিলি!'। বড় ভাই উত্তেজিত--'আরে, সে মাগী তোর নাইফ ছিল!'।
- নাইফ! ছুরি! অনিন্দিতা কি ছুরি ছিল! বাবন একটু ভাবল। হ্যাঁ, ছুরিই বটে। বুকটা একেবারে ফালাফালা করে দিয়ে গেছে....।
- সে কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই বাইরে থেকে ফের আওয়াজ--'ওয়াইফ'।
- 'তবে রে শ্লাই...তোর ইঞ্জিনির এইসি কি তেইসি...'। বড়ভাই প্রায় তেড়ে গেলেন দরজার কাছে। বাবন সভয়ে দেখল একটা মুষকো ষষ্ঠা ইঁদুরের মত পাঁই পাঁই করে পালাচ্ছে! দৃশ্যটা দেখে তার ব্যাপক হাসি পেয়ে গেল! কিন্তু হাসলে বড়ভাই যদি মাইন্ড খান্। তাই মুখে কুলুপ এঁটেই থাকল।
- 'হ্যাঁ...কি বলছিলাম যেন'। বড়ভাই ফের এসে বসেছেন সোফায়--'তুই তোর বৌকে খোঁজার চেষ্টা করিস্নি?'।
- 'না'।

--'তুই কিরকম মরদ বে?' তিনি উত্তেজিত--'তোর মাল কোথায় গেল খুঁজবি না! আমাদের লাইনের মরদ হলে ঠিক পাকড়াও করে ধরে আনত। তারপর হয় দানা নয় চিকনি ছুকিয়ে দিত বুকে, ব্যস্ত সব ছেনালিপনা খতম। আজকালকার চ্যাংড়া ছেঁড়াগুলোকে দেখিস্ না? সব কচি কচি পার্শ্বিক। বয়েস উনিশ কি কুড়ি। স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করো। কিন্তু কি দম একেকটাৰ! মেরেছেলেগুলো বেশি ছেনালিপনা করলে মেরে পুঁতে দেয়! খবরের কাগজ পড়িস্ না? এই তো কালও একটা ছেলে তার রসের মাগীকে খুন করেছে! মাগী অন্য নাগৰের সাথে ঢলাঢলি করছিল। ব্যস্ত, দিয়েছে একেবারে গলা টিপে!,' বলতে বলতেই হাসলেন--'ও ছেলে বড় হলে মন্ত ভাই হবে মাইরি!'

বোৰো! কি ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী! বাবন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। কয়েক মুহূৰ্ত নিষ্ঠৰু থেকে বলে--'তাতে কি হয় ভাই? বড়জোৱ গায়ের ঝাল মেটে। কিন্তু ভালোবাসার নাম কি গায়ের ঝাল মেটানো? ধৰুন অনিন্দিতা আমায় দাগা দিয়েছে বলে আমি ওকে খুন করে বসলাম। তাতে আমার রাগ মিটল। তারপর? আমি কি পাবো? অনিন্দিতার ভালোবাসা পাবো? ওৱ লাশটা আমায় ভালোবাসবে? প্ৰেম, ভালোবাসা এমন একটা জিনিস যা গায়ের জোৱে, বাটাকার জোৱে পাওয়া যায় না। বড়জোৱ কাউকে খুন কৰতে পাৰি। কিন্তু যদি সত্যই আমি ওকে ভালোবেসে থাকি, তবে আসলে তো নিজেৰ হাতেই নিজেৰ ভালোবাসাকে খুন কৰলাম। যাকে সিঁদুৱ পৱিয়ে এনেছি, ভালোবেসেছি, তার রক্ত দেখি কি কৰে ভাই? সে যদি আমার কাছে না থাকতে চায়, তবে তাকে মুক্তি দেওয়াই ভালো নয়? সে যদি সিঁদুৱৰ ভালোবাসার মূল্য না বোৰো তাতে তো তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় না।'

--'হ্ম, হৱ ওৱত কা খোয়াব হোতা হ্যায় এক চুটকি সিন্দুৱ! হৱ সুহাগন কি স্ৰী কা তাজ হোতা হ্যায় এক চুটকি সিন্দুৱ!...,' বলতে বলতেই বড় ভাইয়েৰ শ্বাস জোৱে জোৱে পড়তে লাগল। চোখ দুটো লাল হয়ে গেল। কয়েকমুহূৰ্ত নিষ্ঠৰুতা। পৱক্ষণেই হা হা কৰে কেঁদে উঠলেন।

কেলো কৱেছে! ভাই কাঁদছেন! এই দৃশ্য তার পন্টৱেৱা দেখলে নিৰ্বাণ বাবনেৰ লাশ ফেলে দেবে! হঠাৎ কৰে ভাই এমন সেন্টু খেয়ে গেলেন কেন কে জানে! শুধু তাই নয়, সে সভয়ে দেখল, মহিলাৰ নাক বেয়ে টপটপ কৰে কাঁচা রক্ত পড়ছে!

সৰ্বনাশ! এখানেই টপকাবেন নাকি মহিলা! তাহলে ভগৱানও বাবনকে বাঁচাতে পাৱবেন না! সে দ্রুত এগিয়ে গেল ভাইয়েৰ কাছে--'ভাই, কি হল?'

ভাই ততক্ষণে কাৎ হয়ে পড়েছেন। তবু বললেন--' ওম শান্তি ওমেৱ ডায়লগ। এতবাৱ দেখেছি যে শ্বা পুৱো ভেজায় রেকৰ্ড হয়ে গেছে! চাপ নিস না... তোৱ বাথৰুমটা কোথায়?'

--'এই তো... এইদিকে...,' সে ব্যস্ত এবং উদ্বিগ্ন--'আপনি একা যেতে পাৱবেন?

ডাক্তার... অ্যাস্থুলেপ ডাকবো?'

--'ধুস্ হলকট!, মহিলাৰ কষ্ট হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও কষ্ট কৰে হাসলেন--ডাক্তার নয়, পাৱলে যমদূতকে ডাক। সে ছাড়া আৱ কোনও শ্বা আমায় ঠিক কৰতে পাৱবে না। বলতে বলতেই অতিকষ্টে উঠে বসেছেন--লাইফে অনেক লাল দেখেছি বে, একটা লাল ছাড়া। এইটুকু রক্ত আমার বাল ছিঁড়তেও পাৱবে না। তোৱ বাথৰুমটা...,'

বাবন হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিল। ভাই উঠে দাঁড়িয়েছেন। সে ধরতে গেলে বললেন—‘ধরিস না। পারবো’।

অগত্যা। সে ভয়ে ভয়ে সোফাতেই বসে থাকল। মহিলা যদি তার বাথরুমেই পটল তোলেন, আর তার চ্যালারা এসে দেখে তাদের ভাই বাবনের বাথরুমেই বডি ফেলেছেন, তবে বাবন কি আর আস্ত থাকবে! তার ভয়ানক রিষ্টি এসে উপস্থিত হবে!

ভাবতেই ভয়ে পুরো ইয়ে খাড়া হয়ে গেল বাবনের। ওদিকে বাথরুমে জলের কলকল আওয়াজ। হল কি? মহিলা স্নান করছেন নাকি!

পুরো পাঁচ মিনিট যম যন্ত্রণা ভোগ করার পর, অবশ্যে বড় ভাই বেরিয়ে এলেন। এখন তাকে খানিকটা সুস্থ লাগছে। সোফায় এলিয়ে পড়ে আদেশ করলেন—‘ঘরে মাল আছে?’ এংহে, নবগ্রামের দোর্দেন্দপ্রতাপ বড় ভাই তার ঘরে পায়ের ধুলো ফেলেছেন, অথচ তাকে কোনরকম খাতির করা হয়নি! বড় ভুল হয়ে গেছে বাবন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়—কি খাবেন বলুন ভাই, চা-কফি...?’

--‘চা-কফি তোর বাপকে খাওয়াস। রাম আছে?’

সে ঢেঁক গিলল—‘আছে ভাই’।

--‘নিয়ে আয়। আর বাইরে গান্ধুগুলো দাঁড়িয়ে আছে দ্যাখ। ওদের বল চিকেন তন্দুর নিয়ে আসতে।’ পাঞ্জাবীর হাতায় মুখ মুছলেন তিনি—‘খালিপিলি দিমাগ চাটলে এক থাবড়া লাগিয়ে দিস্।’

কে কাকে থাবড়া লাগায়! তবু সে আমতা আমতা করে বলে—‘আচ্ছা ভাই’।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাম আর চিকেন তন্দুর চলে এল। বেশ কয়েক পেগ পেটে পড়ার পর ভাই বেশ তলুঁতলুঁ হলেন। আয়েশ করে সোফার উপরে আধশোওয়া হলেন—‘তুই মাইরি ভালো মাকড়া আছিস্। গুড়...ভেরি গুড়। এ জম্মে কম তো মরদ দেখলাম না। কিন্তু যেদিন বাজারে লাট খাচ্ছিলি সেদিনই মনে হয়েছিল, তুই মালটা অন্যগুলোর মত ঢ্যাম্না নোস্। তোর বৌটা একটা খানকি। শা-লি সিঁদুরের ভাঁও বুবল না! আর কত পার্সিক আছে মার্কেটে, যারা এটুকুর জন্য হেদিয়ে মরছে!...হৱ ওরত কি খোয়াব হোতা হ্যায় এক চুটকি সিন্দুর....!’

ফের শুরু হল ওম শান্তি ওম! ব্যাপারটা কি রে বাবা! মহিলা ঘুরে ফিরে একই ভাঙ্গা গ্রামাফোন রেকর্ড বাজাচ্ছেন কেন?

লাইনটা প্রায় মুখস্থ বলে একটু চুপ করলেন তিনি। আস্তে আস্তে বললেন—‘তুই খুব চম্কে যাচ্ছিস্—তাই না? ভাবছিস, শ্লা, এই জাঁহাবাজ মাগী কি সব ভাঁটিয়ে দিমাগের দই বানাচ্ছে! কিন্তু আমি মানুষ চিনি। পারলে তুই-ই পারবি। তুই আমায় মদত কর। এ তল্লাটের মাকড়াগুলো তোর কাছেই বডি ফোলাতে আসে না? পাড়ার-বেপাড়ার অনেক ছেঁড়াদের চিনিস তুই। আমায় মদত দে। জবান দিছি মরার আগে তোকে আমির করে দিয়ে যাবো। আর যদি না পারিস্ তবে চুম্বুভৰ্ জলে ডুবে ফৌত হব’।

এইবার বোৰা গেল ব্যাপারটা! মহিলা কোনও দরকারে এসেছেন। ওরেং শালা! কাউকে খরচা করতে হবে না তো! বাবন বাইরেই এমন যমরাজের মত দেখতে। কিন্তু তার অত ঋক নেই। মহিলা কি সুপারি দিতে এসেছেন নাকি! তবে মরেছে বাবন!

সে ভয়ে ভয়ে বলে—'কি করতে হবে'।

--'হে-পি-ও-ঝে-ল্লিং'।

ওয়েল্লিং কি করে হ্যাপি হয় তা অনেক ভেবেও চাঁদিতে টুকল না। অবশ্য বেশিদূর ভাবতেও হল না। মহিলা নিজেই বুঝিয়ে দিলেন—'বিয়ে শাদি বুঝিস্? তাই করাতে হবে। লাশ ফেলার আগে এটাই আমার লাস্ট উইচ'।

এই বয়েসে বিয়ে করবেন! মরার আগে বিয়ে করার শখ হয়েছে! সে কি বলবে ভেবে পেল না! কি ডেঞ্জারাস লাস্ট উইচ!

--'দ্যাখ্, আমি জীবনে অনেক খুন-খারাপি দেখেছি'। তিনি গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন—'বললাম না, অনেক লাল দেখেছি। কিন্তু একটা লাল কখনও দেখিনি। সিঁদুর! সিঁদুর পরার নসিব ছিল না বুঝলি। ছিলাম কয়েক পয়সার ছেনাল। লাটুর বাপের পছন্দ হল। একদিন ঘাড়ে করে, দালালগুলোর লাশ ফেলে দিয়ে ঘরে নিয়ে এল। তোরা কি যেন বলিস্, লিভ টুথ...কি যেন...'।

--'লিভ টুপেদার?'।

--'হ্যাঁ। ঐ সেটিংই ছিল। বিয়ে শাদি হয়নি। লাটুর বাপটা ছিল এক নম্বরের ট্যারা মাল। রাস্তির সাথে শোবে, কিন্তু বিয়ে করবে না! ওর আরেকটা মাগী ছিল। সেটার সিঁদুর জুটেছিল। কিন্তু থাকত মাকড়া আমার সাথেই'।

বাবন চুপ করে শুনছিল। বড় ভাই কেন এসব কথা তাকে বলছেন তা সে এখনও বুঝতে পারেনি! তবু মহিলার কথার মধ্যে কি যেন একটা বেদনা ছিল।

--'দ্যাখ্ বে, আমার নসিবে যা হওয়ার, হয়েছে। লাটুর বাপটা মরার পর বুঝেছি এইসব বড়ি ফেলে দেওয়ার কাজ বল্হ পাপের কাজ'। মহিলার চোখ চিকচিকিয়ে ওঠে—'তুই দশটাকে টপকাবি, আরও দশটা এসে তোকে টপকাবে। যতই রোয়াব দেখাস না কেন, ফৌত তোকে হতেই হবে! হয় পুলিশ আম সড়কে মেরে লাশ হাপিশ করবে, শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে, নয়তো দুশমনরা মেরে দিয়ে চলে যাবে। উপরওয়ালা সব হিসাব রাখো। তুই কারুর নামে সুপারি খাবি, সেও তোর নামের সুপারি খাবে। খুনের শোধ তোকে জান দিয়েই চুক্তা করতে হবে। বুঝলি?'।

--'বুঝেছি ভাই'।

মহিলা ভেজা চোখে হাসলেন—'জানি তুই বুঝবি। সেদিন তোর কথা শুনেই বুঝেছি। একটা কথা সাফ সাফ শুনে রাখ্। এ লাইনে তুই যত বড় শ্রেণ হ, মরবি সেই কুত্তার মওত! বলেছিলি না। বাঁচতে ভয় করে কি না? করো। এ লাইনে বেঁচে থাকাটাই ভয়ের। নিজের জন্য শ্বা, মগজমারি নেই। ভয় হয় লাটুর জন্য। লাটুটার জন্য বিন্দাস মরতেও পারছি না। আমার আখ্যা লাইফে যা হয়েছে, হয়েছে—কিন্তু লাটুর কিসমত আমার মত হবে না। ওর কপালে সিঁদুর জুটিয়েই যাব আমি'।

এতক্ষণে প্রসঙ্গটা বুঝাল বাবন। মহিলার দিকে তাকিয়ে দেখল, তিনি কাঁদছেন! এই প্রথম মনে হল, বড় ভাই নয়, লাটুর মা বসে আছেন তার সামনে!

--'লাটুটার মেজাজ ওর বাপের মতই। কিন্তু উপরওয়ালার কিরে, ও খারাপ নয়'।

কাতরস্বরে বললেন তিনি—'হারামের দুনিয়া ওকে অমন বানিয়েছে। সিঁদুর পেলে শুধরে যাবে।

একবারই মেহেন্দি লাগিয়েছে হাতে। শুয়োরের বাচ্চা নূট মন্ডলটাকে টপকেছে। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত আর কোনও বড়ি ফেলেনি। মেরে বড়ি পার্টস হিলিয়ে দিয়েছে, খোবড়ার জিওগ্রাফি পাল্টেছে। কিন্তু মা কসম্, জানে মারেনি। মেয়েছেলের মত মানুষ হয়নি, তাই ব্যাটাছেলেদের মত হাবভাব। তবু, আমি জানি, ও বদলাবে। আমাদের মত আনপড় মাগী নয় তো, এগারো ক্লাস অবধি পড়েছে। বুঝতে টেম(টাইম) লাগলেও বুঝবে, এ হারামের লাইনে কোন লাইফ নেই, মরা ছাড়া রাস্তা নেই। তাই...।

ভেজা ভেজা ঢোখজোড়া তুলে তাকালেন লাটুর মা- তুই মদত করবি না?'

বাবন কি বলবে ভেবে পায় না! লাটু মন্ডানের জন্য ছেলে দেখার চেয়ে বাষের গলায় মালা দেওয়া সহজ! কিন্তু লাটুর মায়ের মুখ চেয়ে 'না' বলতে পারল না সে। বলল- 'চেষ্টা করবো'।

লাটুর মা হাসলেন- 'জানতাম তুই বুঝবি। সেটিং শুরু করে দে আবার দুদিন পরে এসে জেনে যাবো কতদূর কি করেছিস'।

দুদিন পর আবার আসবে! ওঃ সুশ্রব! ততদিনে কি সেটিং করবে বাবন! নিজেই না সেট হয়ে যায়!

-- 'ওকে বড়ভাই'।

-- 'শিউলি'। লাটুর মা মিষ্টি হাসলেন- 'ওটাই আমার নাম বে!'.

১১.

-- 'ধূর বিশুদ্ধা, প্রেমের ভাই হয়েছে! ভালোবাসার ভাই হয়েছে। দুনিয়ায় ভালোবাসার কোনও মানে নেই। প্রেমিককে আজীবন শ্রেফ লাখ খেতে হয়! তুমি ভালোবাসলে, আর তোমার লাইফও মায়ের ভোগে গেল'।

এই দার্শনিক ফ্রাস্টেশনের ইলাজ কি করে করবে বিশু ভেবে পায় না। এ কথা তার চেয়ে বেশি ভালো আর কেউ জানে না। সারাজীবন তো প্রেমের লাখ খেয়েই এল। এ যে কতবড় বাস্তব তার এগজাম্পল স্বয়ং সে নিজেই!

কিন্তু আজকাল তার মনে হয়, এর বাইরেও অন্য কোনও বাস্তব আছে। আরও কিছু আছে। নয়তো সে তো তার ফ্রাস্টেটেড লাইফের দি এন্ড করতেই যাচ্ছিল। আরেকটু হলেই- 'ইতি

বিশু, হয়েই যাচ্ছিল। হঠাতে করে তবে নয়া চ্যাপ্টার খুলে গেল কি করে? সিন্ডারেলা এল কেন? আগে ভাবত-এই জীবন নিয়ে কি করবে? কি করতে হয়? এখন বুঝেছে, অপেক্ষা করতে হয়। সঠিক সময়ের অপেক্ষা। সঠিক মানুষের অপেক্ষা। জীবন একটা নদীর মত। কোনও বাঁকে ধূ ধূ বালির চড়া, আবার কোনও বাঁকে সবুজ ধানের ক্ষেত। কোথাও মরীচিকা, কোথাও সত্যিই টলটলে জলের ত্বদ। দুদিকই তোমাকে দেখতে হবে। কারণ জীবন আদতে জার্নি! মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিলে অনেক কিছুই অধরা, অদেখা থেকে যায়! ব্যর্থ জীবন বলে কিছু নেই। জীবন তখনই ব্যর্থ হয়, যখন তাকে জোর করে বোকার মত মানুষ থামিয়ে দেয়।

-- 'সিগ্রেট খাবে?', পিকুল দেবদাস ভঙ্গিতে বলল- 'আমার কাছে পাঁচপিস আছে। সকালেই বাবার ট্যাঁক থেকে ঝেঁপেছি'।

--'আমি সিগ্রেট খাই না'। বিশু ভুঁরু কুঁচকেছে--'কিন্তু পাঁচপিস কেন? আগে তো তিনপিসেই তোর চলে যেত'।

--'প্রেমে ল্যাঙ খেয়ে কোটা বাড়িয়েছি'। পিকুল দীর্ঘশ্বাস ফেলল--'তোমার কাছে বড়ি থাকলে দাও। খেয়ে দেখি। শা-লা, এ অপমান আর সহ্য হয় না!'।

--'বড়ি খাবি কোন্ দুঃখে?' সে অভিভাবক সুলভ ভঙ্গিতে বলে--'এই বয়েসে তোর বড়ি খাওয়ার কি হল? পিকুল, তুই একদম ঠিক কাজ করছিস না। এরপর তো রাবনের কাছে গিয়ে মদ খাবি, তারপর গাঁজা, তারপর ড্রাগস! লাইফ পুরো মায়ের ভোগে!

--'মায়ের ভোগে যেতে আর বাকি কি আছে? দেবীই আমার লাইফ। দেবী নেই তো কেউ নেই!'।

এ জ্বালা বোঝে বিশু। শুধু বিশুই নয়, তামাম ব্যর্থ প্রেমিক সমাজ বোঝে! বুকে যখন চিড়বিড় করে আগুন জ্বলে তখন শত শ্বেতকোষক্যেও নেতে না! কাঁচা বয়েসের ব্যথা তো আরও বেশি যন্ত্রণাদায়ক। মনে হয় দুনিয়ায় আর কোথাও কেউ নেই। আজন্ম যারা চোখের সামনে ঘুরে বেরিয়েছে, আহ্নাদ দিয়েছে, বকেছে, ভালোবেসেছে, তারা সব অপ্রয়োজনীয়। কেরিয়ার-পড়াশোনা-চাকরি সবক, টা শব্দই বেবাক মায়া! অল্পদিনের প্রেমে ব্যথা যে কখন আজীবনের স্বপ্নগুলোকেও ভেঙেচুরে দেয় তা টেরই পাওয়া যায় না! যতদিনে আসল ঘটনাটা টের পাওয়া যায়, ততদিনে লাইফ ঘেঁটে ঘ হয়ে গেছে!

--'জানিস পিকুল...'। বিশু আস্তে আস্তে বলে--'যখন ইঙ্গিতাদির সাথে আমার ব্রেক-আপ হল তখন আমিও তোর মতই ল্যাদ খাচ্ছিলাম। তার আগে আমার স্বপ্ন ছিল, কলেজের প্রোফেসর হবো। মা যতদিন বেঁচে ছিল, কানে ফুস্মত্তর দিয়ে গেছে--যে করেই হোক বাবা, তোকে দাঁড়াতেই হবে। ইঙ্গিতাদির প্রেমে পড়ার আগে সবই মনে ছিল। কিন্তু তারপর সব শালা ছড়িয়ে ছিয়াশি! কলেজের প্রোফেসর হওয়া হল না, ক্লার্ক হয়েই থেকে গেলাম। এবার বল দেখি, আসল ব্যাপারটা ঠিক কি হল?'।

পিকুল ব্যাপারটা ঠিক বুঝল না। অবাক হয়ে বলে--'কি হল?'।

--'ইঙ্গিতাদি ড্যাং ড্যাং করে ভালো ঘর, ভালো বর বাগিয়ে চলে গেল। আর আমি শা-লা বোকাচোদার মত সব কিছুর গাঁড় মেরে দিলাম। তখন তোর মত আমারও মনে হয়েছিল--ইঙ্গিতা জীবন, ইঙ্গিতা মরণ, ইঙ্গিতা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু নেই! অথচ কয়েকমাস পরেই বুঝলাম, ইঙ্গিতাকে ছাড়াও আমি দিব্যি বেঁচে আছি। কেরিয়ার, কলেজের পরীক্ষা, পার্সেন্টেজ, চাকরি ইঙ্গিতার রেয়াত করে না। ওর জন্য থেমে থাকে না। কিন্তু ঐ কয়েকমাসেই যা সর্বনাশ হওয়ার হয়ে গেছে'। বিশু নাক টেনে বলে--'সবাই যেখানে থাকার, সেখানে ঠিকঠাকই আছে। একটা লোক মাৰখান দিয়ে তার রিক্রিয়েশনের জন্য আমায় নাচিয়ে মারল। আর আমিও ফ্রাস্টু খেয়ে নিজের স্বপ্ন টপ্প গাধার গাঁড়ে দিয়ে এলাম। তার চেয়ে যদি--যা খানকি, তুই ছাড়া আর মাগী নেই নাকি দুনিয়ায়! ফাক্ ইউ বিচ!'। ভেবে একচোট খিস্তিখাস্তা দিয়ে মন শক্ত করে নিতে পারতাম, তবে তোর বিশুদ্ধা, ক্লার্ক বিশে না হয়ে প্রোফেসর বিশ্বনাথ গুপ্ত হত। কি বুঝালি?'।

কি বুঝল পিকুল তা সে নিজেই জানো। তার বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বিশ্বনাথ বাবার বাণী কতদূর কানে চুকল জানা নেই। শুধু চোখের সামনে দেবীর হিংস্র মুখটাই ভাসছে। আর মনে পড়ছে তার বলা নিষ্ঠুর কথাগুলো—

--'ইউ...ইউ রাঙ্কাল! তোর সাথে কথা বলতেও আমার ঘেন্না হয়,... ইনফ্যাট তোকে আমি সহ্য করতে পারছি না...আই জাস্ট হেট ইউ...হেট ইউ...। বলতে বলতেই দৌড়ে চলে গিয়েছিল দেবী। একবারও ফিরে তাকায় নি পিকুলের দিকে। দেখেনি পিকুল সর্বহারার মত দাঁড়িয়ে আছে ওখানেই! তার হাত থেকে খসে পড়েছে তার অতিপিয় লাকি ব্যাটটাও!

ঘটনাটা আর কিছুই নয়, নবগ্রাম প্লেটোনিক ক্লাবের সাথে শিবাজী সঙ্গের ক্রিকেট ম্যাচ ছিল গতকাল। পিকুল চিরকালই জাঁদরেল ব্যাটস্ম্যান। প্লেটোনিক ক্লাবের ধোনি! কাল যখন সে মাঠে নামছে তখন অলরেডি প্রথম দুই ওভারে শূন্য রানে তিন উইকেট পড়ে গেছে সুব্রতদা কানের কাছে এসে বলেছিলেন—'এখন নবগ্রামের মান ইঞ্জিত সব তোর হাওয়ালে পিকুল। দেখিয়ে দে—তুই—ই শেষ কথা! বুঝিয়ে দে—নবগ্রামের ছেলেরা হাতে চূড়ি পরে বসে থাকে না...বুঝিয়ে দে--.....।'

সে তো শুধু উত্তেজক ভাষণ নয়—রীতিমত ভোক্যাল টনিক। আর সেই ভোক্যাল টনিকেই বার খেয়ে শহীদ হয়ে গেল পিকুল!

উত্তেজনায় কান ভোঁ ভোঁ করছিল। দাঁত কিড়মিড় করতে করতে শক্ত করে ব্যাটের হাতলটা চেপে ধরেছিল সে। শিবাজী সঙ্গের বোলারগুলোকে সর্বেফুল দেখিয়েই ছাঢ়বে। প্রথম ওভারটা ঠুকঠুকিয়ে সামলে খেলল। শিবাজী সঙ্গের ফিল্ডারগুলোর হাত তো হাত নয়, কড়াই! বোলিং ও হচ্ছে তেমনি। অসাবধানে একটা ক্যাচ উঠলে, বা বাইরের বলে খোঁচা মারলেই পুরো চিত্তির। তাই প্রথম ছ’টা বল খুব সাবধানে খেলল পিকুল!

দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলটা ফুল টস পেয়েই স্টেপ আউট করে একদম 'বাপি বাড়ি যা!' প্লেটোনিক ক্লাবের ছেলেপুলেরা হৈ হৈ করে উঠল। কিন্তু দর্শকদের ভিড় থেকে আওয়াজ এল—'গেল...গেল...'।

কে গেল? কোথায় গেল? কে আর যেতে পারে! গেল পিকুলের কপাল! সুবীরকাকু বাজার থেকে ফেরার পথে একসাইডে দাঁড়িয়ে খেলা দেখিলেন। পড়বি তো পড়, পিকুলের মারা বল ফুল ভেলোসিটি নিয়ে তার টাকেই পড়েছে! সে একেবারে রক্তারঙ্গি কান্দ।

খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল পিকুলের। সুবীরকাকুর এ কি অন্যায়! তার সাথে ভদ্রলোকের কি দুশমনি আছে বলো দেখি! পিকুল জল ফেলুক, কি বল—তিনি ঠিক তার নীচেই টাকটি পেতে বসে থাকবেন। আর সব গালিগালাজ জুটবে তার কপালে!

ম্যাচ শেষ হওয়ার পরে মাঠে ওরা সেলিব্রেট করছিল। পিকুলের ব্যাটের জোরে ম্যাচ প্লেটোনিক ক্লাবের পকেটে চুকে গেছে। সবাই তাকে ঘাড়ে নিয়ে লাফালাফি করছে এমন সময়ই দেবীর আয়লা এন্ট্রি। সঙ্গে ঐ পাঁঠা পল্টু। কোনও ভূমিকা- টুমিকা নেই। সোজা পিকুলের কাছে এসে বলল—'বাবা তোর কি ক্ষতি করেছে? কেন বাবার পিছনে লেগেছিস্ তুই?'।

সে কোনমতে জবাব দিতে যাচ্ছিল। তার আগেই পল্টু ব্যা ব্যা করে বলল—‘পাঁচটা স্টিচ
পড়েছে কাকুর। তুই বল মারার আর জায়গা পাস্নি?’

পিকুল আবার কিছু বলতে চায়। তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে দেবী—‘একটা কথাও বলবি না
তুই! কোন কথা শুনতে চাই না! ইনফ্যাঞ্চ আমিই বা তোর সঙ্গে কথা বলছি
কেন?... ইউ... ইউ রাষ্ট্রাল! তোর সাথে কথা বলতেও আমার ঘেন্না হয়,... ইনফ্যাঞ্চ
তোকে আমি সহয় করতে পারছি না... আই জাস্ট হেট ইউ... হেট ইউ...’।
বল পড়ল সুবীরকাকুর মাথায়। আর কপাল ফাটল পিকুলের! কাল মাঠে খেলার শেষে লুচি-
আলুর দম-ডিমসেদ্ধ স্পর্শও করে নি সে। বাড়ি ফিরেও চূপ করে বসেছিল। মনমরা হয়ে
বইয়ের পাতায় মন দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু একটি অক্ষরও তার মাথায় ঢোকেনি।
শেষপর্যন্ত নিজের অতিপিয় ব্যাট্টাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল বাইরে। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। দেবী... আর কখনও ক্রিকেট খেলব না আমি... কোনওদিন
ধোনি হওয়ার স্বপ্ন দেখব না... তুই ফিরে আয়... তুই শুধু একবার আমায় ক্ষমা কর...
কথা বল্ আমার সঙ্গে!

কিন্তু কান্নাই সার! দেবী আসেওনি, কথাও বলেনি!

--‘পিকুল, এত ফুঁকিস না! শেষে গোটা লাইফটাই ফুঁকে দিবি রে ভাই’।

বিশুর কথায় হঁশ ফিরল পিকুলের। সে অবাক হয়ে দেখে ফ্ল্যাশব্যাকে গিয়ে কখন যেন
আপনমনে পাঁচ-পাঁচটা সিগ্রেটই বেমালুম ফুঁকে দিয়েছে।

বিশু তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। এরকম ব্যাপার তার কাছে নতুন নয়। এই বয়েসটা
একদিন তার নিজেরও ছিল। এই উনিশ-কুড়ি বছর বয়েসটা বড় বিপজ্জনক। সব কিছুই এই
সময় এক্সট্রা লার্জ! হাসি, কান্না, প্রেম, ধোকার জ্বালা, রোমিওগিরি, দেবদাসত্ত্ব! সব
কিছুই বেশি বেশি। ছেলেদের ক্ষেত্রে বলা হয় ‘বলদা পঁচিশ’, পঁচিশ বছরের পর ছেলেরা
ম্যাচিওর হয়। তার আগের সময়টা কঠিন। বিশেষ করে টিন এজটা। ম্যাচিওর ছেলে-মেয়েরা
প্রেম করে। অনেক বেছেরুছে, ভালো মন্দ বুঝো-মন্তিক দিয়ে মেপে নিয়ে তবেই মাঠে নামে।
আর টিন এজে প্রেম হয়! মাথা থেকে নয়, বুক থেকে ডাইরেক্ট প্রেম এসে গোঁতা মারে।
সে প্রেম ভালো-মন্দ বোঝে না। ঠিক-ভুল বোঝে না। বাউভারি বোঝে না! উন্মত্তের মত
তার রোখ! তাই তার বেদনাও অনেক বেশি।

এই বয়েসেই বিশুর কেরিয়ার ধেড়িয়েছিল। তাই সে পিকুলকে চেতিয়ে দেয়—‘ভাই, তোর
পড়াশোনায় কনসেন্ট্রেট করু। ছাই ওড়াচ্ছিস্ ভালো কথা। কিন্তু নিজেকে ছাই করে দিস্ না।
মেয়ে অগুনতি আছে। সেমিস্টার অগুনতি নেই। বুঝলি?’

মাথা নাড়ল পিকুল। অন্য সময় হলে ‘জ্ঞান দিও না মামা, বলে থামিয়ে দিত। কিন্তু বিশু
যা বলছে তা ভুল নয়।

--‘ছাড়ো ওসব’। সে বলল—‘তোমার কারেন্ট গার্লফ্রেন্ড কে?’

বিশু হেসে বলে—‘সিন্ডারেলা’।

--‘তোমারও লাক্ বটে। কাকের মতন’। পিকুল বলে—‘কোকিলার ডিম তিনমাস ধরে তা
দিয়ে দিয়ে গরম করো। তারপর আরেক হতচাড়া কোকিল এসে সেই গরম ডিমের পোচ
বানিয়ে খায়।’

--'জানি তো'।

--'জানো যখন তখন এ বিজনেস খতম করো না কেন?'

--'খতম তো করে দিয়েছি'।

খবরটা শুনে তড়ক করে লাফিয়ে উঠল পিকুল। এতক্ষণের বিষাদ হতাশা ঝোড়ে ফেলে বলল--'সেকি গুরু! এত বড় নিউজ ফুলটু চেপে গেছ! তবে তুমি ফাইনালি ওপেন রিলেশনশিপ ছেড়ে কমিটেড স্টেটাসে গেলে! তাহলে সিভারেলা কে? পার্মানেন্ট?'

--'সিভারেলা কে সেটা যদি জানতাম তাহলে তো হয়েই গিয়েছিল'।

পিকুলের মুখ একতাল হালুয়ার মত হয়ে গেল--'লেং হালুয়া, লাইন মারছ, অথচ মেয়েটা কে জানোনা!'।

--'জানি না'। বিশু বলল--'তবে যেদিন জানতে পারবো সেদিন তোদের বিশুদ্ধা সংসারী হবে'।

--'খুড়ো-ও-ও-ও! তলে তলে এ-ত-দু-উ-উ-উ-র'। পিকুল এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল, যেন বিশু নয়--তারই ফাইনাল সেটিং হয়ে গেছে--কেসটা কি খুলে বলো তো। দেখি তোমায় হেল্প করা যায় কি না!'।

লজ্জা লজ্জা মুখ করে সেরাতের কথা খুলে বলল বিশু। সিভারেলার সাথে তার দেখা, প্রতিটা মুহূর্তের কথা বর্ণনা করে বলল। কি করে ভুলবে তার সেই হাঃ হাঃ হাসি। ছেলেদের মত বুক চিতিয়ে হাঁটা। তার মিষ্টি গালিগালাজ। এমনকি বাজের মত থাপ্পড়ও!

পিকুল লক্ষণগুলো শুনতে শুনতে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে--'ইয়ে...বিশুদ্ধা...তুমি ঠিক জানো ওটা মেয়ে! হিজড়ে নয়? আজকাল কিন্তু হিজড়েদেরও ছেলে বা মেয়ে বলে আইডেন্টিফাই করা শক্ত...'।

--'হিজড়ে কেন হবে?' সে প্রতিবাদ করে--'আমি হিজড়ে দেখিনি? হিজড়ে নয়। একটা হাই ভোল্টেজ মেয়ে। শুধু হাবভাবটা ছেলেদের মত'।

পিকুল 'হাই ভোল্টেজ' শুনে 'লো ভোল্টেজ' গলায় বলে--'গে নয়তো! অথবা সেক্স চেঞ্জ করেছে এমন কোনও পুরুষ!'।

এবার বিশু একটু থমকাল। বিড়বিড় করে বলল--'গে নয়। হলে কি আর আমায় সহজে ছাড়ত! তবে সেকেন্ড সম্ভাবনার কথাটা উড়িয়ে দিতে পারছি নারে পিকুল। কিন্তু নবগ্রামে এমন পুরুষ আছে নাকি যে সেক্স চেঞ্জ করেছে?'।

--'আলবাত আছে'। নিজের হাঁটুর উপর ঘূঁষি মেরে উঃ উঃ করে উঠল পিকুল--'তাছাড়া নবগ্রামে এমন কোনও মেয়ে এখনও পর্যন্ত দেখেছ যে ছ' ফুটের কাছাকাছি লম্বা! দীপিকা পাড়ুকোন ফিগার! অমন ডাকসাইটে সুন্দরী মেয়ে থাকলে এতদিনে চোখে পড়ত না?'।

--'তা পড়ত'। বিশু কনফিউজড হয়ে মাথা নাড়ায়। পিকুলের কথা একদম ঠিক।

--'জুতোটা কই। দাও তো দেখি'।

ভৱত যেমন রামের খড়ম সামলে রেখেছিলেন, ঠিক তেমন করেই সয়ত্নে জুতোর পাটিটাকে রেখে দিয়েছিল বিশু। পিকুল সেটা দেখে বিচক্ষণের মত মাথা নাড়ল--ও বিশুদ্ধা, এ মেয়ে বলে মনে হয় না। মেয়েদের এত বড় পা হয় না কি! এতো প্রায় দশ নম্বরের জুতো বলে মনে হচ্ছে। যদি এ মাল সতিয়ই মেয়ে হয় তবে এর পারফেক্ট বয়ফ্রেন্ড কিংকং'।

--'যে ছ'ফুট লম্বা, তার জুতো দশ নম্বরের তো হতেই পারে'।

--'তা পারে'। পিকুল কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে ভাবে--'নাঃ, তদন্ত করে দেখতেই হচ্ছে। সিভারেলার ব্যাপার হাইলি সাস্পিশাস বলে মনে হচ্ছে আমার। ওটা নির্ধারণ কোনও পুরুষ। সেক্ষে চেঞ্জ করেছে নবগ্রামেই এক পিস আছে। শান্তনুদাকে চেনো তো'।

--'হ্যাঁ। চিনি'।

--'শান্তনুদার ভাইয়ের ডিভোর্স হয়ে গেছে সেটা শুনেছ?'।

--'না তো!'। বিশু আকাশ থেকে পড়ে। আজকাল নবগ্রামের খবর সে কমই রাখে।

শান্তনুদার ভাই অতনুকে সে বারকয়েক দেখেছে। বেশ ছিপছিপে লম্বা সুন্দর দেখতে। একটু মেয়েলি মেয়েলি হাবভাব। কিন্তু রঙ যেন একেবারে ফেটে পড়ছে। চোখছুটোও সুন্দর টানটান। কথায় কথায় ব্যাপক খিণ্ডি দিত। ব্যাটা চেইনস্মোকার ছিল। ফস্ ফস্ করে সিগ্রেট ধরাত! একটা বিরাট মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে এখন চাকরি করে। মাসের মধ্যে পনেরো দিনই বিদেশে থাকে।

সেই অতনুর ডিভোর্স হয়ে গেছে! ওর বিয়েই তো হল মাত্র দুবছর আগে!

--'আরে ওখানেই তো লোচা। ছ'মাস আগে অতনুদা আমেরিকা গিয়েছিল এক মাসের জন্য। একমাস পরে যখন ওর বৌ ওকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে গেছে, তখনই ফুলটু কেলো। দেখে ওর বরের জায়গায় একজন ব্যাপক সুন্দরী মহিলা একটা হ্যান্ডি বিদেশি ছেলের সাথে নামছে। চোখে গোগো সানগ্লাস! আসল ঘটনাটা জানতেই ওর বৌ গোঁ গোঁ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল'। পিকুলের চোখ গোলগোল হয়ে গেছে--'ওর বর তখন আর ওর বর নেই, অন্য একজনের গার্লফ্রেন্ড হয়ে গেছে। আই মিন, বেমালুম সেক্ষে চেঞ্জ করে ফেলেছে। পুরো ছিল ঝুমাল, হয়ে গেল বিড়াল, কেস!'।

বলে কি! এ তো পুরো চাপের কেস।

--'তাই বলছিলাম...' সে বলে--'তোমার সিভারেলা ঐ অতনুদা...ধুস...অতনুদি...দূর ছাই-ঐ হাইব্রিড মালটা নয়তো?'।

বিশুর মুখটা ঠিক মুরলীথরনের বোলিং অ্যাকশনের মত হয়ে গেছে। চোখছুটো ট্যারা। মুখটা হাঁ। যেন কেউ এখনই ওর মুখে পাঁচটাকার রসোগোল্লা পুরে দেবে!

--'হতেও পারে...'। বিশু আমতা আমতা করে বলে--'মানে, হওয়াটা অসম্ভব নয়'। বেচারি পুরো ডুম হয়ে গেল। এতদিন জুতোটাকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়েছে সে। সিভারেলার স্বপ্ন দেখেছে। দেখেছে পানপাতায় মুখ ঢেকে লজ্জায় মুখ নীচু করে আছে সিভারেলা, আর বিশু তার সিঁথিতে সিঁতুর দিয়ে দিচ্ছে। শেষপর্যন্ত সিভারেলার এই হাল!

--'চুপচাপ না বসে থেকে চলো পাতা লাগাই'। পিকুলের আবার এই এক দোষ। সে বড় কৌতুহলী। সুযোগ পেলেই গোয়েন্দাগিরি করতে বসে।

--'কি করে পাতা লাগাবি?'।

--'সিম্পল'। পিকুল বলল--'অতনুদা...অতনুদি...হোয়াট এভার...ঐ কম্বাইন্ড মালটাকে এই একপাটি জুতো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবো যে এটা ওর কি না'।

বিশুর সংশয় তরু কাটে না--'যদি ক্ষেপে গিয়ে ঐ জুতো দিয়েই আমাদের জুতোপেটা করে!

একটা ছেলেকে মেয়েদের জুতো দেখিয়ে...ইয়ে, ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না?'।

--'ও আর ছেলে আছে কই? সব মালপত্র ট্রাঙফার করে মেয়ে হয়ে গেছে'। পিকুল ভুক্ত
কুঁচকে বলল--'আর তুমি এই মুখ দেখলে চিনতে পারবে তো?'

--'খুব পারবো। একেবারে লাল টুকটুকে ঠাঁট। আপেলের মত গাল। টানাটানা চোখ।'

--'ধূস, ও তো মেক-আপ! অনন মেক-আপ মারলে আমাদের কাজের বৌ মালতীকেও
মাধুরী দীক্ষিত লাগবে। ওটা কাজের কথা নয়।' সে বলল--'মেক-আপ ছাড়া দেখলে চিনতে
পারবে?'

বিশু কনফিউজড হয়ে মাথা নাড়ায়। সে এখন কিছুই জোরের সঙ্গে বলতে পারছে না।

--'ঠিক আছে। চলো, আজ মালটাকে বাড়িতেই পাবো। রবিবার ওর অফিস থাকে না।'
পিকুল উঠে দাঁড়াল--'চলো একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখি।'

--'চল।' বিশু অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়ায়। শেষমেষ সিন্ডারেলার খোঁজে তাকে একজন
পুরুষের, না ঠিক পুরুষের নয়...একজন মহিলার...দূর ছাই, শান্তনুদার ভাই...খুড়ি
বোন...নিকুঠি করেছে--কারুর একটা বাড়িতে যেতে হচ্ছে! তাও একটা জুতো হাতে নিয়ে!

--'তবে মামা... তোমাকেও আমার একটা ফেভার করতে হবে।' পিকুল মিচকে হাসি
হাসে--'তোমার সিন্ডারেলার খোঁজ আমি লাগাবো। কিন্তু তোমাকেও আমার সঙ্গে আরেকটা
ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে।'

--'কি ব্যাপারে?'

--'টি. বি. সি।'

বিশু ঘাবড়ে গেল--'টিউবারকুলোসিস্স! ওরে বাবা, ব্যাপক ছেঁয়াচে রোগ! আমি নেই।'

--'ধূস মামা!' সে একটা হাইক্লাস হাসি হাসল--'তুমি এক নম্বৱের ইয়ো টিউবারকুলোসিস
হবে কেন? টি.বি.সি এর ফুল ফর্ম টু বি কন্টিনিউড।'

শান্তনুর ভাই...ইয়ে...বোন...ধূত্তোর,... কিছু একটা, তথা অতনু তখন বাড়িতেই
ছিল। তাকে দেখেই প্রায় পিলে চমকে গেল বিশুর! এটা কে! অতনু! ছ, ফুট লম্বা লোকটার
মাথায় কতগুলো খিমচি ক্লিপ বসানো, কানে মনুমেন্ট সাইজের দুল লুড়লুড় করছে, চোখে
মোটা করে লাইনার, ঠাঁটে গোলাপি রঙের লিপস্টিক, পরনে সাদা রঙের নাইটি! এমন
করে হেঁটে এল যেন দোলনায় দোল খাচ্ছে।

--'মাকড়াটা এমন স্লো মোশনে হাঁটছে কেন রে?' ফিসফিসিয়ে পিকুলকে বলল বিশু।

--'ক্যাটওয়াক করছে।' পিকুল চাপা গলায় বলে--'মেয়েরা কোমর দুলিয়ে হাঁটে--দেখোনি।'

--'কোমর দুলিয়ে হাঁটতে দেখেছি।' সে বলে--'কিন্তু এ মালটার তো সবই দুলছে।'

--'আ-হা!' পিকুল আড়চোখে তাকিয়েছে--'নতুন নতুন জিনিসপত্র বাগিয়েছে না? তাই
একটু শো-অফ করছে।'

--'শো-অফের চোটে যে আমিই অফ হয়ে যাচ্ছি।'

--'আরও কিছুক্ষণ অন থাকো। তারপর দেখা যাবে।' সে ইশারায় বিশুকে চুপ করতে বলে।
অতনু এমন ভাবে সোফায় বসে পড়ল যেন রবিনা ট্যান্ডন শাড়ি উড়িয়ে নাচছে! উঃ! কি
চাপ!

-- 'ও মা-ই... মা-ই!' সে গালে হাত দিয়ে বলে-- 'বিশু না? কতদিন পরে! আজকাল তো
তোকে দেখাই যায় না! শুনেছি মাঝেমধ্যে বাথরুমে বা বেডরুমে উঁকি দিয়ে যাস!', অতনু
লজ্জায় লাল হয়ে যায়-- 'ন-চি পিপিং টম! আমার বাড়িতে আসিস্ না কেন রে দুষ্টু?'
উপ্প্প্রস! বিশু যে কোথায় যায়!

-- 'ইয়ে, অতনুদা... মানে দিদি... মানে...'

সমোধনেই পিকুলের পিন আটকে গেছে। অতনু দেবদাসের ঐশ্বর্য রাইয়ের ভীমরূপ তাঢ়ানোর
মত করে হাত নাড়ায়-- 'ওসব ডাকিস না! কল মি মিস্ তনু'। ফস্ করে একটা সিপ্রেট
ধরিয়ে কটাক্ষে তাকিয়ে বলল সে-- 'ডোন্ট মিস্ দ্য মিস্স্স...'

হিস্স্স! এ নামে মল্লিকা শেরাওয়াতের একটা ফিল্ম ছিল না! যেখানে মল্লিকা দিদি সাপের
ঠোঁটে দেৱার চুমু খেয়েছিলেন! অতনু ওরফে মিস্স তনুর সিপ্রেটে টান দেওয়ার ভঙ্গি দেখে
মনে হয়, সিপ্রেট নয়, চুমু খাচ্ছে।

-- 'ওকে তনুদিদি'। পিকুল জুতোটা বের করে দেখায়-- 'এটা একটু দেখো তো'।

-- 'ওঃ, কা-ম-অ-ন! দুজন হ্যান্ডসাম সেক্সি অ্যান্ড নটি বয় আমার বাড়িতে এসেছে'।

বিরক্ত হয়ে অতনু এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল-- সাথে ফুল চকোলেট বা নিদেনপক্ষে কঙ্গোম
আনলে তবু বুবুতে পারি। কিন্তু এক পাটি চটি নিয়ে আমি কি করবো? চিবোবো?

-- 'কেলো করেছে। চিবোবে কেন?', পিকুল বলল-- 'আসলে বিশুদ্ধা এই একপাটির
মালকিনকে খুঁজছে'।

-- 'ও মা-ই... মা-ই'। এমনভাবে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢাকল অতনু যেন এক্ষুনি মিস
ইউনিভার্স খেতাব পেয়েছে-- 'সো রো-ম্যা-ন্টি-ক! খুঁজছে! ওঃ সো অ্যাডভেঞ্চারাস, খুঁজি
খুঁজি নারি, যে পায় তারি...!'

বিড়বিড় করে বলল পিকুল-- 'বড় বাড়াবাড়ি'।

অতনু তখা তনুদিদি বেসুরো গলায় গেয়ে ওঠে-- 'খুঁ-জ-বে আমায় সেদিন, যেদিন আমি
থাকবো না'।

পিকুল ফের বিড়বিড়ায়-- 'ন্যাকাশশীপনা'।

বেশ কিছুক্ষণ আবৃত্তি, গান ও অনেক নাটুকেপনার পর বলল সে-- 'বাই দ্য ওয়ে... এই
জুতোটা কার, সে বিষয়ে কিছু বলতে পারছি না। এইটুকু বলতে পারি, এটা আমার নয়!
তবে যারই হোক, তার স্টাইল সেজ একদম নেই! এরকম লাল টকটকে জুতো এখন
ব্যাকডেটেড'।

বিশু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। জুতোটা যে অতনুর নয় এই তথ্যটা পেয়েই সে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।
সিন্ডারেলা যে অতনু নয়, এর থেকে বড় খুশির খবর আর কিছু হতেই পারে না।

যা জানার ছিল, জানা হয়ে গেছে। আরও মিনিট দুয়েক খেজুর-টেজুর করে অবশেষে দুজনে
বেরিয়ে এল।

-- 'বাপ্রে! বড় বাঁচা বেঁচেছি!' পিকুল শ্বাস টানতে টানতে বলে-- 'ভেবেছিলাম পড়াশোনা
কমপ্লিট করে মালটার কাছে চাকরির তদ্বির করতে আসবো। ভুলেও আর এ রাস্তা মাড়াচ্ছি
না!'

বিশু বলল—‘যদি সিন্ডারেলা মিস্সস্স্ তনু হত, মাইরি বলছি পিকুল, আমি নির্বীজকরণ,
মানে নস্বন্দী করে নিতাম’।

বলতে বলতেই রাস্তায় এলোমেলো পায়ে হাঁটছিল সে। আর হাঁটবেই না বা কেন? তার মনের
উপর দিয়ে প্রায় স্টিম রোলার চলে গিয়েছে। সামলে নিতে একটু সময় নিছিল বিশু। হঠাতে
কোথা থেকে এক বাইক আরোহী হড়মুড় করে আচমকা এসে পড়ল তার উপর। পিকুল
ভয়ে চিৎকার করে উঠল। রাস্তার লোকেরা ‘গেল গেল’ রব তুলল। বিশুও ধেয়ে আসা
বাইকটাকে দেখে লাফিয়ে উঠেছে—

--‘গে-ছি... গে-ছি...’।

কিন্তু কপালগুণে কোথাও গেল না সে। অদ্ভুত কৌশলে বাইক রাইডার তাকে কাটিয়ে গেল।
রীতিমত হর্স রাইডিং মুভমেন্ট! আরোহীর মুখ দেখা গেল না। হেলমেটে গোটা মুখ ঢাকা।
কিন্তু সে যে বাইক র্যাডলিতে এক্সপার্ট লোক, তা তার একটা মুভমেন্টেই বোৰা গেল।

--‘আবে, চোখ ছুটো খুলে হাঁটতে কি ট্যাঙ্ক লাগে বোকাচোদা!’

কমেন্টটা পাস করেই হশশ করে বাইকশুন্দ ভোঁ ভোঁ হয়ে গেল বাইকরাইডার।

--‘শালা... হারামী... শুয়োরের বা...’। বিশু মুখখিণ্ডি করতে শুরুই করেছিল। পিকুল
তাড়াতাড়ি তাকে থামায়—‘কি সর্বনাশ! বিশুদ্ধা, চুপ করো... চুপ করো...’।

--‘কেন চুপ করব রে?’ সে তেড়িয়া—‘নিজে শালা বাইকে চেপে নিজেকে পাইলট ভাবছে
আর...’।

--‘চুপ করো বিশুদ্ধা!’, পিকুল ফিসফিসায়—‘ধ্বাণে বাঁচতে চাইলে চেপে যাও। জানো না ওটা
কে?’

--‘কে? কার বাপ?’

--‘বাপ নয়, ভাই’। সে বলল—‘এ তল্লাটের ভাই। নামকরা গুন্ডা! লাটু মন্তান। বেশি
কিচাইন করলে স্ট্রেট লাশ ফেলে দেবে মামা। রোজই তো বাইক হাঁকিয়ে যায়। দেখোনি
আগে।’

বিশু লাটু মন্তানের পিছন দিকটাই দেখতে পাচ্ছিল। গুন্ডা শুনেই তার মুখ বিত্তুষায় কালো
হয়ে গেছে। দুনিয়ায় এই একটি প্রজাতিকে সে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করো।

--‘লাশ ফেলবে না বাল ফেলবে’। সে বলল—‘যতসব ভীতুর ডিম। দেখলি না, খিণ্ডি দিয়ে
কেমন পালিয়ে গেল! ওর চেয়ে আমার সিন্ডারেলার সাহসও অনেক বেশি। বুঝলি?’

১২.

তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা!

বিভিন্নিসি প্রাত্যহিক অভ্যাসমতই দাঁত মাজছিলেন। দাঁত মাজতে মাজতে গজলা করা তার
প্রিয় হবি। একটু আগেই দেবীর মায়ের সাথে কথা হচ্ছিল। দেবীর মা তার স্বামীর বিষয়ে
দুঃখপ্রকাশ করছিলেন। সুবীরবাবু চিরকালই দুর্ঘটনাপ্রবণ! তার কোষ্ঠীতে নাকি লেখা আছে,
লাইফের পদে পদে রাখ আর শনি বসে চোখ কটমটাচ্ছে! কথায় আছে, ন্যাড়া বেলতলায়
ক’বার যায়। একই কথা টাকলুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। আর বিশেষ করে সুবীরবাবুর
মতো পুরোপুরি অবাক পৃথিবী, পান্নিকের ক্ষেত্রে তো আরও বেশি লাগসই। আর এই

‘ଲାଗସଇ’ କଥାଟାଇ ବାରବାର ‘ଟାକସଇ’ ହଚ୍ଛେ ସୁବୀରବାବୁକେ ବେଳତଳାୟ ଯେତେ ହ୍ୟ ନା, ତିନି ଯେଥାନ ଦିଯେ ଯାନ, ସେଖାନଟାଇ ବେଳତଳା !

ଏହି ତୋ, ସେଦିନ ଭଦ୍ରଲୋକ ନିଜେର ଘରେ ବସେ ପେପାର ପଡ଼ୁଛିଲେନ। କୋଥାଓ କୋନୋ ବିପଦେର ଆଶଙ୍କା ଛିଲ ନା। ହଠାତ୍ କୋଥା ଥେକେ ଏକ ହତ୍ଭାଗୀ ବୋଲତା ଏସେ ଟାକେ ହଲ ଫୁଟିଯେ ଭେଗେ ଗେଲ! ସେ ଏକ କାନ୍ତ! ଆର ଏହି ସେ ଦେବୀର ପୋଷା ବିଡ଼ାଳ ମଜଞ୍ଜାଲି-ଦିବି ଶାନ୍ତିଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ମେନି। ତାରଓ କି ମତିଭ୍ରମ ହଲ କେ ଜାନେ ସୁବୀରବାବୁର ଟାକଟାକେ ଏକଦିନ ରାତେ ସେ ବୋଧହୟ ସୁମେର ସୌରେ ଖେଲାର ଫୁଟବଲ ବଲେ ମନେ କରେଛିଲା। ଫଳସ୍ଵରୂପ ଫ୍ୟାଚଫ୍ୟାଚ କରେ ଦିଯେ ଦିଲ କରେକଟା ଆଁଚଢ଼! ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନଯ! ଆରଓ ଆଛେ! ଏକବାର ସ୍ୱୟଂ ତିନି ଲୋଡ଼ଶେଡ଼ିଂ ଏର ସମୟେ ଦେବୀର ସାଥେ କଥା ବଲତେ ବଲତେ ଅନ୍ୟମନକ୍ଷ ହୟେ ମୋମବାତିଟା ସ୍ଵାମୀର ଟାକେର ଉପରଇ ପେସ୍ଟ କରତେ ଯାଇଛିଲେନ! ସବେ ଗଲା ମୋମେର ଏକଫୋଟା ଫେଲେଛେନ-ଅମନି ଏକେବାରେ ହାଇମାଇ କାନ୍ତ! କତ ଆର ବଲବେନ? ବଲତେ ଶୁରୁ କରଲେ ଆନ୍ତ ଏକଟା ମହାଭାରତ ହୟେ ଯାବେ! ତବୁଓ ବଲା ଶେଷ ହ୍ୟେ ନା। ଏର ମଧ୍ୟେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟନା ପିକୁଲେର ଛକାର ଧାକା! ବଲଟା ଅନ୍ୟ କୋଥାଓ ଅନାୟାସେଇ ପଡ଼ତେ ପାରତ! କିନ୍ତୁ ନା, ପଡ଼ତେ ହଲ ସେଇ ସୁବୀରବାବୁରଇ ଟାକେ! ପ୍ରାଣିଦେର କଥା ବଲାଇ ବାହଲ୍ୟ, ଏକେବାରେ ନିଷ୍ପାଣ ନିରୀହ ଏକଟା ଡିଉସ ବଲ, ସେଓ କି ନା ଏସେ ପଡ଼ିଲ ଯଥାନ୍ତାନେ! ଦୋଷ ପିକୁଲେର ନଯ, ଦୋଷ ସୁବୀରବାବୁର ମାଥାଜୋଡ଼ା କପାଲେର!

ବିନ୍ତିପିସି ମୁଖ ଗଣ୍ଠୀର କରେ ସବ କଥା ଶୁନାଇଲେନ। ତାରପର ମୁଖ ଖୁଲିଲେନ-‘ବାଢ଼ିତେ ଏକଟା ଶାନ୍ତି-ସ୍ଵନ୍ତ୍ୟଯନ କରାଓ ଗୋ ବୌ। ଗ୍ରହେର ଶାନ୍ତି ହଲେ ମାନୁଷେରେ ଶାନ୍ତି!’,

--‘କତ କରିଯେଛି ଦିଦି’। ଦେବୀର ମା କର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ କରେ ବଲିଲେନ-‘କିଛୁତେଇ କିଛୁ ହ୍ୟ ନା! ଏହି ତୋ ସେଦିନ ଯଜ୍ଞ କରାଇଲାମ। ପୁରୋହିତ ଠାକୁର ମେଝେତେ ଏକଟା ନାରକେଳ ଆଛାଡ଼ ମେରେ ଭାଙ୍ଗିଲେନ। ନାରକେଳ ତୋ ଭାଙ୍ଗିଲାଇ ନା, ଉଲ୍ଟେ ଛିଟକେ ଗିଯେ ଲାଗଲ ଦେବୀର ବାବାର ଟାକେ! ସେ ଆରେକ କେଲେକ୍ଷାରି’।

--‘ହ୍ୟ’। ମୁଖ ଆରଓ ଗଣ୍ଠୀର ହଲ-‘ତାହଲେ ଏକବାର ଘାମେଶ୍ଵର ବାବାର କାହେ ଗିଯେ ଦେଖୋ ବୌ। କିଛୁ କରତେ ପାରିଲେ ତିନିଇ ପାରିବେନ!’

ଘାମେଶ୍ଵରବାବା! କି ବଦଖତ ନାମ! ଭଦ୍ରଲୋକ କି ସବସମୟ ଘାମେନ ନାକି!

ସେକଥା ବଲତେଇ ଜିଭ କେଟେ କାନ ଚେପେ ଧରେଛେନ ବିନ୍ତିପିସି-‘ଅମନ ବଲେ ନା ଗୋ ଦେବୀର ମା, ବାବା ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବାନ। ବଜରଂବଲୀର କାଛ ଥେକେ ସ୍ଵପ୍ନାଦେଶ ପେଯେଛେନ। ବେଶ କିଛୁ ବଚର ହିମାଲୟେ ତପିସ୍ୟ କରେ ଏଖନ ଏଖାନେ ଏସେ ଆଖଡା କରେଛେନ। ସବାଇ ବଲେ ତିନି ନାକି ସିଦ୍ଧପୁରୁଷ!

ମନ୍ତ୍ରବଲେ କରତେ ପାରେନ ନା, ଏମନ କୋନଓ କାଜ ନେଇ! ଏମନକି ବଜରଂବଲୀର ଜାତକେବେ ନିଜେର ପୋଷ୍ୟ କରେ ରେଖେଛେନ। ତାର ପାଯେର କାହେ ଏକଟା ଗୋଦା ହନୁମାନ ବସେ ଥାକେ, ଦୁଧ-କଳା ନାରକେଳ ଖାଯ! ହରିନାମ କରେ!

--‘ହନୁମାନେ ହରିନାମ କରେ!’

--‘ନୟତୋ ଆର ବଲଛି କି!’, ତିନି ବଲତେ ଲାଗିଲେନ-‘ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନଯ, ସେ ନାକି ଶୁଦ୍ଧ ସମୋକ୍ଷିତ ବଲତେ ପାରେ!

ଦେବୀର ମା ଢୋକ ଗିଲିଲେନ। ହନୁମାନ ସଂକ୍ଷତ ବଲତେ ପାରେ ତା ଜୀବନେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଶୁନେଛେ!

ସତିଇ ଘାମେଶ୍ଵରବାବା ଚମଙ୍କାରୀ ପୁରୁଷ! ହନୁମାନକେ ଦିଯେ ସଂକ୍ଷତ ବଲାନୋ ଚାଟିଖାନି କଥା ନଯ! କିନ୍ତୁ ଦେବୀର ମାଯେର ସନ୍ଦେହ ତବୁ ଯାଯ ନା।

-- 'কিন্তু হনুমানটাকে সংস্কৃত বলতে কেউ শুনেছে কি?'

-- 'নাও ঠ্যালা, শুনবে কি করে?' বিভিপিসি বললেন--'যখন দর্শনার্থীরা যায় তখন তো হনুমানটা মৌনী নিয়ে বসে থাকে। সারাদিন মৌনব্রত নিয়ে থাকে। তারপর রাত্তিরে যখন বজরংবলীর পুজো হয়, তখন সে দুধ-কলা দিয়ে সাবুমাখা খেয়ে হনুমান চলিসা পাঠ করে।' তিনি হনুমানের কীর্তি থামিয়ে এবার ঘামেশ্বরবাবার মহিমা বর্ণনা করতে শুরু করলেন--' বাবার অপার ক্ষমতা! গা বেয়ে সবসময় ঘাম বেয়ে পড়ে বুরালে বৌ! সে ঘাম কি তোমার আমার মত ঘাম! সে একেবারে জলপ্রপাত!'

অ্যাঁ! জলপ্রপাতের মত ঘাম! দেবীর মা কি বলবেন ভেবে পেলেন না! কিছুক্ষণ থম্ মেরে থেকে বলবেন--'এতো ঘাম! কত গ্যালন জল খান দিনে? ডিহাইড্রেশন হয়ে যায় না?'

-- 'ধূর পাগলি'। লালচে কালো দাঁত বের করে হাসলেন বিভিপিসি--'ও কি আর ঘাম! বাবা গঙ্গাকে নিজের দেহে ধরেছেন! সেই জলই পড়ে! বাবা সাক্ষাত শিবের অবতার।' বলতে বলতেই গুড়াকুশুদ্ধই হাতটা কপালে ঠেকালেন--'কত ভক্ত সেই ঘাম বোতলে করে ভরে নিয়ে যায়। বাবার তো চন্নামৃত নেই, ঘামামৃত! ঘামামৃত খেয়ে কত লোকের যে ঝোগমুক্তি হয়েছে তার হিসাব নেই'।

-- 'ঘামামৃত!', ভাবতেই দেবীর মায়ের বমি পায়। ঘাম মানুষ খেতে পারে? তিনি তো ঘামের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না।

বিভিপিসি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঘামেশ্বরবাবার মহিমা কীর্তন শেষ করার আগেই ফ্যাচাং! বিভিপিসির বাড়ির একতলা থেকে চিলচিংকার ভেসে এল! কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিভিপিসির একতলার ভাড়াটে, শিরুর বৌ শ্যামলী নাইটি পরে পড়িমড়ি করে ছুটে এল। তার মাথার চুল তখনও ভেজা। কোনমতে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল--'ও পিসি...ও পিসি...'।

তার ছুটে আসা দেখে ঘাবড়ে গেছেন বিভিপিসি। দেবীর মা চমকে উঠেছেন।

-- 'কি হয়েছে?'

-- 'শোবার ঘরের জানলায়... ছুটো চোখ... ভয়ঙ্কর চোখ...'। শ্যামলী চোখ বড় বড় করে বলে--'চোখের মণি ছুটো একদম সাদা পিসি! কি ভয়ঙ্কর! ও কোনও মানুষের চোখ নয়... মানুষের চোখ নয়...'।

-- 'কই, চল্ল তো দেখি। এসো তো বৌ'।

অসীম সাহস বিভিপিসির! বয়েসের ভারে প্রায় হাফকুঁজো, তবু কি স্ট্যামিনা মাইরি! বুড়ি একেবারে ফেলুদার মত গটগটিয়ে শ্যামলীদের বেডরুমে গিয়ে ঢুকল।

-- 'কোন দিকের জানলায় দেখেছিস?'

-- 'পিছনদিকের জানলায়!'

বিভিপিসি এগিয়ে গিয়ে গোটা জানলাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। আশ্চর্য ব্যাপার! জানলার উপর একটা হাতের ছাপ এখনও জ্বলজ্বল করছে। হাতের ছাপটা কোনও ভূতের নয়, মানুষেরই বটে!

--'আশ্চর্য!' তার কপালে বলিরেখাগুলো আঁকিবুকি কেটে মর্ডাৰ্ণ আর্ট তৈরি করেছে--
ভূতের হাতে পাঁচটা আঙুল থাকে, তার ছাপও পড়ে, এমন কথা তো কখনও শুনিনি! তুই
ঠিক কি দেখেছিলি বল্ তো?'

শ্যামলী বলে--'আরে, রোজকারের মত আমি তো ছান-টান সেৱে আয়নাৰ সামনে দাঁড়িয়ে
বগলে পাউডার লাগাচ্ছি হঠাৎ শুনি একটা ঝন্ধন্ শব্দ! যেমন চেনেৱ আবাজ হয়, ঠিক
তেমনি। তাৱপৰই একটা কুকুৰ খুব চেঁচাতে শুৱ কৱল। আমি ভাৰি, কুকুৰটা এত ডাকে
কেন! তাঙ্গৰ ভাবলাম কুকুৱেৱ কাজ ডাকা, তা ডাকুক গে। কতক্ষণ আৱ ডাকবো। গলা
ব্যথা হলেই চুপ যাবে....'

বেশ কিছুক্ষণ কুকুৱেৱ ডাকেৱ বৰ্ণনা চলল। দেৰীৱ মা বিৱক্ত হচ্ছিলেন। কুকুৱেৱ বৰ্ণনা আৱ
শেষই হয় না! অনেকক্ষণ শুনে টুনে শেষে বিৱক্ত হয়ে বললেন--'তুই কুকুৰ দেখেছিস্ না
চোখ দেখেছিস আগে ঠিক কৰ্।'

--'চোখই দেখেছি বৌদি।' শ্যামলী ড্যাম্ কনফিডেন্ট--'তাঙ্গৰ শোনো না। কুকুৰটা তো
চেঁচিয়েই চলেছে। আমি ভাৰি থামে না কেন! ও মা! তাৱমধ্যেই দেখি জানলার তলায়
খচমচ খচমচ শব্দ! যেই না উঁকি মেৰে দেখেছি অমনি....।' সে হঠাৎ একটা মোক্ষম হিকা
তোলে--'বাপ ৱে... দেখি একজোড়া চোখ পুৱো আমাৱ নাকেৱ সামনে! সে কি চোখ!

একদম সাদা! মণিতে লাল, নীল, কালো, বাদামী কোনও রঙই নেই!....'

বলতে বলতেই গায়ে কাঁটা দিল তার! দেৰীৱ মা দেখলেন সে এখনও ঘামছে! চোখেমুখে
আতক্ষেৱ ছাপ স্পষ্ট! নিজেৱ অভিজ্ঞতায় বুৱালেন যে শ্যামলী মিথ্যে কথা বলছে না।

--'সৱ্ তো!'

পিছনেৱ দিকেৱ জানলার পাশে একটা দৱজাও আছে। সামনেৱ দিকেৱ দৱজা রাস্তাৱ উপৱো।
আৱ পিছনেৱ দৱজাটা খুললেই দত্তদেৱ বিৱাট আমৰাগান। রাতেৱ বেলা পুৱো অন্ধকাৱ
থাকে! দেখলেই কেমন বুক টিপচিপ কৱে। মনে হয় আমৰাগান নয়, আমাজন! সচৱাচৱ
এই দৱজাটা শিবু বা শ্যামলী-কেউই খোলে না! খোলা বারণ আছে। এই আমৰাগানে
কতকিছু থাকতে পাৱে। পাগলা কুকুৰ থাকতে পাৱে, বিষাক্ত কীট পতঙ্গ থাকতে পাৱে।
এমনকি সাপ-খোপ থাকাও আশ্চৰ্য্য নয়।

কিন্তু সেসব কিছুৱ তোয়াক্কা না কৱেই পিসি একহাতে একটা খ্যাংড়া ঝাঁটা নিয়ে গঢ়গঢ় কৱে
হাঁটা দিলেন বাগানেৱ দিকে। ভূত হোক্, কি মানুষ-ঝাঁটাৰ বাড়িতেই তাকে যমেৱ বাড়ি
পাঠাবেন। শ্যামলীও পিছন পিছন আসছিল। তাকে বারণ কৱলেন--'রাতেৱ বেলা নাইটি পৱে
খোলাচুলে কি ভূতকে রঙ দেখাতে যাবি? ঘৱেই থাক্। তুমি এসো তো বৌ'।

দেৰীৱ মা ভয়ে ভয়ে পিসিৰ পিছন পিছন গেলেন। তার যে খুব যাওয়াৱ ইচ্ছে ছিল তা নয়।

কিন্তু পিসি বয়স্ক মানুষ। একা সামলাতে পাৱবেন না। তাই তাকে সাপোর্ট দিতেই গেলেন।

অবশ্য যদি সত্যিই কেউ আমৰাগানে লুকিয়ে থাকে তবে তাকে খুঁজে বেৱ কৱা মুক্ষিল!

বিশাল বিশাল আমগাছগুলো প্রায় দৈত্যেৱ মত দু হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এগোতে
গেলেই পায়ে জঙ্গলী লতাপাতা জড়িয়ে যাচ্ছে। বাগানেৱ ভিতৱ্বটা ঘুটঘুটে অন্ধকাৱ! যেন
ক্লপকথা বৰ্ণিত দৈত্যেৱ বাড়ি। কিছুক্ষণ থাকলেই মনে হয় এক্ষুনি বুঝি কেউ নাকি সুৱে বলে
উঠবে--যাঁকে পাঁই তাঁকে খাঁই!,

ভয়ে ভয়ে পা বাড়ালেন দেবীর মা। আমগাছগুলো এতটাই কম ফারাকে দাঁড়িয়ে আছে যে একটার ডালপালা আরেকটার উপরে গিয়ে পড়েছে। এখান থেকে আকাশ দেখার উপায় নেই। পুরোটাই অন্ধকার! তেমন কোনও আওয়াজ নেই। শুধু যি ঝিঁর ডাক একঘেয়ে রিঙ্টোনের মত বেজেই যাচ্ছে!

তার ভিতরেই হঠাৎ শোনা গেল কুকুরের ডাক! একটা কুকুর প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে! কেন চেঁচাচ্ছে! সন্দেহজনক! খুব সন্দেহজনক! কুকুরের ডাকটাও কেমন হিংস্র! কি হল! ভয়ঙ্কর বা অন্ধুত কিছু দেখেছে না কি!

--'কুকুরের ডাকটা কোথা থেকে আসছে বৌ'?

পিসির কথার উত্তর দিতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল দেবীর মায়ের--বোধহয় বাগানের ভিতর থেকে'।

--'দূর ছাই, এত চেঁচাচ্ছিস কেন বে! চুপ কর না!'

ঘোঁতন দাবড়ানি খেয়েও চুপ করল না। বরং উলটে ল্যাজ ঝাপ্টে, গাছের দিকে মুখ উঁচিয়ে, শিরা ফুলিয়ে, তারস্বরে ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক করতে লাগল।

--'কুত্তাটা ডোবাবে দেখছি'। বিশ ফিসফিস করে বলে--শা-লা! তোর আমাকে কেস খাওয়ানো ছাড়া আর কোনও কাজ নেই? তোর কোন পাকা ধানে মই দিয়েছি আমি?'

--'কাকু...।' পাশ থেকে পিকুল ফিসফিসায়--ঘোঁতনকে চুপ করানোর উপায় নেই!, হারাধন চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। পিকুলের প্রশ্নে মাথা নাড়লেন। আমবাগানে আসা ইন্টক মশার কামড়ই খেয়ে যাচ্ছেন! এমনিতেই মন-মেজাজ খারাপ। তার উপর এই ভীমরূপ সাইজের মশার কামড়! বোধহয় শরীরের সব রক্তই খেয়ে ফেলল।

--'মারো তো ব্যাটার পৌঁদে তিন লাথি!', পিকুল ক্ষেপে গিয়ে বলে--জ্বালিয়ে খেল হতছাড়া! যেরকম ডেসিবেলে চেমাচ্ছে, কেঁটি বুড়ি ঠিক আমাদের এসে পাকড়াও করবে! তারপর পাড়ার ছেলেদের ডেকে আডং ধোলাই দেবে!'

--'ওর আগে তোর পৌঁদে তিন লাথি মারা উচিং।' বিশও চটে গেছে-- না তোর টি.বি.সি প্রস্তাবে কান দিতাম, না আমার এই জন্তিস্বত্ত্বের উপকরণ নানা ক্ষেত্রে প্রযোগ করার উপক্রম!',

--'ভেরি ব্যাড বিশুদ্ধা!', পিকুল শুকনো মুখ করেছে--যখন সিন্ডারেলার খোঁজে মিস্ তনুর মত একটা বিষ মালের বাড়ি জানটাকে হাতে রেখে তুকলাম, তখন তো গুরু খুব জোশ দেখাচ্ছিলে। আর এখন কাল্ট মারার তাল করছো। এটা কি ভালো হচ্ছে? ধম্মে সইবে না, খুড়ো'।

--'ধম্মের গাঁড় মারা গেছে।' মশা মারতে গিয়ে চটাস্ চটাস্ করে নিজেকেই গুচ্ছের চাঁচিয়ে সে বলে-- এখন এখন থেকে বেরোনোর মতলব ভাঁজ। আগামী পাঁচ মিনিটে যদি এখান থেকে বেরোতে না পারি...তোকেই খরচা না করেছি...'।

ঘোঁতন এতক্ষণ দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে আধহাত জিভ বের করে হ্যাহ্যাক করছিল। এবার কানখাড়া করে কি যেন শুনল। তারপরই--ভৌ...ভৌ...গৱৱৱৱ.....!

আসলে কোনও ঘটনাই ঘটত না, যদি না হারাধনকাকু রাতের বেলায় ঘোঁতনকে নিয়ে চড়তে বেরোতেন। আজই ইঙ্গিতারা চলে গেল। সেজন্য মন খারাপ ছিল। কবে আবার মেয়ে

আসবে কে জানে! থাকে তো সেই কোন্ মুলুকে! ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করে কিনা কে জানে! তিনি চোখে দেখতে পান না ঠিকই, কিন্তু মেয়েকে স্পর্শ করে বুঝেছেন—ইঙ্গিতার চেহারা খারাপ হয়েছে বারবার মনে হচ্ছিল—কি জানি, মেয়েটা ভালো আছে তো? অবনী অবশ্য ভালো ছেলে, কিন্তু বাপের মন....!

ভাবতে ভাবতেই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া খেতে ইচ্ছে করছিল। তার মধ্যে ঘোঁতনটাও চেঁচামেচি জুড়েছে। তারও হয়তো ছেট বা বড় বাইরে পেয়েছে। অগত্যা তাকে নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন হারাধন।

এই অবধি সবই ঠিকঠাক ছিল। সমস্ত কেলো করল এই হতচ্ছাড়া ঘোঁতনটা। বিন্তিপিসির বাড়ির ঠিক সামনে এসেই ব্যাটা আর নড়তে চায় না! বরং উলটে কি দেখে যেন উত্তেজিত হয়ে গাঁক গাঁক করে ডাকতে শুরু করল। হারাধন তাকে যতই ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করেন, সে তত জোরে চিংকার করে। ঐ ভাবে চেঁচাতে চেঁচাতেই আচমকা হাতের চেইন ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গেল।

হারাধন তার চেইন সামলাতে না পেরে উলটে পড়লেন। তার চোখ থেকে চশমাটা ছিটকে পড়ল। তিনি তখনও বুঝতে পারেননি ঠিক কোথায় আছেন! অসহায় ভাবে মাটি হাতড়ে হাতড়ে গগলস্টা খুঁজছেন, এমন সময় মনে হল খুব কাছেই কে যেন দাঁড়িয়ে ফৌঁৎ ফৌঁৎ করে নিঃশ্বাস ফেলছে! ভাবলেন, তাকেই একটু চশমাটা খুঁজে দিতে বলবেন। এই ভেবে যেই না উপরের দিকে মুখ তুলেছেন, অমনি একটা মেয়েলি গলায় তারস্বরে চিংকার! হঠাৎ কানের কাছে এই ভাবে ক্যাঁচাল করার অর্থ ঠিক কি বুঝে উঠতে পারেননি। কারণটা জিজ্ঞাসা করতেই যাচ্ছিলেন, তার আগেই—ওরে বাবারে, মা-রে, খেয়ে ফেলল রে, বলে কে যেন রাম চিংকার করে উঠল। পরক্ষনেই ছুড়দাঢ় করে একটা আওয়াজ!

কে যে কাকে খেয়ে ফেলল তা বোঝার আগেই তাকে দুদিক দিয়ে কারা যেন চেপে ধরল।
--'কাকু, আপনি কেলো করেছেন!'

হারাধন নিজেই ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই একটা কষ্টস্বর তাকে আশ্চর্ষ করল—'এতরাতে এখানে কি করছেন?'

--'ঘোঁতনকে নিয়ে বেড়াচ্ছিলাম'। তিনি বললেন—'বিশু না? কি হয়েছে?'

বিশু উত্তর দিল না। বরং পাশ থেকে আরেকটা গলার আওয়াজ ভেসে এল। এ তল্লাটের বেশিরভাগ লোকের গলাই তার চেনা, এটা পিকুল।

-' বিশেষ কিছু না। আগের বার যেমন বিশুদ্ধ কেস খেয়েছিল, এবার তেমনি আপনিও খেতে যাচ্ছিলেন। কেংটি বুড়ির ভাড়াটের বৌ আপনাকে দেখে ভয় পেয়েছে'।

--'আমাকে দেখে!', তিনি অবাক।

--'ঠিক আপনাকে নয়। ইনফ্যান্ট আপনার চোখ দেখে,। পিকুল থেমে যোগ করে—ও আপনাকে 'অসভ্য চোখ' ভেবেছে!'

এবার ব্যাপারটা বুঝলেন হারাধন। আসলে তিনি মেয়েটির ঘরের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে চশমা খুঁজছিলেন। মুখ তুলতেই তার চশমাহীন আজন্ম বিকৃত সাদা চোখজোড়া দেখে সে ভয় পেয়েছে। তারই আফটারএফেষ্ট এই চেঁচামেচি!

--'তাহলে... তাহলে এখন কি হবে?', ভয় পেয়ে বললেন হারাধন।

- 'চটপট গা ঢাকা দিতে হবে'। পিকুল বলল--'কেঁটি বুড়ি তো বুড়ি নয়, সাক্ষাৎ পোলদারোগা! আপনার কপালে কি আছে জানি না, আমাদের কপালে রামপ্যাঁদানি বিশেষ করে বিশুদ্ধার...'।
ব্যস্ত, তারপর থেকেই এই বনবাস! এই ভুতুড়ে আমবাগানে নির্বাসিত হয়েছে তিনজনে। ঘোঁতন আগেই এদিকে চলে এসেছিল। এবার বাকি তিনমূর্তি জুটল!
--'কিন্তু তোমরা দুজন এখানে এতরাতে কি করছ?' হারাধন কৌতুহলী।
--'নজর রাখছি কাকু'। পিকুল ঠাঁই করে নিজের গালেই একটা থাঙ্গড় হাঁকাল--'আমরাও অসভ্য চোখে'র খোঁজে আছি'।
--'কিন্তু তার জন্য তো পাড়ার ছেলেরা নজরদারি করছে!'
--'পাড়ার ছেলেদের কম্মো নয়'। সে গন্তীর হয়ে বলে--'ওরা হচ্ছে পুলিশ বা ফায়ার ব্রিগেডের মতন। সব কেস হয়ে ফাইল গুটিয়ে যাওয়ার পর আসে, আর ভুলভাল লোকের ঘাড়ে দোষ চাপায়! ওরা গোয়েন্দাগিরির কি জানে! ক্লু দেখে না, এভিডেন্স দেখে না! খালি ভুলভাল অ্যাসাম্পশন করে, আর লোককে চমকে বেড়ায়।' বলতে বলতেই খুৎনি চুলকুতে লাগল পিকুল--'কিন্তু বিশুদ্ধা, একটা জিনিস খুব গড়বড়ে লাগছে। ডাল মে কুছ কালা হ্যায়!'
--'এতরাতে কি ডালে লাল দেখিবি? লাল আম ঝুলিয়ে রাখবে কেউ!', বিশু খিঁচিয়ে ওঠে--'অঙ্ককারে সব ডালই কালো লাগে!'
--'আরে! এ ডাল সে ডাল নয়। এ হচ্ছে খাওয়ার ডাল। রাষ্ট্রভাষা বলছি'।
--'কেন বলছিস?', সে খ্যাঁক খ্যাঁক করে ওঠে--'তোকে এখন রাষ্ট্রভাষা আওড়াতে কোন্ গাধা বলেছে? বাঙালীর বাচ্চা হয়ে তোর মাথায় এই সক্ষটকালে রাষ্ট্রভাষা আসছে!'
--'ধূর বাল! এত আদিম হয়ে যাচ্ছ কেন?' পিকুল বলে--'বুদ্ধি খাটাও মামা। ইঙ্গিতাদির বেলায়, আর এবার কোনও কিছু কমন পাচ্ছো?'
--'এ কি তোর সেমিস্টারের সাজেশন পেয়েছিস্ যে কমন পড়বে?'
--'খামোখা গোঁসা খাচ্ছ কেন? একটু ভেবে বল দেখি'।
--'কমন আর কি?', বিশু মুখটাকে ফাটা ঠাঙ্গার মত করে বলে--'থাকার মধ্যে আছে ঐ হতভাগা ডিপ্লোডোকাস, ব্রন্টোসোরাস, নরকের নারকেল, সমুদ্রের উকুন ঘোঁতন। ওর জন্য আগেরবার আমি কেস খেয়েছিলাম। আর এবার হারাধনকাকু ফেঁসেছেন!'
হারাধনকাকু এতক্ষণ ধ্যানস্থ বকের মত চুপ করে ছিলেন। এবার হঠাত বলে উঠলেন--'তাইতো! শুধু ঘোঁতন নয়, গাছটাও কমন ফ্যাট্টের!'
--'এগজ্যাট্টলি', পিকুল বলল--'দেখলে বিশুদ্ধা। কিছু শেখো...কিছু শেখো। খালি হাতে ছেঁড়া চশ্চল ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ালেই হবে?'
--'কি শিখব শুনি?'
--'সিম্পল অঙ্ক। অ্যারিথমেটিক।'
--'আমি নেই!', বিশু তিন পা পিছিয়ে গেল--'তোর অ্যারিথমেটিক গোলায় যাক। ঐ ফুটো চৌবাচ্চার ফান্ডায় আমি আর পড়ছি না!'।

- 'তা পড়বে কেন?' পিকুল ফিচলেমি মার্কা হাসি হাসে--এখন অন্য ফুটো চিনেছ যে! যাই হোক, ব্যাপারটা খুলে বলি। ইঙ্গিতাদির দিনও ঘোঁতন জানলার পাশের আমগাছটার দিকে বারবার তেড়ে তেড়ে যাচ্ছিল। আর আজও ও আমাদের আমবাগানে টেনে এনেছে। আর বারবার সামনের গাছটার দিকে তাকিয়ে চেঁচাচ্ছে। অর্ধাৎ আমগাছটায় কিছু আছে!'
- 'নিষ্পয়ই আছে'। বিশু বলল--'আম আছে। ঘোঁতনের নোলা সম্পর্কে আমি খুব ভালো ওয়াকিফ! যে হতচাড়া আফটারশেভ পর্যন্ত চাটে, সে আমের আঁটি চাটতে চাইতেই পারে!'
- 'না বস্'। সে বলে--'আম নয়, অন্য কিছু আছে। এমন কিছু আছে যা আমাদের রহস্যসন্ধানে হেল্প করতে পারে। ওঠো বীরজায়া, বাঁধো কুণ্ডল...।'
- 'রাষ্ট্রিভাষা ছেড়ে এখন সাধুভাষা ধরলি কেন বাওয়া! আর বীরজায়া বলছিস্ কাকে? আমাদের মধ্যে কার বুব্স্ আছে শুনি?'
- 'ওটা কথার কথা।' পিকুল রহস্যময় হাসি হাসে--'আসলে তোমাকে উঠতে বলছি। চুল বাঁধার জন্য নয়। চুপচাপ ঐ গাছটায় উঠে যাও।'
- 'হা-মি!' বিশুর মুখ থেকেও রাষ্ট্রিভাষা বেরল--'মানে আ-মি! আমি কেন?'
- 'তবে কি হারাধনকাকু গাছে চড়বেন? আরে বুজুর্গদের হাজিড়ির কথাও একটু ভাবো!'
- 'কি আশ্র্য! তুই তো বুজুর্গ নোস্'। সে গলা চড়ায়--'তুই চড়চিস না কেন গান্ধু?'
- 'ভলিউম কম করো'। পিকুল বলল--'নয়তো কেঁটি বুড়ি এসে ধরল বলে। আমি গাছে চড়তে পারি না! তাছাড়া এখন আমার থিক্ক করার আছে।'
- 'এতক্ষণ তো থিক্ক করলি, তাতেও হল না!'
- 'না হয়নি। তুমি গাছে চড়বে কি না!'
- বিশু বুঝল গাছে না চড়ে উপায় নেই। পিকুলের পালায় পড়েই অন্যায় হয়েছে। হতভাগা গাছে চড়িয়ে মই লোপাট করে দেওয়ার ব্যাপারে এক্সপার্ট!
- 'কি ভাবছ? উঠে যাও।' বোকারা গাছে চড়লে বুদ্ধি খোলে, এটা চাইনিজ প্রবাদ!
- তোমারও বুদ্ধি খুলল বলে। কোনও চাপ নেই মামা। একদম বিন্দাস চড়চড়িয়ে উঠে যাও।' বিন্দাস শুনেই বিশুর ইচ্ছে করল ঠাস্ ঠাস্ করে পিকুলকেই চড়াতো। কিন্তু উপায় নেই। চড়তেই হবো। পিকুলের মাথায় যখন ভূত চেপেছে তখন তাকে গাছে না উঠিয়েই ছাড়বে না! সে মাথার উপরের আমগাছটার দিকে তাকাল। কি যাম্না গাছ রে বাবা। গুঁড়িটা এইসান মোটা যে পা রেখে ওঠার উপায়ও নেই।'
- 'পিকুল, তুই আমায় কাঙ্কা দে।'
- পিকুল কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে--'লেঃ হালুয়া! তুমি তো এখনও পটল তোলনি। তবে কাঙ্কা দেওয়ার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে?'
- 'আরে খেজুর!' বিশু দাঁত খিঁচিয়ে বলে--'আমি সেই কাঙ্কা দেওয়ার কথা বলছি না।' তোর কাঁধে ভর না দিয়ে আমি উঠবো কি করে। এ শালার গাছের গা পুরো সিঙ্ক! পা রেখে ওঠার উপায় নেই!'
- 'বাচ্চার জান না নিয়ে তুমি ছাড়বে না! আচ্ছা...দাঁড়াও...।'
- পিকুল গাছের তলায় এসে দাঁড়ায়--সাবধানে উঠো। আমার কাঁধটা ভেঁগে না।'
- 'বেশি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করলে তোর মুস্তু ভাঙবো। চুপ করে দাঁড়া। নড়িস্ চড়িস্ না!'

অতএব পিকুল একেবারে ল্যাম্পপোস্টের মত দাঁড়াল। তার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল
বিশু। পিকুলের কাঁধে উঠতেই 'ছপ্ ছপাৎ' করে গাছের ডাল এসে বাড়ি মারল তার নাকে!
--'উঃ... শালা... তোর জন্য আমার নাকটাই...'। বলতে বলতেই চুপ করে গেল সে।
গাছের ডালের মধ্যে যেন ঘন অঙ্ককার জমে আছে। কিন্তু তার মধ্যেই হীরের টুকরোর মত
কি যেন জ্বলছে! অদ্ভুত কিছু একটা! সে একহাতে গাছের ডালটা সরাতেই চকচকে
জিনিসটা আরও স্পষ্ট হল।

ঘোঁতনও সন্তুত জিনিসটাকে দেখতে পেয়েছে। সে হিংস্র দাঁত বের করে গর্জন করে উঠল--
'গৱ্ৰ... ঘ্যাঁক... ঘ্যাঁক...'।

বিশু এবার ভয় পেয়ে গেল! ওটা কি! ভূত টৃত নয়তো! কিস্বা সাপ! গল্লে টল্লে পড়েছে
সাপের চোখ না মাথার মণি নাকি জ্বলে! তবে ওটা...!

--'আরে, এতো নড়ছ কেন?' নীচ থেকে পিকুল অধৈর্য হয়ে বলে--'উঠে যাও না মামু--
হারি আপ্। আমি কি আইফেল টাওয়ার--যে মাথায় চড়ে ভিট দেখবে?'

বিশু এর উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই খ্যানখ্যানে গলায় কে যেন চেঁচিয়ে উঠল--
'কোথায় রে মুখপোড়া ড্যাক্ৰা! কোথায় লুকিয়েছিস? মরদের বাচ্চা হয়ে থাকিস্ তো সামনে
আয়!'

--'সৰ্বনাশ! কেংটি বুড়ি!', পিকুল কেঁপে উঠে--'গয়া ভঁইস পানি মে!'

কেংটি বুড়ি, তথা বিভিপিসি হাতে খ্যাংৱা ঝাঁটা নিয়ে এদিকেই আসছেন। পিছন পিছন
দেৰীৰ মা! দেৰীৰ মায়েৰ অবস্থা অনেকটা লাস্ট ব্যাটসম্যানেৰ মত। ব্যাট কৱতে পাৱে না।
হয়তো প্ৰথম বলেই উলটে পড়বে! তবু প্যাড, হেলমেট সব ধৰাচূড়ো পৱে নাক বাঁচানোৰ
জন্য ফিল্ডে নেমে পড়েছো মনে মনে ভাবছে, শালা, প্ৰথম বলটাই যদি বাউজাৰ হয়, তবে
স্ট্ৰেট প্যাভিলিয়নেৰ দিকে দৌড়বো! দেৰীৰ মায়েৰ ঠিক সেই অবস্থা! যদি সেই ভয়ঙ্কৰ চোখ
সামনে এসে পড়ে তবে কি কৱবেন তাই ভাবছিলেন! বিভিপিসিৰ হাতে তবু খ্যাংৱা ঝাঁটা
আছে। তাঁৰ হাতে তো একটা দেশলাই কাঠিও নেই!

--'হতভাগা!... কোথায় তুই! ক্ষ্যামতা থাকে তো সামনে আয়!'

কি সৰ্বনাশ! একেবারে ওপেন চ্যালেঞ্জ! ওদিকে কুকুৱেৰ ডাকেৱ আওয়াজ ক্ৰমশই বাঢ়ছে।
মনে হচ্ছে কয়েক হাত দূৰেই ডাকছে কুকুৱটা! তার উপৱ বিভিপিসিৰ চ্যালেঞ্জ! যদি
ভূতটাৰ প্ৰেস্টিজ জ্ঞান প্ৰবল হয়ে থাকে! যদি সত্যিই সামনে চলে আসে?

ওদিকে বিভিপিসিৰ বাজখাই গলার চিংকার শুনে বিশুৰ হাড় হিম হয়ে গেছে। এ ফুলটু
'মাতাহারি' কেস! এ আমবাগানে চুকেই আঘাতত্যা কৱে ফেলেছে তাৰা। উপৱে হয়তো
'ন্যাজা ন্যাজা,' ন্যাজ দোলাচ্ছে। চটপট গাছেৰ ডালে উঠে মায়া হয়ে যাওয়াৰ উপায় নেই।
তার উপৱ নীচে কেংটি বুড়ি অ্যানাকোভাৰ মত ধেয়ে আসছে। তার 'হালুম হালুম' শুনে
স্পষ্ট মালুম হচ্ছে যে মালটা একদম এই ডিৱেকশনে আসছে।

--'আরে বিশুদা!...'। নীচ থেকে অধৈর্য হয়ে বলল পিকুল--'তুমি আমার কাঁধে উঠে কি
বাল ছিঁড়ছো? গাছে উঠে পড়ো না!'

--'ওঠা যাবে না!', বিশু ধৰা গলায় বলে--'উপৱে ন্যাজা ন্যাজা বসে আছে বোধহয়! চোখ
জ্বলছে!'

--'ন্যাজা ন্যাজা! মানে গোখরো!' পিকুল কেমন নারকেলি কুলের মত মুখ লম্বা করেছে--
'সাপ! তুমি কি পাগলু হলে! সাপের চোখ কখনও জ্বলে! সাপের চোখে ফসফরাস থাকে
না! জ্বলবে কি করে?'

--'চোখ না হলে মাথার মণি জ্বলছে! যাই হোক, আমি এখনই খাটিয়া ধরতে চাইনা'।
পিকুল মুখটাকে প্রায় একতাল বেগুনভর্তার মত করে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার
আগেই মূর্তিমান বিপদ সামনে এসে হাজির! বিভিপিসি, সাথে খ্যাংরা! ঠিক একহাত দূরেই
একদম ঝাঁটা হাতে মূর্তীমতি শাড়ি পরা যম! খ্যানখ্যানিয়ে বললেন--'হ-ত-ভা-গা! কোথায়
লুকিয়ে ব-সে আ....'

--'হা-রে-রে-রে....'। পিকুলের মাথায় তখন হয় ডাকাত, নয়তো চেঙ্গিজ খাঁ এর প্রেতাভা
ভর করেছে। সে কিছু না ভেবে চিঞ্চেই বিশুকে ঘাড়ে নিয়ে লাফ মেরে এগিয়ে গেল
বিভিপিসির সামনে--'হামকো চ্যালেঞ্জ করতা হায...হামকো! আবেদন নিবেদন মে কাজ
নেহি হোগা তো লড়কে লেঙ্গা পাকিস্তান। রা-মা হো-ও-ও-ও-ও-ও-ও!'

ডায়লগ শুনে বিশুর পিলে চমকে গেছে! এসব কি বলছে পিকুল! কি অসীম সাহস!

--'ভূ-উ-উ-ত!'

অন্যদিকে বিভিপিসিও আঁৎকে উঠেছেন! দেবীর মা ভয়ে স্পিকটিনট! এ কি! সামনে এ
কে! মানুষ! কেমন মানুষ! আবছা আবছা ঠ্যাংছুটো মাটিতে! কিন্তু মুস্তুটা সিধে আমগাছে
গিয়ে ঠেকেছে! অঙ্ককারে মুখ দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু এ মানুষ নয়! এত লম্বা মানুষ
হয়! নির্ধাঃ ব্রক্ষদত্য! বিভিপিসির চ্যালেঞ্জ যে ভারি পড়ে গেল!

বিশু পিকুলের ঘাড়ে বসে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না! অঙ্ককারে তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছে
না! পিকুলের ভয়াবহ রাষ্ট্রভাষায় ঠিক কি এফেষ্ট হল বোঝার উপরে নেই! কিন্তু একটা গেঁ
গেঁ শব্দ আর পরক্ষণেই ধপাঃ করে কিছু পড়ার আওয়াজ শুনে ঘাবড়ে গেল! কেলো
করেছে, বিভিপিসি কি হার্টফেল করলেন!

সে পিকুলকে কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই....!

সড় সড়াৎ করে আমগাছ থেকে কি একটা যেন এসে পড়ল তার ঘাড়ে! একটা সরুমতন,
পাতলা, লম্বা চাবুকের মত কিছু! হিলহিল করে নড়ে তার মাথার উপরে। সর্বনাশ! ন্যাজা
ন্যাজা! এক্ষুনি ফোঁস করে ছুবলে দিল বলে! শা-লা, এক ছোবলেই ছবি!

--'আঁ-আ-আ-আ!', একটা দুর্বোধ্য চিৎকার করে সে পিকুলের মাথা থেকে লাফিয়ে পড়ল
মাটিতে! কিন্তু ঠিক মাটিতে পড়ল না....! পড়ল নরম নরম একটা কিছুর উপরে! মুহূর্তের
মধ্যে আরও একটা গগনভেদী চিৎকার--খেয়ে ফেলল রে-এ-এ-এ!', তারপরই ধপাঃ করে
আরও একটা শব্দ!

--'কি হল....?....কি হল....?'

কি আবার হবে? অঙ্ককারে বিশু আর পিকুলের কম্বাইন লম্বা মূর্তি দেখে দেবীর মা আগেই
ফেইন্ট হয়ে পড়েছিলেন। বিভিপিসি তবু উইকেটে টিংকে ছিলেন কোনওমতে! কিন্তু বিশু লাফ
মেরে পড়বি তো পড়, একদম তার ঘাড়ে! এবং পিসি স্টাম্পড! একদম তেকাঠি ফাঁক
কেস।

--'কি হল তা পরে দেখবে বিশুদ্ধা!,' পাশ থেকে পিকুল উত্তেজিত স্বরে বলে--'এখন দুই ঠ্যাঙের উপর ভ্যানিশ হও। পাড়ার ছেলেরা যদি চিংকার চেঁচামেচি শুনে এসে পড়ে, তবে চারপায়ায় যেতে হবে। কাকু...কোথায়...?'

হারাধন বিপদ বুঝেই ছুট লাগিয়েছেন। কিন্তু উল্টোদিকে! তাকে চেপে ধরল পিকুল।

--'আরে ওদিকে নয়--আপনি উলটো ট্র্যাকে যাচ্ছেন কাকু। তাড়াতাড়ি এদিকে আসুন...।' সে শুধু এইটুকুই বলতে পেরেছিল। আরও কিছু বলার আগেই বাগানের বাইরে জব্বর শোরগোল। কয়েকটা টর্চের আলোর ঝলকানি! সম্ভবত আমবাগানের ভিতরে চিংকার চেঁচামেচি শুনতে পেয়েছিল শ্যামলী। সে ছুটে গিয়ে পাড়ার ছেলেদের ডেকে এনেছে! তারা এসে আসল ঘটনা আবিষ্কার করার আগেই ভোগা দিতে হবে।

অঙ্ককারের মধ্যেই হাত ধরাধরি করে প্রায় বড়ের বেগেই মানে মানে ভেগে গেল তিনজন। পিছন পিছন দৌড়ল ঘোঁতন!

বিন্তিপিসি বা দেবীর মা কেউই হার্টফেল করেননি। মেয়েমানুষের বড় কড়া জান। কয়েক বোতল জল ছেটানোর পর তাদের কাছ থেকে 'অসভ্য চোখে'র বর্ণনা পাওয়া গেল। সে কি বর্ণনা! শ্যামলী জানাল, যে লোকটার চোখ ছুটো একদম সাদা! মণি আছে কি নেই বোৰা যায় না! দেবীর মা জানালেন--ওটা কোনও মানুষই নয়! আসলে ওটা ভূত। প্রায় দশ বারো ফুট লম্বা! হাইট একটা বিশালকায় আমগাছের গুঁড়ির সমান! বিন্তিপিসি বললেন--শুধু তাই-ই নয়! ভূতটা তাকে গদাম করে এক রন্দাও মেরেছে! অমন মোক্ষম রন্দা কোনও মানুষ মারতে পারে না! সে দুশো বিরাশি সিকার রন্দা খেয়ে তিনি মুছে গিয়েছিলেন। তার সাথে এ ও জানালেন, ওটা কোনও সাধারণ ভূত নয়! নির্ধারণ কোনও ভোজপুরী সৈনিকের প্রেতাঞ্চা! যেভাবে 'লড়কে লেজা পাকিস্তান' বলছিল তাতে সে কারণিলের কোনও মৃত জওয়ানের আঞ্চা না হয়েই যায় না! তার উপর যে ভূত নিজের মুখেই 'রামা হো' বলে রামনাম করে সে খুব সহজ ভূত নয়!

সব শুনে ছেলেরা কিছুক্ষণ হাঁ করে পরস্পরের মুখ দেখল। শুধু সুব্রতদার মুখ গন্তীর হয়ে গেল। ভুঁরু কুঁচকে শুধু বললেন--'হ্ম...!'

১৩.

--'উঁহ... ভাই... হচ্ছে না... হচ্ছে না! কোমরটা আরেকটু হিলাও। নরম নরম করে মিনি বিড়ালের মত ঠ্যাঙ ফেলো। অত লম্বা লম্বা ঠ্যাঙ ফেললে চলবে না!'

--'ভাই... তোমার কানচাপাটি খেয়ে আগের মাকড়াটা ভেগে গিয়েছিল। এবারের মাকড়াটাকে কিন্তু ইমপ্রেস করতেই হবে। একটা প্রীতি জিন্টা মার্কা সুইট সুইট স্মাইল দাও। খুব টেম্পার ঢড়ে গেলে ঐরকম করে দাঁত কেলাবে। কিন্তু খবর্দীর, কানচাপাটি একদম নয়!'

--'ও কি রকম বগার মত ঠ্যাঙ ফেলছ। মেয়েদের মত হাঁটো না! 'ময়না ছলাং ছলাং, ইস্টাইল!'

--'ভাই, তুমি এমন ভাবে হাসছ যেন তোমার গাঁড়ে ওয়াট লেগেছে--মানে কনস্টিপেশন হয়েছে ঠিক করে দাঁত কেলাও। বিলকুল বিন্দাস লুজ মোশনের মত!'

মহা কিচাইন! যার জিরাফের মত লম্বা লম্বা ঠ্যাঙ, সে বিড়ালের মত ছোট ছোট পা ফেলে কি করে! শুধু তাই নয়, কোমর 'হিলিয়ে' 'ময়না ছলাং ছলাং' স্টাইলে হাঁটতে হবে। লুজ মোশনের মত হাসতে হবে! রাগ হলে কানচাপাটি মারা যাবে না! বরং উলটে দাঁত দেখাতে হবে! এ আবার কি নিয়ম!

ভিতরে ভিতরে মহা বিরক্ত হচ্ছিল লাটু! সবাই মিলে তাকে মেয়ে বানিয়েই ছাড়বে! না, সে পারে না! সে লিপস্টিকের সাথে লুবড়ি মাখা হাসি হেসে কারুর মন ভোলাতে পারে না। রঞ্জের রাধিকার মত পঁচাতের ডিগ্রীতে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটতে পারে না। মাকড়াগুলোরও কত রকমের আবদার দেখো। আগের নমুনাটার কথাই ধরো না! নিজে তো চ্যাগাই কাতিক! অথচ কিসব ডিম্যাণ্ড! বৌকে সুন্দরী হতে হবে, পড়াশোনা জানতে হবে, পাছা অবধি চুল থাকতে হবে, গান-বাজনা জানতে হবে। এতকিছু থাকার পর তাকে কি করতে হবে? না হাউসওয়াইফ হতে হবে! বাসন মাজতে হবে, ঘর ঝাঁটপাট করতে হবে, হেঁসেল ঠেলতে হবে। মানে কমপ্লিট দাসীগিরি! আবে গান্ধু! সুন্দরী, শিক্ষিতা, গানবাজনা জানা মেয়েকেই যদি ঘরে তুলবি, তবে তাকে ঘরের বাঁটি করে রাখবি কেন বে? আর যদি ঘরের বাঁটি করতেই হয়, তবে নিজের বাড়ির 'ঝি' টাকেই বিয়ে কর্ন না! দিব্যি বিনাপয়সায় ঘরের কাজকর্ম করে দেবে! কোনো ক্যাওড়া না করে ছানাপোনা বিহিয়ে পাঁচী-পেঁচোর মা হবে! বিন্দাস প্রবলেম সলভড!

এতসব অঙ্গুতুড়ে কথা শুনে আগেরবার লাটুর মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। মালটার কানে এক কানচাপাটি মেরে বলেছিল-'শা-লা কেরোসিনের ফাটা বোতল! বিয়ে করবি না মাগনার ঝি রাখবি! এখনই সামনে থেকে ফোট্, নয়তো....'। বলতে বলতেই ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একখানা প্রমাণ সাইজের চাকু বের করে এনেছিল-' বাড়া কেটে হাতে দিয়ে দেবো'। লোকটা সেই যে পালিয়ে গিয়েছিল, পিছন ফিরেও দেখেনি। এমনকি নিজের পার্স আর মোবাইলের মায়াও ছেড়েছিল!

এক আপদ যেতে না যেতেই আরেক আপদ এসে জুটেছে! ইন্টারনেট ছেড়ে মা এখন কোথা থেকে এক ঘটক ধরেছে কে জানে! সে মালটা একটা ছেলের ঠিকানা দিয়ে বসে আছে। এখন ফের তাকে দেখতে যেতে হবে লাটুকে! আগের মত কেস যাতে না হয়, সেজন্য আগেভাগেই তাকে তালিম দিতে শুরু করেছে পন্টরবৃন্দ। 'ভাই, স্লাইট দাঁত বের করো'... 'ভাই কোমর দুলিয়ে হাঁটো', ... 'ভাই, লাজুক লাজুক মুখ করে তিরছি লুক মারো', ... হাজার হাঙ্গামা!

কোনওদিন শুনেছ কোনও ভাই তিরছি লুক মেরে দাঁত কেলিয়েছে! তোলা তুলতে, অপোনেন্টের রোয়াব ঠান্ডা করতে, কারুর থোবড়া বিগড়াতে কিম্বা সপারিষদ গুভাগর্দি করতে দাঁত কেলানোর প্রয়োজন হয় না! তাই এতদিন দিব্যি সুখেই ছিল লাটু। কিন্তু মায়ের মাথায় কি যে ভূত চাপল! সাফ সাফ বলে দিল-'ওসব আমি জানি না লাটু, মরার আগে তোর কপালে সিঁহুর দেখেই মরবো। এক ছুটকি সিন্দুর কি কিমত তুম ক্যায়া জানো রমেশবাবু?', লাটু অবাক-'রমেশ কোন শুয়োরের বাচ্চার নাম? নতুন ভাই এসেছে না কি!',--'আরে না না... ওটা ওম শান্তি ওমের ডায়লগ!',

শালা, সব মুসিবতের জড় এই 'ওম শান্তি ওম'! যেদিন থেকে এই ফিল্টা রিলিজ করেছে, সেদিন থেকেই লাটুর জীবনে শান্তি নেই। হলে গিয়ে পঁচিশবার ফিল্টা দেখেছে মা। তা দেখুক, ক্ষতি নেই! কিন্তু কানের কাছে সবসময়ই ঐ 'এক চুটকি সিন্দুরের, ফার্ডাটা না আওড়ালে হয় না!

লাটু ফের প্রতিবাদ করতে গিয়েও আটকে যায়। মা ফের বললেন—'দ্যাখ্ লাটু, এসব ঝাড়পিটের ধান্দা একটা টেম অবধি ভালো। কিন্তু একদিন বুৰুবি, আসলে শ্বা, আখ্যা লাইফটাই গাধার গাঁড়ে গেছে। পাশে একটা লোক থাকবে না, তোকে কেউ ভালোবাসবে না, সোহাগ করবে না, সাথ দেবে না—তুই একা হয়ে যাবি। সিঞ্চিল্ হয়ে যাবি'।

--'ভাই, সিঙ্গল্'। পচা ফের শুধরে দেয়।

--'ঐ একই হল'। মা বললেন—'খামোখা প্রচুর লোচা বাঁধিয়ে একদিন আমার মত বা তোর বাপের মত ফৌত হয়ে যাবি! যখন মরতে বসবি তখন বুৰুবি পাশে একটা লোক থাকা বহুত জরুরী। তুই মায়ের ভোগে গেলে শিয়াল-কুত্তা কাঁদতে আসবে না, কাঁদলে ঐ একটা লোকই কাঁদবে'।

--'কেন?' নিজের সাজোপাজদের দেখিয়ে বলেছিল লাটু—'এতগুলো লোক তো পাশে আছে—তাতেও হচ্ছে না!'.

--'দূর মাগী। ভাতারের সাথে চ্যালাদের তুলনা হয়! তোর বাপেরও তো চ্যালাচামুন্ডা ছিল। তা'লে মাকড়াটা আমায় মাগ করে ঘরে তুলল কেন?'.

মাথা চুলকুচিল লাটু। এ তো বড় জটিল ব্যাপার স্যাপার।

--'ম্যালা দিমাগ চাটিস্না লাটু। আমার দোষ্ট এই ছেলেটার খবর দিয়েছে চুপচাপ দেখে আয়। বেশি মগজমারি করলে আমিই তোকে মায়ের ভোগে পাঠাবো'।

দোষ্ট! মায়ের আবার দোষ্ট কোথা থেকে এল! এতদিন তো এই পচা-সোনা-কাবুল-পটলাদের সাথে নিয়ে যুরত। কিন্তু এই নয়া দোষ্ট কোথা থেকে আমদানি হল!

লাটু চোখ সরু করল—'দোষ্ট?'

--'দোষ্ট... মানে ট্রেন্ড!'

--'ফ্রেন্ড!' পাশ থেকে ফের হেঁড়ে গলায় বলে ওঠে পচা। মা ক্ষিণ্ঠ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—'ওয়ে পকেট ডিকশেনারি! শ্বা, মুখ স্টিচ করতে কত নিবি!'

পচা চুপ করে গিয়েছিল। কিন্তু মায়ের এই ফ্রেন্ডের ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢোকেনি লাটুর। সে লক্ষ্য করেছে মায়ের মুখটা ইদানীং একটু ফর্সা ফর্সা লাগছে। পার্লারে যায় না কি! আজকাল বেশ সাজুগুজুও চলছে। কখনও চোখে মাক্ষারা, কাজল। পাঞ্জাবি ছেড়ে শাড়ি। এমনকি গয়না গাঁটিও টুকটাক পরছে। মাঝেমধ্যেই চ্যালাচামুন্ডাদের ছাড়া একাই হাওয়া হয়ে যায়! জানতে চাইলে বলে—'একা গিয়েছি তো কি? কচি টুসকি না কি যে গুম হয়ে যাবো!

কেসটা কি? এই নতুন ফ্রেন্ডটা কে? লোচাটা কি? মাকে জিজ্ঞাসা করলেই মুখে কিছু বলছে না। উলটে কেমন যেন পিঁয়াজের খোসা মার্কা স্মাইল দিচ্ছে!

যাক্ গে! নিজের লাইফেই প্রচুর চাপে আছে লাটু। মায়ের দোষ্টকে নিয়ে ভেজা ফ্রাই করার সময় নেই। এমনিতেই সে নিজেই পিনিক খেয়ে আছে। এই ব্যাড প্যাচের সময় আর কাউকে নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো।

--'ভাই, হাসছো না দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছ তাই-ই বোঝা যাচ্ছে না!' সোনা বলল--'স্মাইলটা ভালো করে দাও। দেখলেই যেন সব শালার কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যায়!'

--'শা-লা, খালিপিলি কনফিউজ করছিস কেন বে!' লাটুর আর সহ্য হল না। সে রদ্দ বাগিয়ে তড়ে যায়-- একবার বলছিস লুজ মোশনের মত হাসতে, একবার বলছিস ঘামোনিয়া প্রফ পাউডারের মত হেসে কলিজা ঠাণ্ডা করতে। মাজাকি হচ্ছে!'

--'ভাই'। এবার ভীমা মুখ খুলল--'তুমি যদি এইভাবে কথায় কথায় খচে যাও তাহলে কি করে তোমায় ট্রেইন করবো? এরকম মদ্দামার্কা যদি হয়ে থাকো তবে তোমায় কোন্ চিরকুট শাদি করবে! সোনা তো তোমায় স্মাইল দিতেই বলেছে, মিসাইল লঞ্চ করতে তো বলেনি!'

--'ধূতোরি! যতসব মাজরা! স্মাইলের ছেঁড়া গেছে...। লাটু বিরক্ত হয়ে বলে--এই খানদানি খোবড়া দেখেছিস্ম? এই খোবড়ায় কোনওদিন স্মাইল এসেছে যে আজ আসবে?' বলতে বলতেই চোখ পড়ল সেই উইভচিটারটার দিকে। ঐ রেলওয়ে ট্র্যাকের মাকড়াটা দিয়েছিল! উইভচিটারটা দেখলেই আজকাল তার কেমন যেন অঙ্গুত অনুভূতি হচ্ছে। একটা হাঙ্কা হাঙ্কা ব্যথার মত কি যেন একটা সুড়সুড়ে ভাব! এখন রাতে ঘুমোতে গেলেও মাকড়াটার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে যায় রেললাইনের উপরের মুহূর্তগুলো!... হঠাৎ ট্রেনের এসে পড়া... দুজনের জড়াজড়ি করে ছিটকে পড়া... পান্নিকটা কেমন কঢ়ি ছেলের মতন তার বুকে মাথা রেখে শুয়েছিল... হলকটটা আবার বলে কি না--'তোমাকে মায়ের মত লাগছে...।'

লাটু যতবার কথাটা ভেবেছে, তত অবাক হয়েছে! তাকে গুণ্ডার মত লাগতে পারে, ভাইয়ের মত লাগতে পারে, কষাইয়ের মত লাগতে পারে, যমদূত লাগতে পারে... এমনকি অধুনা পন্টরদের ভাষায় 'রাপচিক আইটেম'ও লাগতে পারে।

কিন্তু মা! মায়ের মত কি আদৌ লাগতে পারে লাটুকে! লোকটাকে বেছে বেছে 'মা' শব্দটাই বলতে হল! এর চেয়ে যদি বলত বাপের মত লাগছে, তাহলে এত ভাবত না সে! এখন ভাবে, তার মধ্যে এমন কি দেখল ব্যাটা, এমন কি অনুভব করল যে মায়ের সাথে তুলনা করে বসল? ওর মা কি ওকে এমন বিরাশি সিকার চাঁচি হাঁকাতো! না এই ভাষায় কথা বলতো! মা বলতে ঠিক কি বুঝিয়েছিল সে?

লাটু বুঝতে পারে, সে নিজেই আদ্যোপান্ত কনফিউজড হয়ে যাচ্ছে। মাকড়াটার সাথে দেখা হয়ে কি ভালো হল? না ঠিক হল না? কেন ও বলল, 'মায়ের মত লাগছে'? কেন উইভচিটারটা দিয়ে দিল? উইভচিটারটা তো ফেরৎ দেওয়ারও উপায় নেই। মালটাকে দিনের আলোয় দেখলেও চিনতে পারবে না লাটু! তাহলে কোন্ বিশ্বাসে উইভচিটারটা দিল সে! আজকের জমানায় বিনা স্বার্থে কোনো শালা একটা খড়কে কাঠিও দেয় না! আর এ তো আন্ত একটা নতুন উইভচিটার!

রাত্রে মাঝেমধ্যেই বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে সে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও না মনে করে পারে না মালটার কথা। হতভাগা নিজের নামটাও বলে যায়নি যে খুঁজে বের করবে। ব্যাটা বেঁচে আছে তো! সত্যিই দুঃখী লোক। একবার ব্যর্থ হয়ে ফের মায়ের ভোগে যাওয়ার তাল করেনি তো! ভাবতে ভাবতেই মনে পরে যায় উইভচিটারটা এগিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিটা। কি ছিল সেই ভঙ্গিতে? নিছক একটা মেয়েছেলেকে বিপদ থেকে রক্ষা করার দিখাওয়া! হিরো হতে চেয়েছিল

নাকি? নাঃ। বারবার ভঙ্গিটাকে মনের মধ্যে রিওয়াইন্ড করে করে দেখে লাটু। সেসব কিছু ছিল না। যদি কিছু থাকে তা হল যত্ন ও চিন্তা! মাল্টা তার জন্য চিন্তা করছিল! ছেঁড়া শাড়ি পরে একটা মেয়ে কিভাবে হেঁটে যাবে, সেই চিন্তা করেই উইভচিটারটা দেওয়া! একেই পচারা ইংরেজিতে বলে ‘কেয়ার’।

কিন্তু কেন? কেন কেয়ার করল ব্যাটা? লাটু অন্য কারুর কেয়ার থোড়াই করে! তাহলে তার জন্য কেয়ার করতে হতভাগাকে কে দিব্যি দিয়েছিল? সে তো কখনও কারুর কেয়ার চায়নি। সারাজীবন নিজেকে নিজেই সামলে এসেছে। কারুর সাহায্য কখনও দরকার পড়েনি! কেউ সাহায্য করতে চাইলে তাকে ফুটিয়ে দিয়েছে! অথচ এ লোকটার উইভচিটারটা বিনা প্রতিবাদে নিয়ে নিল কেন?

প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে বিস্মিত হয়েছে লাটু। আবিষ্কার করল, নিজের অজান্তেই কখন যেন এই যত্নুক্তু তার ভালো লেগেছে! শুধু যত্ন নয়, আরও কিছু আছে ঐ উইভচিটারটার মধ্যে যা সে বুঝতে পারছে, কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে না! কি যেন একটা ‘ধরি ধরি’ করেও ধরতে পারছে না। বারবার ফক্সে যাচ্ছে হাত থেকে!

ভাবতে ভাবতেই তার মুখে একটা প্রশান্ত হাসি ভেসে ওঠে। আপনমনেই হাসতে হাসতে বিড়বিড় করে বলে—‘শালা হলকট্।’

--‘আরে...আরে...ভাই!’, সঙ্গেপাঙ্গরা সব হৈ হৈ করে উঠেছে—এই তো হয়েছে! এই তো বিনাস স্মাইল দিচ্ছ গুৱার! একদম মধুবালা স্মাইল! চোখে ডায়মন্ড চমক! গালে লালি! চোখের পাতা ঝুঁকিয়ে একেবারে কয়ামত স্মাইল দিচ্ছ! এটাকেই হোল্ড করো। মাকড়াটা এই স্মাইলেই হেজে যাবে, পুরো ফিদা হয়ে যাবে ভাই!‘

লাটু অবাক হয়ে তাকায়! সামনের আয়নায় তাকাতেই চমকে উঠল! মাকড়া হেজবে কি, তার আগে সে নিজেই হেজে গেছে! এমন করে হাসতে লাটু মন্তান কবে শিখল! চ্যালা চামুভারা নেহাঁ ভুল বলেনি! এ তো একেবারে বলিউডের হিরোইনের স্মাইল! লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়া হাসি! এমন হাসি কি করে এল তার মুখে!

লাটু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে! এটা ঠিক কি হল?

রাতের বেলায় অন্য মাকড়াটার সাথে অ্যাপো সেরে ফিরছিল লাটু। যথারীতি মিটিং ফ্লপ। মধুবালা মার্কা হাসি, ক্যাটওয়াক দিয়েও ফিল্লু হিট করানো গেল না! এটাকে অবশ্য কানচাপাটি হাঁকড়াতে হয়নি। মাল্টা হেভি বাতেলা দিচ্ছিল। সামনে মেয়ে দেখলে অনেকেই নিজেকে গৰুর সিং ভাবে বলছিল—‘জানেন, আমি আমাদের কলেজের ৱেসলিং চ্যাম্পিয়ন ছিলাম! আচ্ছা আচ্ছা পালোয়ানকে পটকেছি...।’

লোকটার ষাঁড়ের মত চেহারা দেখে বোর হয়ে বড় বড় হাই তুলছিল সে। অনেক বারফাটাই শুনে বিরক্ত হয়ে বলেছিল—‘এগুলো কি ফেকচিস্? গাঞ্জ দেওয়ার জায়গা পাস্নি? তুই যদি ৱেসলিং চ্যাম্পিয়ন হয়ে থাকিস তবে আমিও ক্রস লি!‘

কথাগুলো হেভি ইগোয় লেগেছিল মাকড়াটার। বলেছিল—‘আমি গুল দেব কেন? যা সত্য তাই বলছি।’

--‘সত্য? তাহলে আমার সঙ্গে একহাত ফাইট করে দেখা।’ লাটু তুড়ি মেরে হাই তোলে—‘এমনিতে শালা, শাড়ি পরে আজ ব্যাকগিয়ারে আছি। তবু ফাইট দিতে পারবো।’

লোকটা গুহাপ্রমাণ হাঁ করে খ্যাক্খ্যাক করে হাসল—'ম্যাডাম, আপনি কি পাগল হলেন? আমার সাইজ দেখেছেন? তাছাড়া মেয়েরা মারপিট করে না। নরম হাতে চোট পাবেন'। লাটু তার চোখে চোখ রেখেছে—'মেয়েরা মারপিট করে না, মেয়েদের বাপ করে। আমার হাতের ফিক্ৰ ছাড় বে, নিজের হাতে চুড়ি না থাকলে পাঞ্জা নিয়ে দ্যাখ'। পাঞ্জা নিয়েছিল লোকটা। ফলস্বরূপ দুমিনিটেই মাটি ধরতে হয়েছিল তাকে। শেষপর্যন্ত লাটুকেই ফোনে অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হয়েছে।

ভাবতেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল তার। কিসব স্যাম্প্ল এক একটা। এইসব নমুনাগুলোর জন্য মা তাকে পাকড়াও করে শাড়ি পরাচ্ছে! ক্যাটওয়াক শিখতে হচ্ছে, দাঁত কেলাতে হচ্ছে! কোনও মানে হয়! শালা, দু পয়সার ক্ষমতা নেই, লস্বা লস্বা ফেকছে! রেসলিং চ্যাম্পিয়ন... এতগুলোকে পটকেছে... অমুক তমুক... যতসব বকরম্বাজ!

এসব ভেবেই তার মেজাজ চড়ে গেল! শালা, জিল্পেগিটাই হেল হয়ে যাচ্ছে! এসব কি ফাস্তা বোঝে না সে! ব্যাটাছেলে মার্কা, চিসুম চিসুম করা ফাইটমাস্টার মেয়ে কোনও ছেলে বরদাস্ত করবে না! ছেলে যদি করে, তার বাপ-মা করবে না! এমন বাপ-মা থাকারই বা দৱকার কি? দুটো বুলেটেই খচা করে দিলে হয় না?

বিয়ের মগজমারিতে জেরবার হয়ে নানারকম হিংসাত্মক প্ল্যান ভাঁজছিল লাটু। এরপরের বার কোনও স্যাম্প্লের দেখা করার সময় আঁচলে গোটা দুয়েক গ্রেনেড বেঁধে গেলে হয়! কিঞ্চিৎ আস্ত একটা রামদা ঘাড়ে করে দেখা করার প্ল্যানটা কি রকম? অথবা তার নতুন কেনা পিস্তলটা....!

--'উঃ...! বাঁচাও... বাঁচাও...!'

এতসব কল্পনা করতে করতেই এলোমেলো পায়ে হাঁটছিল লাটু। রাস্তা অন্ধকার! বোধহয় লোডশেডিং হয়েছে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সত্যি বলতে কি, এখন এমন অবস্থা যে দিনে মিনিমাম চারঘণ্টা লোডশেডিং না হলে পারিক অসম্ভষ্ট হয়! ভাবতে শুরু করে, বিদ্যুৎবিভাগের চিরকুটগুলো নির্ধারণ নাকে তেল দিয়ে ঘুম দিচ্ছে! অথবা ব্যাটাদের মাথায় কেমিক্যাল লোচা হয়েছে। হতভাগারা নিজেদের বৌয়ের নাম ভুলতে পারে, লোডশেডিং করতে ভোলে না!

চতুর্দিকে আলোর একফোটা রশ্মি ও নেই! অন্ধকারের মধ্যেই প্রায় লুমড়ি খেতে খেতে ফিরছিল সে। এই হিলজুতোর জ্বালায় তার প্রাণ যাওয়ার উপক্রম! একটার একপাটি গিয়েছিল, হাঁফ ছেড়েছিল লাটু। কিন্তু রক্ষা নেই, মা আবার একখানা রণপা কিনে এনেছে! এটা আবার আগেরটার চেয়েও ভয়াবহ মাল। ঐ পেঙ্গিল হিল না কি যেন বলে! সেটা পরে লাটুর নিজেরই হাতে পেঙ্গিল দশা!

তবু কোনওমতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটছিল বেচারি। হঠাৎ একটা লোক কোথা থেকে লাফ মেরে এসে পড়ল তার ঘাড়ের উপরে! দুহাতে তাকে জাপটে ধরে বলল—'পিল্জ... বাঁচান দাদা... ঐ কুকুরটা... ঐ কুকুরটা আমায় ছিঁড়ে খাবে...!'

লেং হালুয়া! কোথাও কিছু নেই, মালটা এসে পড়ল তার উপরই! লোকটা হাঁকপাক করতে করতে তার ঘাড়ে চড়ার উপক্রম করতে লেগেছে!

--'ওয়ে, পাকুড় গাছ পেয়েছিস যে ডালে চড়বি?' সে হাঁকার দিয়ে বলে--'একদম স্ট্যাচু
হয়ে দাঁড়ান্তো দেব একদম কানের গোড়ায়...!'

লোকটা একদম স্থির হয়ে দাঁড়ায়। বিস্মিত গলায় বলে--'কানের গোড়ায়! এ তো সেই
ভলিউম...সেই টোন...সিভারেলা!'

--'সিভারেলা! বেশি ক্যাওড়ামি করলে গাঁড়ে স্যান্ডল তুকবে তোর!'

--'আমায় চিনতে পারছো না!' লোকটা এমন করে বলল যেন কতদিনের চেনা! তার
কষ্টস্বরে আনন্দ মিশল--'আরে, আমি...ঐ যে! সেদিন রেললাইনের উপরে দেখা
হয়েছিল...মনে নেই...!'

আরে! মনে থাকবে না মানে! খুব মনে আছে! এ তো সেই মালটা! যার উইভচিটার লাটুর
ঘরের শোভাবৰ্ধন করছে! অবাক হয়ে বলল সে--

--'আবে, তুই! তুই এখনও ফোত হোস্নি!'

--'মানে?' লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে--'আমি মরে গেলে তুমি খুশি হতে?
যাঃ শালা! এ তো বিনিপয়সায় সেন্টু খেতে লেগেছে। লাটুর রেগে যাওয়া উচিং ছিল। কিন্তু
আক্ষর্য! একটুও রাগ হল না তার! বরং অঙ্গুত একটা মায়া হতে লাগল! বেচারা--দুঃখী
লোক। এভাবে ওকে কথাটা বলা উচিং হয়নি।'

--'মাইন্ড খাস্ না!' সে গলার স্বর যথাসম্ভব নরম করে বলে--'আসলে এভাবে কথা বলে
বলে, এটাই আদত হয়েছে আমার জবানটাই এরকম ছুতিয়া। ধুয়ে ফ্যাল্ভ।'

অঙ্ককারের মধ্যেই মনে হল, লোকটা হাসছে। স্নিফ্ফ গলায় বলল--'ছুতিয়া জবান হবে কেন?
তোমার মুখে এই ভাষাটা শুনতে আমার খুব মিষ্টি লাগে!'

বোবো! এ পার্লিক কোথা থেকে এসেছে! লাটুর মুখের খিস্তিখেউড় তার ভালো লাগে!

জীবনে এ ধরণের কমপ্লিমেন্ট এই প্রথম শুনছে সে!

--'মামা, একটা কথা বল্।' লাটু হেসে বলল--'তুই কোথাকার ডেলিভারি বে! এই
ছুনিয়ার? না চাঁদের মডেল?'

--'হোম ডেলিভারি'। ব্যাটা ফোঁৎ করে নিঃশ্বাস ফেলল--'মায়ের পেইন যখন ওঠে তখন
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কেউ ছিল না। তাই আমার ডেলিভারি হোমেই হয়েছে।'

--'কেন? তোর বাপ ছিল না?'

--'বা-প!', সে বিষণ্ণ হসল--'তাকে তো জীবনে চোখেই দেখিনি! আমি পয়দা হওয়ার
আগেই লোকটা কেটে পড়ল।'

--'কেটে পড়ল? ইয়ানি ভেগে গেল?'

--'ভেগেই গেল। তবে উপরওয়ালার কাছে। লোকটা হাসতে হাসতেই বলল--'আমি যে
পয়দাই কেন হয়েছিলাম বুঝি না! বাপটা জম্মের আগেই চলে গেল। মা টা উনিশ বছৱ
বয়েসে। অভাবের সংসারে খাওয়া জুটত না! মা পরের বাড়িতে বাসন মেজে যা আনত তাতে
ছুটো পেট চলে না। তার উপর আমার পড়াশোনার খরচা ছিল। মা রোজ আমাকে খাইয়ে
নিজে খাওয়ার অ্যাস্টিং করত! আমি এমন পাগলাচোদা ছিলাম, যে কোনওদিনও বুঝিনি,
ওটা খাওয়া নয়, খাওয়ার প্রাণপণ অভিনয় হচ্ছে।'

একটা অব্যক্ত বেদনা তার গলা বেয়ে চুঁইয়ে পড়ছে নাক টানার জোরালো শব্দ শুনে লাটু বুঝাল, লোকটা কাঁদছে!

--'তারপর একদিন আমার চোখের সামনেই লিভার পচে মাও চলে গেল! আমি ভ্যানার মত দেখলাম মা মরছে! রোজ একটু একটু করে রক্তবমি করে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। সে নিজের মাথার চুল ধরে টানল--'আমি শালা বোকাচোদার মত ডাঙারের পা ধরলাম, কম্পাউন্ডারের পা ধরলাম, হাসপাতালের লাখ খেলাম--দোরে দোরে গেলাম টাকা চাইতে। ইনফ্যাঞ্চি, চাওয়া নয়, ধার নয়, ভিক্ষা চাইলাম....! সবাই মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দিল... তখন ভাবলাম ডাকাত হয়ে যাব, কালো ধান্দা করবো, চুরি করবো, কেপমারি করবো--তবু মা'র চিকিৎসা করাবো। কিন্তু সাহসে কুলোল না। আই অ্যাম আ কাওয়ার্ড! কাপুরুষের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখলাম, মা'টা বিনা চিকিৎসায় মুখে রক্ত তুলে তুলে মরে গেল। কিছু করতে পারিনি...কিছু না....!', বলতে বলতেই হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছে সে-- শেষ সময়ে মুখে আগুন দিতে ঘেন্না হয়েছিল আমার... নিজের উপর ঘেন্না... ভীষণ ঘেন্না...!'

লাটুর কাঁধে মাথা রেখে কানায় ভেঙে পড়েছে লোকটা। অন্যসময় হলে তার কপালে দুঃখ ছিল। একটা মোক্ষম কানচাপাটি তো কপালে নাচছিলই। কিন্তু অবাক কাণ্ড! লাটুর চোখ বেয়ে গরম নোনতা কিছু একটা পড়ছে! লাটুও কাঁদছে! এ কি জাতীয় অনুভূতি! দুঃখ ঐ লোকটার! কাঁদছে ঐ লোকটা! লাটুর কেউ না ও। কোনও ওয়াস্তা নেই! তবে তারও চোখে জল আসে কেন! তার নিজের মা ও তো মরতে চলেছে! কই, একফোঁটা চোখের জলও তো ফেলেনি লাটু! তার ধারণা হয়েছিল জীবনের কোনও দুঃখই আর তাকে কাঁদাতে পারে না! তবে আজ 'দিল'টা এরকম মুচড়ে মুচড়ে উঠছে কেন? ঐ লোকটার অসহায় কান্না কেন বহুবছরের পাথুরে হৃদয়টাকে গলিয়ে দিচ্ছে! 'দিল' এর এ কিরকম 'দিলাগি'! যখন একজনের কষ্টে আরেকজনেরও চোখে জল আসে, তখন তাকে কি বলে....!

--'আমি একটা ইডিয়ট, একটা মোস্ট বোকাচোদা!', লাটুর কাঁধে মুখ ঘষতে ঘষতে নিজেই নিজেকে খিস্তাচ্ছে সে--'এক নম্বরের লুজার! যাকে ভালো লাগে, সে আমাকে ছেড়ে চলে যায়। যাকে আঁকড়ে ধরি, সে--ই পিছলে যায়! কেরিয়ার ডুম হল। ঠিকমত একটা চাকরিও জেটাতে পারলাম না! লাইফ আমাকে শুধু মেরে যায়। আমি খুঁটিতে বাঁধা গরুর মত মার খেয়ে যাই....। ...আজ কি হয়েছে শুনবে....?'

লাটুর কাঁধ থেকে মুখ তুলে অসীম হতাশার জ্বালায় বলল সে--'অতিকষ্টে একটা টিউশনি জুটিয়েছিলাম। বাড়তি ক'টা পয়সা আসত। ক্লাস টু'র ছেলেকে পড়াতে হবে। আজই প্রথম দিন ছিল। সে এমন বিচ্ছু ছেলে যে আমি বাড়িতে চুক্তেই কুকুর লেলিয়ে দিল! একটা পেন্নায় গ্রে হাউভ! এমন দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এল যেন পারলে এখনই চিবিয়ে খায়!... তার ভয়ে কোনমতে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এসেছি....!'

--'ও!', লাটু বুঝাল তার ওভাবে ঘাড়ে এসে পড়ার কারণটা কি! এই ভীতু ভীতু, অসহায় লোকটা পিছন ফিরেও দেখেনি কুকুরটা তাড়া করছে কি না! প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া হয়ে দৌড়েছে।

--'কুত্তাটা এখন তোর পিছনে নেই রে'। লাটু বলল--'থাকলে ওর বত্রিশ পাটি খুলে তোর হাতে দিয়ে দিতাম। তুই এমন সব বিষ-বকাটে ছানাপোনাদের পড়াতে যাস্ কেন? অন্য কোনও ধান্দা নেই?'

লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল--'খুব হয়েছে আর যাবো না। নেহাং বেশি টাকা দিচ্ছিল বলে...! ঐ টাকাটা পেলে আমার খুব সুবিধা হত। কিন্তু...'।

লাটু কয়েকমুহূর্ত ভাবে। নবগ্রামে এরকম বিষ-মাল বাচ্চা একটাই আছে। শান্তনু হালদারের সাত বছরের ছেলেটা। ঐ মালটাই ক্লাস টু তে পড়ে। তার সাথে গ্রে হাউডের ব্যাপারটাও মিলে যাচ্ছে! ওর জ্বালায় প্রাইভেট টিউটরগুলো ছবিনেই ভেগে যায়। ঐ মালটাই হবে।

নবগ্রামের চাঙ্গা চাঙ্গা লাটুর জানা আছে।

--'এরপর কবে তুই ফের মালটার বাড়ি ভাঁটাতে যাবি?'

--'আর যাই আমি!' লোকটা বলল--'আমার মরার শখ নেই!'

--'এই যে বললি টাকাটা পেলে তোর মস্তি হবে?'

--'আর মস্তি! খুব হয়েছে! প্রাণে বেঁচে থাকি। মস্তি আমার মাথায় থাক। আর আমি ও রাস্তা মাড়াচ্ছি না।'

--'আ-ল-বা-ত মাড়াবি!', লাটু জোরালো গলায় বলে--'কদিন ভেগে বেড়াবি বে? যত ভাগবি তত পার্সিকগুলো তোর ওয়াট লাগাবে। এরপর কবে সেটিং আছে?'

--'পরশু',। লোকটা ভয়ে ভয়ে বলে--'কিন্তু ফের যদি কুকুর লেলিয়ে দেয়! ও তো কুকুর নয়! পেলায় বাঘ!'

--'দেবে না'। তার কষ্টস্বরে আত্মবিশ্বাস--'কুত্তাটা আর ও বাড়িতে থাকবে না। টেনশন লেনে কা নেহি বীৰু, দেনে কা হ্যায়। ভেজায় তুকল'?

লোকটার ভয় তখনও যায়নি। তবু আমতা আমতা করে বলল--'আচ্ছা, যখন তুমি বলছো... তখন যাবো!'

লাটু হাসল। নরম সুরে বলল--'তোর আস্তানায় ফিরবি না? না এখানেই দাঁড়িয়ে আমার সাথে ভ্যান্টারা করবি? যা ফোট্টি!'

--'না, বাড়ি যেতে হবো। আজ আসি...'। লোকটা তাড়াহড়ো করে পা বাড়িয়েই কাঁচে উঠল--'উঃ! মাগো!'

--'মা তো খচা হয়ে গেছে'। সে বলে--'এত রাতে তাকে ডাকছিস্ কেন? কি মাজৱা?'

--'হাঁটতে পারছি না!', যন্ত্রণাকাতর গলায় ব্যাটা বলল--'কুকুরের তাড়া খেয়ে দৌড়নোর সময়ে বার দুয়েক পড়ে গিয়েছিলাম। এখন পা ফেলতেই পারছি না! হাড় ভাঙল কি না কেজানে!'

--'না, ফ্র্যাকচার কেস না'। লাটু এমনভাবে মাথা নাড়াচ্ছে যেন সে ডাঙ্গার। আসলে লোকের হাত-পা ফ্র্যাকচার করে করে সে ফ্র্যাকচারের ধাত বুঝে গেছে। হাড় ভাঙলে এত দূর মাকড়াটা দৌড়ে আসতে পারত না।

--'তোর পায়ে মোচ লেগেছে'। সে একটু চিন্তাপ্রিত স্বরে বলে--'হাঁটতে না পারলে ঘরে ফিরবি কি করে?'

লোকটা হাঁটতে গিয়ে ফের কাতরে উঠল। কোনমতে বলল—‘ফিরবো না। আজ রাতটা এখানেই কাটিয়ে দেব। তুমি যাও। দেরি কোর না। তোমার বাড়ির লোক চিন্তা করবে’। এবার হেবি হাসি পেয়ে গেল লাটুর। ব্যাটা তাকে ভদ্ররঘরের টুনটুনি মেয়ে ভাবছে। লাটু মন্তান তাড়াতাড়ি ফিরলেই বরং লোকে চিন্তায় পড়ে। দেরি হওয়াটা তো তার ঝটিন!

--‘তুই আমার জুতো জোড়া ধরতে পারবি?’

কথাটা শুনে ঘাবড়ে গেল লোকটা। ফুলটু হাকলাতে হাকলাতে বলল—

‘জুতো...কেন?...আমি তো তোমার গায়ে হাত দিই নি। তোমায় অন্যায় কিছু বলিনি...’।

--‘ধুর বাল। জুতো ধরতে পারবি কি না বল?’। বলতে বলতেই পায়ের হিলজুতোছটো খুলে ফেলেছে সে। জুতো জোড়া ব্যাটার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল—‘নে ধর’।

বেচারা কি আর করে! জুতোছটো শক্ত করে ধরল।

--‘চল, ডাব্ল্যাক করি। কিছু বোঝার আগেই লোকটাকে পঁঁজাকোলা করে অতি সহজেই তুলে নিয়েছে লাটু। হবেই বা না কেন? সে কি যেমন তেমন মেয়ে? একটু আগেই একজন রেসলারকে পট্টকে দিয়ে এসেছে! রীতিমত ঢাই কিলোর হাত তার! আর এই লোকটা তো একেবারে পালকের মত হাঙ্কা! দিব্যি একটা চাদর গায়ে দেওয়ার মতন করে অনায়াসেই তুলে নিয়েছে। তাকে ঘাড়ে নিয়েই লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটা লাগাল। যেন আন্ত একটা পুরুষমানুষ নয়, শ্রেফ পোষা একটা বিড়াল বা খরগোশ কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে! আর লোকটাও অদ্ভুত! দিব্যি নিশ্চিন্তে গলা জড়িয়ে ধরল লাটুর! অদ্ভুত নিরাপত্তায় তার বুকে মাথা গুঁজে দিয়েছে। ফিল্মে নায়ক নায়িকার সিলে এমন হয়ে থাকে। এখানেও হচ্ছে। তবে উলটোটা!

--‘জানো, তোমায় একদম আমার মায়ের মতন লাগে!’, লোকটা বিড়বিড় করে বলতে থাকে—‘ছেটবেলায় ভয় পেলেই মায়ের কোলে, বুকে মুখ গুঁজে দিতাম। ভীষণ নিশ্চিন্ত লাগত। মা নেই, কিন্তু আমি এখনও ভয় পাই। ভয় পাওয়ার অভ্যেসটা এখনও যায়নি জানো...। কিন্তু তুমি আমার কাছাকাছি থাকলেই মনে হয়, কোথাও ভয়ের কিছু নেই। সব ঠিক আছে...কোথাও কোনও সমস্যা নেই! মা কে আমি খুব ভালোবাসতাম...’। সে একটু থামল। মনে মনে কিছু যেন বলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিছুক্ষণ থেমে থেকেই ফের বলল—‘আমি বড় দুর্বল সিন্ডারেলা, লড়ার ক্ষমতা আমার নেই। সবসময় আশ্রয় খুঁজে বেড়াই... একজন পুরুষের ক্ষমতা, সাহস, শক্তি—যা থাকা উচিং, তার একটাও আমার মধ্যে নেই...। কিন্তু...তবু...আমি তোমাকে...আমি তোমাকে...। বিদ্যুতের মত সে অমোघ শব্দটা উচ্চারণ করল—‘আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি সিন্ডারেলা। একরাতের দেখাতেই ভালোবেসে ফেলেছি। জানিনা, তুমি আমার সম্পর্কে কি ভাবো। হয়তো ফালতু, বেকার একটা লুজার ভাবো। কিন্তু তুমি যে-ই হও, তোমার নাম যা-ই হোক, যেমনই হও... আমি তোমায় তেমনভাবেই ভালোবেসেছি...সত্যি সত্যিই ভালোবেসেছি...প্লিজ...আমায় থাক্কড় মেরো না... আমি তোমায় ভালোবাসি।’

লাটু মন্তান...দোর্দঙ্গপ্রতাপ ভাই স্তুতি হয়ে থম্কে দাঁড়াল। কি শুনল সে? কি বলল লোকটা? হঠাৎ ফের কান্না আসছে কেন?

লোকটা নিজেকে ভীতু বলে। কিন্তু আজ সে একটা দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলেছে!

নবগ্রামের নামকরা গুণ্ডা লাটু মন্তানকে প্রপোজ করে ফেলেছে!

১৪.

--'আচা পচা, তোমার বড় ভাই যে তোমায় জুতোপেটা করেন, তোমার লাগে না?'

--'আরে না... না ভাইদাদা'। পচা প্রায় কান এঁটো করা হাসি হাসে--'ও তো মার নয়!

আদর!'

--'আদর!' বাবন চোখ কপালে তুলে ফেলেছে--'জুতোপেটাটা আদর!'

--'হ্যাঁ ভাইদাদা'। পচা হাসছে--'আপনি জুতোটাই দেখেছেন। কিন্তু জুতোর হিলটা দেখেননি।

ঐ হিল দিয়ে মারলে, মা কসম্ মাথা ফেটে ফাটা ফুটি হয়ে যেত! কিন্তু ভাই কখনো জুতোর হিল দিয়ে মারে না। সবসময় নরম জায়গাটা দিয়েই মারে। ভাইকে দেখতে অমন শক্তপোক্ত হলে কি হবে? আসলে মানুষটা তালশাঁসের মত নরম!'

তা যে নরম সেকথা বাবন এতদিনে বুঝেছে। বড় ভাই, তথা শিউলির সাথে দেস্তি হয়ে গেছে তার। দুজনের মধ্যেই অনেক কমন ফ্যান্টের আছে। প্রথম মোলাকাতের পর যত দিন গড়িয়েছে, ততই দুজনে দুজনের ভিতরে মিল খুঁজে পেয়ে অবাক হয়ে গেছে! দুজনেই জোরে জোরে হাসতে ভালোবাসে। দুজনেই সমান খাদ্যরসিক! সমান গাঁতিয়ে খেতে পারে! একবার পান্না দিয়ে ফুচকা খাওয়ার কম্পিটিশন লাগিয়েছিল। পচা-কাবুল-সোনারা

ফুচকাওয়ালাটাকেই ধরে সোজা নিয়ে এসেছিল বাবনের বাড়িতে। তারপর চলল প্রতিযোগিতা। কে ক'টা ফুচকা খেতে পারে তারই কম্পিটিশন! মজার কথা, প্রতিযোগিতায় বাবন বা শিউলি-কেউ হারেনি! হেরে গিয়েছিল ফুচকাওয়ালাটা! তার সমস্ত ফুচকা সেদিন শেষ!

দুজনেই সমান আমুদে! শিউলি লং ড্রাইভে যেতে ভালোবাসে। বাবনও তাই। শিউলি শপিং করতে ভালোবাসে। আর বাবন ব্যাগ-বোঝা টানতে। দুজনেই মাতাল হয়ে বাওয়াল করতে ভালোবাসে। দুজনেই রোম্যান্টিক ফিল্ম দেখে, আর সেন্টু খেয়ে ফৌচফৌচায়!

মোটের উপর, দুজনের স্বভাবই একরকম। এখন তো শিউলির অনুরোধে সে লাটুর জন্য ছেলেও খুঁজতে শুরু করেছে। লাটু মন্তানের জন্য তো আর যেমন তেমন ছেলে খুঁজলে চলবে না। সিংহের মত পুরুষমানুষ চাই। লাটুকে বিয়ে করার ধৰক তার মধ্যে থাকতে হবে। তেমন ছেলে পাওয়া আজকাল মুশকিল। তবু এক পিস পেয়েছিল বাবন। ছেলেটার চেহারাটা ভালো। বেশ কালোকোলো পালোয়ানের মত। কাজকর্ম তেমন কিছু করে না। বেকারই বলা যায়। তবে লাটুর বরের কিছু না করলেও চলবে! শুধু একটা জোরালো পুরুষমানুষ হওয়াই তার ক্রাইটেরিয়া!

কিন্তু সেই ক্রাইটেরিয়াও যে কম টেরিয়া নয়, তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে বাবন। লাটু মন্তান তার মায়ের মত অত ফ্রেঙ্গলি লোক নয়। তার সামনে বেশি পালোয়ানগিরির ফল কি হয়েছে তা বলাইবাহ্ল্য! মেয়ে দেখতে গিয়ে সে ছেলে সোজা নাসিংহোমে পৌঁছে গেছে! সারা গায়ে অগুনতি ফ্র্যাকচার! ডাক্তার পেশেন্টকে চেক করে অবাক! স্নিগ্ধি গলায় বললেন--'কলার বোন, ফিমার বোন ভেঙে গেছে! তাও খুব খারাপ ভাবে! এমন অবস্থা হল কি করে? ট্রাকে ধাক্কা মেরেছে নাকি!'

কোন্ ট্রাকে ধাক্কা মেরেছে সে তো খুব ভালোভাবেই জানা আছে! যাই হোকু, শিউলি
ডাঙ্গারবাবুকে বলেছে—'শোন্ মামু, যা যা করার কৰ্। ছুরি কাঁচি চালাবি তো চালা, কিন্তু
মাকড়াটাকে খাড়া কৰ্। খচার টেনশন নিস্ না। কিন্তু মালটা যদি টেঁসে যায়, তবে তুই
খচা হবি'।

বাবন কোনমতে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ডাঙ্গারবাবু ভয়েই সাদা হয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে
নার্সিংহোমের করিডোরের একধারে টেনে নিয়ে বোঝাল—'কিছু মনে করবেন না। উনি ছেলের
মা। খুব টেনশনে আছেন কি না!'

ডাঙ্গারবাবু ধরা গলায় বললেন—'এই টেনশনের নমুনা! উনি তো উলটে আমাকেই টেনশনে
ফেললেন! দাদা, অন্যের প্রাণের চেয়েও নিজের প্রাণটা বেশি দামী। বোঝেন তো?'
সে ডাঙ্গারকে আশ্চর্ষ করে। যদিও তিনি বিশেষ নিশ্চিন্ত হলেন বলে মনে হল না! বিড়বিড়
করে বললেন—'এ তো মা নয়! শাড়ি পরা মোগ্যাম্বা'।

ওদিকে পাত্র বেচারার অবস্থা সঙ্গীন। মেয়ে দেখতে গিয়ে ঘুঘু আর ফাঁদ দুই-ই দেখে
ফেলেছে। সারা গায়ে প্লাস্টার জড়িয়ে সে একেবারে নেবুচাউনেজারের মমির মত শুয়েছিল।
বাবনকে চুক্তে দেখে ট্রাকের তলায় পিষে যাওয়া নেবুর মতই কুঁইকুঁই করে বলল—'বাবনদা,
মালা পরাতে বলেছিলে, কিন্তু সেটা যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে পরাতে হবে, তা তো
বলনি!'।

--'চুপ কৰ্ শালা!', বাবন তাকে চমকে দেয়—'একটা মেয়েকে সামলাতে পারিস্ না!
আবার গাল ফুলিয়ে ডায়লগ দিচ্ছিস! কে বলেছিল তোকে লাটুর সামনে মাস্তানি করতে। ও
মেয়ে তোর মত দশটা পিসকে কুত্তা বানিয়ে ঘোরে, আর তুই কিনা গেছিস তার সামনে
রেসলিংগুরু সাজতে!'।

--'কি করে বুবুবো যে ও মেয়ে মেয়ে নয়, আভারটেকারের মহিলা সংস্করণ!', ছেলেটা
বলতে বলতেই কুঁইকুঁই করে ওঠে—'শালা, এমন আভারকাট দিল, যে থাভার খেয়ে ঠাভা
হয়ে গেছি! একদম থাম্স্ আপ কেস! টেস্ট দ্য থাভার অ্যান্ড গেট ঠাভা!'।

--'যাক গে!', সে আস্তে আস্তে বলে—'যতটুকু গচ্ছা গেছিস্ তার ভরপাই হয়ে যাবে! কিন্তু
মুখ যদি খুলেছিস, তবে চারপাই-ই ভরসা! মাথায় রাখিস্'।

--'পাগল!', পেশেন্ট উঁহ আহা করতে করতে বলে—'একটা মেয়ে আমায় এমন গুচ্ছিয়ে
সাইজ করেছে একথা বলতে যাই! পুলিশকে বললেও খ্যাঁক খ্যাঁক করে দলবল নিয়ে
হাসবে! লোকে প্যাঁক দেবে! নিজের প্রেস্টিজে নিজে গ্যামাস্কিন হারগিস দেবো না আমি!
আমার ট্রাকই ভালো'।

ওদিককার সেটিং করে শিউলির কাছে ফিরল বাবন। শিউলি চিন্তিত মুখে করিডোরে চকু
মারছিল। তাকে দেখে জিজাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

--'কি নিউজ বে? মালটা টিঁকে যাবে তো?'।

সে একটা 'হাইক্লাস' হাসি দিয়ে বলল—'হ্যাঁ। এ যাত্রা টিঁকে যাবে। তুমি টেনশন নিও না,'।
বলতে ভুলে গিয়েছি, এর মধ্যেই দুজনের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছে। শিউলি যদিও
'তুই' তেই স্টিক করে আছে, কিন্তু বাবন এখন তাকে 'শিউলি', তুমি' বলেই ডাকে।

--'বাঁচালি'। শিউলি একটা স্বন্দির নিঃশ্বাস ফেলল--'চ, ছুটো গিলে আসি। সারা সকাল লেট করে করে পেটে বাঘ ডাকছে মাইরি'।
যথারীতি পচার সংশোধন--লেট না ভাই, ওয়েট!'
শিউলির মুখ বিরক্তিতে বেগুনভাজার মত হয়ে যায়--'তুই যে বললি ওয়েট মানে ওজন'?
--'হ্যাঁ ভাই, ওয়েট মানে ওজনও হয়, আবার অপেক্ষাও হয়!'
--'একি মাজরা রে বাপ! জৰানও শালা পার্টি বদলাচ্ছে! এক জিনিসের এত নাম হয় কি করে!'
--'শুধু তাই নয় ভাই, ওয়েট মানে ভেজাও হয়!'
--'ভেজা মানে!', মাথায় হাত রেখে বলল শিউলি--'মুভু?'
--'না...না...ভেজা মানে গিলা...!'
--'ধুতোরিকা!', শিউলি বিরক্ত হয়ে বলে--'ওয়েটের ভাইপো হয়েছে! আমার পেট খিদেয় শ্বা খচমচাচ্ছে, আর তুই শ্বা ফান্ডা নিয়ে নখরা মারতে বসেছিস!'
--'ওকে ভাই'।
অগত্যা পেটপুজো করতে যেতেই হল, তথা গিলতে যেতে হল। এয়ারকন্ডিশন্ড রেঙ্গেরাঁয় বসে মুর্গীর ঠ্যাঙে জৰুর একখানা কামড় বসিয়ে বলল শিউলি--'বুঝলি বাবন, এভাবে হবে না। উংলি টেরি করতে হবে'।
--'উংলি টেরি!', বাবন বিষম খায়--'মানে?'
--'দ্যাখ্', সে খেতে খেতে বলল--'যে সব স্যাম্পেল এখনও পেশ করেছিস, সেগুলো তেমন টেকসই না!'
বোঝো, ছেলে নয়, যেন ব্র্যান্ডেড হাওয়াই চশ্চল!
--'এ মাকড়াগুলোর ওয়্যারান্টি নেই বুঝলি'। তার বক্তব্য--'লাটু একটু টান মারতেই দেশলাই কাঠির মত ভেঙে যাচ্ছে। ফুলের ঘায়ে মুছো যাওয়া পাইকি'।
লাটু ফুল! তাহলে তো বাবন পাখির পালক! অথবা খরগোশের লোম!
--'তাহলে উপায়?', সে কনফিউজ্ড--'তুমি বুঝছো না শিউলি, এরা সব বীতিমত শক্তপোক লোক। কিন্তু লাটু এদের থেকেও জাঁদৱেল! এখন দেখছি আন্দারটেকার-ট্রিপ্ল এক্স এর মতন চ্যাম্পিয়ন, বা জাপানি সুমো আমদানি করতে হবে'।
শিউলির মুখে একটা তৃণ্টির হাসি ভেসে ওঠে--'তা বটে, আমার লাটু স্লাইস কড়ক ছাপ!, পিছনের টেবিল থেকে হাঁকার এল--'স্লাইট!'
--'হ্যাঁ...হ্যাঁ...', সে এবার মেজাজ হারায় না, বরং নির্লিপ্ত মুখ করে বলে--'হেভি বাঁঁঝালো মাল বুঝলি। একেবারে আগমার্ক সর্বের তেলের মত!'
এইবার ঠিক বলেছে! সর্বের তেলই বটে! ঝাঁঝোর চোটে নাকের জলে, চোখের জলে করে ছাঢ়ছে সবাইকে!
--'তাহলে ঝাঁঝালো চিজের জন্য আরও ঝাঁঝালো চিজ লাগবো। তাইতো?'
--'ন্যাঃ', একটু অবজ্ঞার সাথে বলল শিউলি--'আমাদের গলতিটা ওখানেই হচ্ছে।
পরেশানিটা ওখানেই। আমরা ভাবছি আরও কড়ক মাল লাগবো। কিন্তু আসলে লাগবে ঠিক

উল্টোটা। ঝাঁঝালো গরমদিমাগ মেয়ের জন্য পুরো ঠান্ডা ছেলে চাই। একদম অহিংস ছাগল
ছাগল মাকড়া। সাত বুলেটেও রা কাড়বে না! টোট্যাল অপোনেন্ট!

--'অপোজিট'! ডিকশনারি থেকে শব্দ উঠে এল।

--'আবে...'। সে রেস্টোর্যাঞ্টের মধ্যেই প্রায় ঘূর্ষি বাগিয়ে তেড়ে যায় পচার দিকে—
'শ্বা...তোর জবান তো নয়, এক নম্বরের পনৌতি। একেবারে নাক মে দম করে রেখেছে।
নিজের মশা আর ফান্ডা নিজে মার! আমার দিমাগ চাটছিস কেন বে? দেখছিস এখানে
মগজমারির চোটে পিয়ারলেস কেস হচ্ছে...'।

পচা তিন লাফ মেরে পালাতে পালাতেই বলে গেল—'পিয়ারলেস নয় ভাই,
প্যারালাইসিস...'।

এমন চ্যালাদের নিয়ে কি করা যায়! কি করা উচিত! ব্যাটারা শত খিস্তিখেউড়েও শুধরোয়
না! জুতোপেটা খেয়েও নিজের ডিউটি ঠিক করে যায়! শিউলি তার পালানোর ভঙ্গিটা দেখে
ফিচ করে হেসে ফেলে। ফের নিজের চেয়ারে এসে বসতে বসতে বলে—'মালটা বহুত হারামি
বুঝলি? একেবারে কুত্তার ছুম! যতই সিধা করার চেষ্টা করু, টেরি কি টেরিই থাকবে'।

পচা সম্পর্কে কৌতুহলবোধ করছিল বাবন। এত মার খেয়েও মালটা ভুলভাল ইংরেজি
শুধরোনোর প্রচেষ্টা ছাড়ে না কেন? এ কি নিরক্ষরতা দূরীকরণের এক ধরণের স্টাইল!

--'আচ্ছা, তুমি যে ওকে এত খিস্তি দাও, এত জুতোপেটা করো—ও কিছু মনে করে না?'—
সে বলল—'ইনফ্যাণ্ট, ওর জায়গায় আমি থাকলে তো ধুত্তোর বলে গ্যাংই ছেড়ে দিতাম'।

--'হ্যাঁ, তুই ছাড়তি'। শিউলি খুব মিষ্টি করে হাসে—'কারণ তুই বেজন্মা নোস্। কিন্তু
পচাটা তাই'।

বাবনের ভুরুতে ভাঁজ পড়েছে। শিউলির মুখ্টা বিষম্ব হয়ে উঠেছে—'মালটা কর্পোরেশনের
ডাস্টবিনে শুয়ে কাঁদছিল। বড়জোর একদিনের পিল্লা! তখন লাটু সবে পয়দা হয়েছে। লাটুর
বাপ সকালে তোলা তুলতে গেল! ফিরল হারামীটাকে বুকে নিয়ে! বাপ-মা কে কেউ জানে
না! সকাল থেকে মুখে একটু জলও পড়েনি। চিলিয়ে চিলিয়ে গলা ভেঙে গেছে! ঐটুকু
পিল্লা, ময়লার মধ্যে শুয়েছিল, বাঁচে কি না ঠিক নেই। লাটুর বাপ ওকে তুলে তো আনল,
কিন্তু কি করবে তা নিয়ে ফের মগজমারি! লাস্ট আমিই ভাবলাম, উপরওয়ালা যদি ঐ
নান্না জানকে আমার কাছে পাঠিয়ে থাকে, তা'লে ঢ্যামনা কিছু ভেবেই পাঠিয়েছে। তখন
আমার বুকে দুধ ছিল বুঝলি? লাটু একা টেনে খতম করতে পারত না...তাই...!' বলতে
বলতেই সন্মেহ হাসল সে—'লাটু আর পচা এক পেটে পয়দা হয়নি, কিন্তু এক বুকের দুধ
খেয়েছে। একসাথে বড় হয়েছে যখন লাটুর বাপটা খতম হল, তখন পচা ঘরে ছিল না।
থাকলে জান দিয়ে দিত, কিন্তু লাটুর বাপটাকে অত সহজে মরতে দিত না! যখন ফিরল
তখন সব খতম। লাটুর বাপের মরা মুখে ও—ই আগুন দিয়েছিল। লাটু যখন জেলে গেল,
তখন পচাই ঐটুকু বয়েসে সব দেখতাল করেছে। 'ভাই' বলে ডাকে ঠিকই, কিন্তু ও আমার
ছেলেরও বাড়া! ওকে জুতোপেটা করার ফুলটু হক্ আমার আছে। কি বুঝলি?'
বুঝল বাবন। তবে একসাথে অনেক কিছুই সে বুঝল না! যেমন বুঝল না নিষ্ঠুরতা কাকে
বলে? একটা লোক গুভাগিরি করছে, তোলা তুলছে, দরকার পড়লে লাশ ফেলছে—এটা
নিঃসন্দেহে নিষ্ঠুরতা। কিন্তু একটা একদিনের বাচ্চাকে কর্পোরেশনের ডাস্টবিনে ফেলে

যাওয়াটাও কি নিষ্ঠুরতা নয়? একটা একদিন বয়েসের শিশু, যার আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই, যে নিজের ইচ্ছেয় পৃথিবীতে আসেনি—তাকে কেউ নিজেদের ভোগের ফসল হিসাবে এনেছে, সে-ই শিশুটাকে মরার জন্য ফেলে যাওয়া কি ক্রাইমের পর্যায়ে পড়ে না! আর সেই মানুষটিই বা কেমন যে শিশুটির জাতধর্ম বিচার করতে বসল না, সে অবৈধ বলে নাক সিঁটকালো না, তার রক্তে কতটা নোংরামির বীজ আছে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করল না, বিনা প্রতিবাদে তাকে বুকে তুলে নিল! নিজের সন্তানের সাথে বুকের অন্ততধারা তাকেও ভাগ করে দিল নির্বিকারে! সেই রূমণীকে ঠিক কি বলা যায়!

তার হঠাতে মনে পড়ে গেল অনিন্দিতার কথা। সন্তানহীনতার হতাশায় যখন ভুগছিল সে, তখন বাচ্চা অ্যাডপ্ট করার প্রস্তাব দিয়েছিল বাবন। অনিন্দিতা কিছুতেই রাজি হয়নি! বারবার বলেছিল—'না... না....' অ্যাডপ্ট করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই! কোন্ পাপের রক্ত কে জানে! বড় হয়ে গুভা বদমাশ হবে! তাছাড়া নিজের পেটের সন্তানের ব্যাপারটাই আলাদা! সত্যিই আলাদা! দুজন কত আলাদা! অনিন্দিতা ভদ্রবংশের আধুনিকমনক্ষা শিক্ষিতা মেয়ে ছিল। আর লাটুর মায়ের শিক্ষাদীক্ষা নেই! প্রথম জীবনে ঘৌনকর্মী ছিল, তারপর এক গুভার রাক্ষিতা।

বাবন পূর্ণদৃষ্টিতে শিউলির দিকে তাকায়। তার কালো কষ্টপাথরের মত মুখে কি যেন এক অলৌকিক আলো খেলা করে বেড়াচ্ছে! এই প্রথম মনে হল, মহিলা সুন্দরী। অল্পবয়েসে নিশ্চয়ই আরো সুন্দরী ছিল, কিন্তু এমন পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য বোধহয় এই বয়েসেই আসে! তার বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। অনিন্দিতা, তুমি গর্ভে সন্তান ধরতে পারো। কিন্তু মা হতে পারবে না! 'মা' শব্দের অর্থ কি, তা আজ লাটুর মা বুঝিয়ে দিল। তুমি পারবে না, পারো নি—লাটুর মা পেরেছে!

১৫.

--'আমরা সবাই প্রয়াত গগনবিহারীর আত্মার শান্তি কামনা করি'। পিকুলের বাবার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। একহাতে চোখ মুছে বললেন—'তার মত বৰু আমি কখনও পাইনি। সবসময়ই পাশে পাশে থাকত সে। কখনও কোনওরকম দুর্ব্যবহার করেনি। অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ছিল। প্রতিবেশী হিসাবে তার তুলনা নেই। সাথী হিসাবে, অবসর বিনোদনে তার জুড়ি ছিল না। পরিবেশপ্রেমিক, মিশুকে, ভদ্র স্বভাবের গগনবিহারীকে আমরা কখনও ভুলবো না। ভুলতে পারি না। বস্তুগণ, তার জন্য আমরা একমিনিট নীরবতা পালন করবো। ইশ্পর তার আত্মাকে শান্তি দিন...'।

বলতে বলতে বাবা একেবারে গলদশ্ত। গলা ধরে এসেছে। ভাষণ শেষ করে চুপ করে গেলেন। সন্তবত এক মিনিটের মৌনতা পালন করছেন।

পিকুলের কলেজের দুজন বস্তু দোতলায় বসে ভাষণ শুনছিল। শোকসভা হচ্ছে ছাতে। একসাথে পড়াশোনা করার ফাঁকে ফাঁকে পিকুলের বাবার বক্ত্বাও কানে আসছিল তাদের। অনেকক্ষণ ধরে শোনার পর অবশেষে না বলেই পারল না—কে মারা গেছে রে আভোগ? পিকুল বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিল। সেমিস্টারের আর দোরি নেই। এখন পড়াশোনা না করলে কেরিয়ার ডুম হবে। বিশুদ্ধ ঠিকই বলেছিল। মেয়ে অগুনতি আছে,

সেমিস্টার অগুনতি নেই! তাই দেবীর চিন্তা মাথা থেকে প্রায় 'ধূতোর' বলে বের করে দিয়ে বইয়ে কনসেন্ট্রেট করেছে। বস্তুদের প্রশ্ন শুনে চোখ না তুলেই বলল-'গগনবিহারী'।

--'গগনবিহারী কে? কাকুর বস্তু?'

পিকুল অন্যমনস্ক হয়েই উত্তর দেয়-'হ্ম'।

হুই বস্তুর চোখেও বিষম্পত্তার ছাপ পড়ে-'তাই কাকু এত কাঁদছেন! গলাটা কেমন ধরা ধরা লাগছিল। বোধহয় ভদ্রলোক কাকুর বেস্টফ্রেন্ড ছিলেন'।

--'মোটেই ভদ্রলোক নয়। তবে বেস্টফ্রেন্ড এটা ঠিক'।

--'ভদ্রলোক নয়!', পিকুলের এক বস্তু বলে-'বলিস কি! অভদ্রলোক...আই মিন ছেটলোক ছিল?'।

--'একনম্বরের হারামী শালা!', সে বিড়বিড় করে বলে-'ছেটলোক বলে ছেটলোক!'।

আরেক বস্তুও অবাক-'আভোগ, মৃত মানুষ সম্পর্কে এমন কমেন্ট করিস্ন না। এটা ভদ্রত নয়....!'

--'ধূস! ভদ্রতার ছেঁড়া গেছে! কম জ্বালিয়েছে হারামজাদা?', পিকুল এবার গরম খেয়ে গেছে-'যখনই আমি মাথায় শ্যাম্পু করে চুল শুকোতে ছাতে যেতাম তখনই মাথা নোংরা করে দিত। কাকের মত কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, জম্বের নোংরা-ঢাম্না শা-লা!'।

--'এভাবে ভদ্রলোকের আস্থাকে...!'

তার বস্তু কথাটা শেষ করার আগেই সে বিরক্ত হয়ে বলে-'ধূর ব্যাঙ! ভদ্রলোক বলছিস কাকে? গগনবিহারী কোনও মানুষের নাম নয়! ওটা বাবার পোষা পায়রা ছিল! সে ব্যাটাই বাজের ঠোকর খেয়ে পটল তুলেছে। আর বাবা অন্য সমস্ত পায়রাদের নিয়ে তারই শোকসভা করছে, নীরবতা পালন করেছে। এবার ক্লিয়ার হল?'।

--'পায়রা!'

--'হ্যাঁ', পিকুল বলল-'ওরাই বাবার বেস্ট ফ্রেন্ড। বাবা আবার একেকটার একেক নাম রেখেছে। এটার নাম ছিল গগনবিহারী। আরেকটা আছে সাদা রঙের। সেটার নাম আকাশবিহারী। একটা বাচ্চা-সেটার নাম নভোবিহারী। খয়েরি রঙেরটার নাম শূন্যবিহারী! এছাড়াও ব্যোমবিহারী, অনন্তবিহারী, দিগন্তবিহারী....'

সে গোটা নামের লিস্ট শেষ করার আগেই বস্তুরা বাধা দেয়।

--'আভোগ, একটা কথা বলবো? মাইন্ড খাবি না তো?'।

--'বকে ফ্যাল'।

--'তোরা কি মাইরি পাগলখানা খুলে বসেছিস?'।

পিকুল দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ওদের দোষ নেই। বাইরে থেকে দেখলে যে কেউ তাই ভাববে। বাড়িতে ঢোকার মুখেই হুই বুড়ো হুই আলাদা আলাদা টপিক নিয়ে গুজুর গুজুর করছে! একজন গাছ নিয়ে কথা বলছে, আরেকজন নাচ নিয়ে। মা এই ভরসন্ধ্যায় বাথরুমে দুকে সাবান মাখতে চিলিয়ে চিলিয়ে গণসঙ্গীত গাইছেন! আজ পল রবসনকে ছেড়ে জন হেনরিক কে ধরেছেন! বাবা ছাতের উপরে বসে মৃত পায়রার দুঃখে শোকসভা করছেন। পাগলের বাড়ি ছাড়া এটাকে আর কি বলা যেতে পারে?

বস্তুরা চলে গেলে পর রাতের খাওয়া শেষ করে ছাতে চলে এল পিকুল। মনের দুঃখে একটা সিপ্রেট ধরাল। তার মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। একেই সেমিস্টারের চাপ! তার উপর দেবী তার পাতা কেটে দিয়েছে! এই পরিস্থিতিতে যে পড়েনি সে কখনও জ্বালাটা বুঝবে না।

ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর! কি চাপ! এর থেকে হাতকাটা জগন্নাথ হয়ে জন্মালে ভালো হত। হাত নেই, সুতরাং সেমিস্টার দেওয়ার চাপ নেই। ক্রিকেট খেলতে কেউ বলবে না! বিড়াল শত ঝগড়া করলেও জল ঢালার উপায় থাকবে না! এই হাতই হল যত নষ্টের গোড়া! এই হাত দুটো আছে বলেই যত জ্বালা!

--'পি-কু-ল!', নীচ থেকে মায়ের চিৎকার ভেসে এল--'এতরাতে ছাতে কি করছিস?'

--'হাওয়া খাচ্ছি মা।'

--'হাওয়া খাচ্ছিস না ধোঁয়া খাচ্ছিস?'

কি কেলো! মা কি করে পাতা লাগালেন? এইবার একটা সত্যি কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল পিকুল। এতদিন ভাবত গোয়েন্দা সাহিত্যে মহিলা গোয়েন্দার সংখ্যা এত কম কেন? আজ জবাবটা পেল সে। মহিলাদের আলাদা করে গোয়েন্দা হিসাবে প্রোজেক্ট করার কিছু নেই! তারা বর্ণ ডিটেকটিভ! জন্ম থেকেই গোয়েন্দাগিরির পাঠ পড়ে এসেছে। বাবা যতই টাকা পয়সা লুকিয়ে রাখুন না কেন, মা ঠিক খুঁজে খুঁজে বের করে গোটা কয়েক পাত্তি গাপ করবেনই! পিকুল যদি বাইরে ফাস্টফুড খেয়ে আসে, তাহলেও তার মুখ দেখেই বুঝে যাবেন ভদ্রমহিলা! এমনকি বাবার নতুন সেক্রেটারি যে কোনও পুরুষ নয়, বরং একজন তরুণী মেয়ে, এবং সে যে পিঙ্ক কালারের লিপস্টিক মাখে, তা বাবার টিফিনবাজি দেখেই বুঝে গেছেন মা! মেয়েটি একদিন বাবার সাথে টিফিন শেয়ার করেছিল। স্টিলের চামচে পিঙ্ক লিপস্টিকের দাগ দেখে বাড়ি মাথায় তুলে ফেললেন তিনি। শেষমেষ বাবাকে সব কথা খুলে বলতেই হল।

হাতের সিপ্রেটায় পিছনে লুকিয়ে ফেলল পিকুল। বলা যায় না! মা যদি সোজা উপরে উঠে আসেন! তাহলেই আরেক কুরুক্ষেত্র! চেঁচিয়ে বলল--'না, মা। এই মাথাটা একটু গরম হয়ে গেছে, তাই ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাচ্ছি।'

--'আচ্ছা। নীচ থেকে উত্তর আসে--'বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকিস না। ঠাণ্ডা লাগবে। সামনে সেমিস্টার। মনে আছে তো?'

--'একটু পরেই আসছি।'

জবাব দিয়ে সিপ্রেটায় কনসেন্টেট করল পিকুল। জবর একটা সুখটান মেরে আকাশের দিকে তাকাল সে। আজ আকাশটা সাফ আছে। দু একটা তারা ফাজলামি করে চোখ টিপছে। চাঁদটাকে কেউ যেন ঠিক কেক কাটার মত একফালি করে রেখেছে! আজ আকাশটা কি রোম্যান্টিক! অথচ পিকুলের মনে সুখ নেই! দেবী এমন করে তার ইঞ্জিনের ফালুদা বানিয়ে দেবে কে জানত! পিকুলকে যদি পছন্দ না হয়, তবে মিনিমাম একটা পাতে দেওয়ার মত আইটেম নিয়ে ঘুরে বেড়া! তা নয়, শেষমেষ ঐ পাঁঠামূর্তিধারী পল্টুটাকেই পেলি তুই! অন্য কেউ হলে বুকে এমন ফার্নেস জ্বলত না পিকুলের। কিন্তু পল্টু! চিরকালই লাস্ট বেঞ্চের পার্সিক! পড়াশোনায় পান্তিত্যের বিশপাহাড়ি! পিকুল ক্ষুলের গুড বয়। আর পল্টু অল্লবয়েসেই বাট্টলি চ্যাম্পিয়ন। অবশ্য মালটা ভালো অ্যাথলিটও ছিল। স্পোর্টসে হাতভরে পুরষ্কার পেত।

আর পিকুল চিরকালই স্পোর্টসে ধেড়িয়ে এসেছে। কনসোলেশন প্রাইজ ছাড়া আর কিছু তার বরাতে জোটেনি! তা সত্ত্বেও মাস্টারমশায়েরা পিকুলকেই একটু বেশি ভালোবাসতেন। সেই নিয়ে বহুত জ্বলন ছিল পল্টুর। হতভাগা দলবল নিয়ে কত যে প্যাঁক মেরেছে তার হিসাব নেই! সেই পল্টু দেবীর বয়ফ্রেন্ড!

ধূস্‌। জিন্দেগিটাই বরবাদ হয়ে গেল পিকুলের। স্যারেরা সবসময়ই বলতেন—'বাবা, তুমি অনেক দূর যাবে। আমাদের সবার, তোমার মা-বাবার, গোটা নবগ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবে...'। আর সেই বার খেয়ে খেয়েই ঝাড়িতে চড়েছিল পিকুল! এখন মনে হয়, বার না খেয়ে বরং ফলিডল খেলেই ভালো হত! কি হল উচ্চমাধ্যমিকে অত ভালো রেজাল্ট করে? কি হল জয়েন্টে র্যা করে? ক্ষীর খেয়ে গেল তো সেই বাট্লি চ্যাম্পিয়নটাই!

ফ্রাস্টু খেতে খেতে ক্রমশই ল্যাদ খেয়ে পড়েছিল পিকুল! দুঃখের চোটে সিগ্রেটটাও মৌজ করে খেতে পারল না। বিশুদ্ধ যাই বলুক—এ ফ্রাস্টেশনের শেষ নেই! কিছুতেই এ কষ্ট গিলে ফেলা যাচ্ছে না! হজম করা যাচ্ছে না!

চাঁদের আলো চতুর্দিকে আবছা আভায় পড়ে চিকচিক করছিল। আশেপাশের বাড়িগুলোর লাইট নিভে গেছে। একটু আগেই রাণাজীকাকু গামছা পরে ছাতে চক্র কাটছিলেন। এখন তিনিও নেমে গেছেন। তাদের বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে না। বোধহয় শুয়েই পড়েছেন সপরিবারে। হাতের সিগ্রেটটা শেষ করে সিঁড়ির দিকেই পা বাড়িয়েছিল সে। নাঃ, আর রাত করা ঠিক নয়। প্রচুর পড়াশোনা করেছে আজ। মাথাটা আর চাপ নিতে পারছে না। এখন একটু ঘুমিয়ে নেওয়াই ভালো। যদিও পিকুল রাত জেগেই পড়ারই বেশি পক্ষপাতি। এ সাতসকালে উঠে ঘুম ঘুম চোখে পড়তে তার ভালো লাগে না। তার চেয়ে বরং রাতে পড়ে সকালে দেরি করে ওঠাটা অনেক সেফ।

কিন্তু আজ মাথাটা ধরে আছে। তাই শুয়ে পড়া মনস্থ করেই ছাত থেকে নেমে আসতে যাচ্ছিল সে। তার আগেই...

ওকি! ওটা কি! পিকুল বিস্ময়ে চোখ কচলায়! যাঃ শালা! দেবীর দুঃখে ইলুশন হচ্ছে না কি! না যা দেখছে—তা বাস্তব? সে চোখ টোখ কচলে আবার তাকাল। নাঃ, ইলুশন নয়। যা দেখেছে, ঠিকই দেখেছে! যদিও রাতের অঙ্ককারে ঠিকভাবে দেখা সম্ভব নয়। তবু আবছা ছায়া ছায়া প্রেক্ষাপটে যা দেখল, তাতেই মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল তার! একটা লোক, পরণে পায়জামা—অঙ্ককারের মধ্যে মিশে একেকটা বাড়ির ছাতের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে! প্রথমে রাণাজীকাকুদের বাড়ির ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ল পিয়ালীদিদের বাড়ির ছাতে। সেখান থেকে আরেকলাফে 'মাস্তুবী অ্যাপার্টমেন্টের' ছাতে! স্পাইডারম্যানও এমন লাফ মারতে পারে কিনা সন্দেহ!

উত্তেজনায় পিকুলের নাক ফের সুলসুল করতে লেগেছে। কে ভাই—রাতের বেলায় ছাতে ছাতে লাফালাফি শুরু করেছে! হাইলি সাশ্পিশাস্স! অন্য সময় হলে সে কি করত কে জানে। কিন্তু তার মনে হল, এই ব্যাটাই সেই 'অসভ্য চোখ'!

এমনিতে নবগ্রামের এই অঞ্চলটা একটু ঘিঞ্জি। বাড়িগুলো পরপর ঘনসন্ধিবন্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ছাতগুলো প্রায় পাশাপাশিই। কিন্তু ছাতে ছাতে লাফ মেরে দৌড়ে বেড়ানোর ঋক্ খুব

কম লোকেরই আছে! পিকুল কোন কথা না বলে সোজা নেমে গেল নীচে। ছুড়দাঢ় করে সিঁড়ি দিয়ে তাকে নেমে আসতে দেখে মা অবাক!

--'দৌড়চিহ্ন কেন?'

--'পরে বলছি মা'। সে ন্যানো উত্তর দিয়ে প্রায় গোটা তিনেক সিঁড়ি একসাথে লাফিয়ে নেমে গেল নীচে। বিদ্যুৎবেগে দৌড়ল 'মান্ডবী অ্যাপার্টমেন্টের' দিকে। ওখানেই শেষ দেখেছিল লোকটাকে। স্পিড বাড়াল পিকুল। লোকটা এর মধ্যে ভেগে না যায়!

'মান্ডবী অ্যাপার্টমেন্টের' দিকে প্রাণপণে ছুটতে ছুটতেই সে দেখতে পেল অ্যাপার্টমেন্টের তিনতলার আলো জ্বলে উঠেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ার্ট চিংকার! যা ভেবেছিল ঠিক তাই। এই সে! অসভ্য চোখ! হারামজাদা মান্ডবী অ্যাপার্টমেন্ট ভিজিট করে গেছে! পিকুল অ্যাপার্টমেন্টের ছাতের দিকে তাকায়! ঐ তো! মালটা এখনও কার্নিশে দাঁড়িয়ে! পালায়নি এখনও। কিন্তু তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে আবার লাফ মারল বলে!

অ্যাপার্টমেন্টের নীচে দরোয়ানের সাইকেলটা দাঁড় করানো ছিল। পিকুল দেখল সাইকেলটায় তালা লাগানো নেই! এই সুর্বণসুযোগ! লোকটা ইতিমধ্যেই মান্ডবী অ্যাপার্টমেন্টের ছাত থেকে লাফ মেরে পড়েছে বুলাপিসিদের ছাতে! সেখান থেকে ফের লাফিয়ে পড়ল সুব্রতদাদের বাড়ির কার্নিশে! কি স্পিড ভাবা যায় না! শালা, মানুষ না হাত্তিক রোশনের 'ক্রিশ'! দৌড়ে ওর সাথে এঁটে উঠবে না পিকুল। একমাত্র উপায় সাইকেল নিয়ে ওকে চেজ করা।

দরোয়ানের সাইকেলটায় চড়ে বসে সে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্যাড্ল করল। সাইকেলটা ভালো কস্তিশনে আছে! সাঁইসাঁই করে বাতাস কেটে বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে গেল। পিকুলের ডানদিকের বাড়িগুলোর উপর দিয়ে লাফ মেরে মেরে যাচ্ছে লোকটা। আর সাইকেল নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে তাকে অনুসরণ করছে পিকুল।

নবগ্রামের রাস্তাঘাটে সাইকেল বা বাইক চালাতে হলে আগে লাইফ ইনশিওরেন্স করা দরকার। নিদেনপক্ষে মেডিক্লিম! কর্পোরেশন এখানে ল্যাম্পপোস্ট লাগিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এখানকার চোরগুলোকে গিনতির মধ্যে ধরেনি। ফলস্বরূপ নতুন ল্যাম্পপোস্ট আমদানি হওয়ার সাতদিনের মধ্যেই বাল্বগুলো অনিদিষ্টের পথে রঞ্জনি হয়ে গেল। এখনও পোস্টগুলো আছে—তবে ল্যাম্প নেই!

তার উপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতন নবগ্রামের দাঁত ছরকুটে থাকা রাস্তা! শালা, রাস্তা তো নয়, ইত্তিয়ার ম্যাপ! এই হাঁই হাঁই করে হিমালয়ে উঠেছে তো এই ধপাখ করে পড়ল ভারত মহাসাগরে! সাইকেলটা কাঁই কাঁই করে উঠেছে, টায়ারের তলায় খানাখন্দ ভালোবেসে 'আয় আয়' করে ডাকছে! ঝাঁকুনির চোটে পিকুলের কঞ্চালটাই কুলের আঁটির মত বেরিয়ে আসার উপক্রম! তবু হাল ছাড়ল না সে। ডানদিকে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় লোকটাকে কখনও দেখা যাচ্ছে, কখনও যাচ্ছে না। যখন লোকটা দৌড়চ্ছে তখন অঙ্গুতভাবে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু যখনই লাফ মারছে, তখন ছায়ামূর্তিটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে পিকুল। সাঁৎ সাঁৎ করে কালো ছবির মত দুপাশের দৃশ্যপট সরে সরে যাচ্ছে। এতজোরে সাইকেল কখনও চালায়নি পিকুল! হ হ করে হাওয়া কেটে যাচ্ছে ছুদিক দিয়ে। সে পায়ের জোর আরও বাড়াল। হতভাগা যে স্পিডে দৌড়চ্ছে তাতে ওকে অলিম্পিকে পাঠিয়ে দিলে ম্যারাথনের গোল্ডমেডেল নির্ধার ইত্তিয়ার পকেটে আসবে!

-- 'আজ তোকে ছাড়বো না'। দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে সে-'দেখি, তুই কতবড় তিস মার খাঁ!'

লোকটা বিদ্যুৎবেগে চিড়িক চিড়িক করে তিনটে লাফ মারল। তারপরই গিয়ে পড়ল সটান দেবীদের বাড়িতে! পিকুল সাইকেল শুন্দি বাড়ির গেটে আছড়ে পড়েছে। দেবীদের বাড়ির পিছনে বিরাট পুরুর! আশেপাশে আর কোনও বাড়ি নেই। ওখান থেকে পালাতে হলে লোকটাকে অনেক পাঁপড় বেলতে হবে! লম্ফ মেরে ছাত পার করার ফাঁড়া চলবে না! গাছ বেয়ে নামার উপায়ও নেই। বাড়ির সামনে একটা গাছ আছে বটে। কিন্তু সেটা একটা পেন্নায় ক্যাকটাস! এক যদি পাইপ বেয়ে পালায় তবে অন্য কথা!

সাইকেলে ব্রেক কষতে গিয়ে সাইকেলশুন্দি মুখ খুবড়ে পড়ল সে। হাঁটুটায় প্রচন্ড জোরে লাগল! হাতটা বোধহয় কেটেই গেছে! অঙ্কারেও চটচটে রত্তের ধারা টের পেল পিকুল। কিন্তু এখন থামলে চলবে না। সে কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে পাগলের মত দৌড়ে যায় দেবীদের বাড়ির দিকে। ডোরবেল টিপতে টিপতেই চিংকার করতে শুরু করে--'সুবীরকাকু, কা-কু-উ-উ-উ...!'

সুবীরকাকুরা বোধহয় শুয়ে পড়েছিলেন। ডোরবেলের একটানা শব্দে আর পিকুলের চিংকার চঁচামেচিতে তাড়াতাড়ি কাকু-কাকিমা বেরিয়ে এলেন। অন্য জানলা দিয়ে উঁকি মারল দেবী। ঘুম ঘুম ফুলো ফুলো চোখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে এমনভাবে তাকাল যেন পারলে এখনই অভিশাপ দেয়।

পিকুল ঝক্ষেপও করল না। এখন দেবীর অভিশাপে তার বয়েই গেছে। লাইফটাই তো আন্ত একটা অভিশাপ। অভিশাপের সংখ্যা না হয় আরও একটা বাড়বে! তাতে তার মন্ত এলো গেলো!

-- 'কি হয়েছে রে পিকুল?' কাকিমা উদ্বিগ্ন কষ্টে বললেন--'এতরাতে হাঁকাহাঁকি করছিস যে!'

-- 'কাকিমা... দরজাটা খুলে দিন... বলছি... সাজ্জাতিক ব্যাপার!'

এবার মুখ খুল দেবী--'একদম দরজা খুলবে না মা। অসভ্য কোথাকার! বাবার মাথা ফাটিয়েও তোর শান্তি হয়নি! এত রাতে এসে ফের জ্বালাচ্ছিস! নির্লজ্জ, বেহায়া!'

যা খুশি বল দেবী। আজ আমি যা করবো তা তোর পেয়ারের পল্টুও পারবে না!

-- 'কাকিমা দরজাটা খুলে দিন...' সে দেবীর কথায় কর্ণপাত না করেই বলে--'লোকটা আপনাদের ছাতে এসে লুকিয়েছে!'

-- 'আমাদের ছাতে!' সুবীরকাকু আতঙ্কিত--'কে?'

-- 'দরজাটা শিগ্গিরি খুলুন। সব বলছি!'

কাকু নীচে নেমে এসে দরজা খুলে দিতেই পিকুল হড়মুড়িয়ে উপরের দিকে ছুটল। ছাতে যাওয়াই তার মুখ্য উদ্দেশ্য! কিন্তু ছাত যে তালাবন্ধ!

কাকু-কাকিমা, এমনকি দেবীও তার পিছন পিছন উঠে এসেছে ছাতের সিঁড়িতে। কাকু কনফিউজ্ড হয়ে বললেন--'কি ব্যাপার পিকুল? কে ছাতে?'

পিকুল সব কথা খুলে বলল। 'অসভ্য চোখ, তাদের ছাতে উঠে বসে আছে শুনে দেবী ঝাঁঝিয়ে ওঠে—' বাজে কথা বলিস্ন না। ড্যাম্ লায়ার! এতরাতে এসে একটা গশ্চো বানিয়ে শোনাচ্ছিস! উৎপাত করার আর কোনও রাস্তা পাস্নি?'

--'বাজে কথা বল্ছিস? পিকুল ক্ষেপে গিয়ে বলে—'এতক্ষণ ধরে আমি মালটাকে চেজ করে আসছি। পরিষ্কার দেখলাম তোদের ছাতে উঠেছে...'।

--'চেজ করছিস তো কি? তোপ দাগতে হবে? দেবী কটকটিয়ে বলে—'পরমবীরচন্দ্র দেব?... না... না। অ্যাকচুয়ালি তুই নোবেল ডিজার্ভ করিস্ন! যা কাজকর্ম শুরু করেছিস তাতে কয়েকদিন পরেই পুলিশ তোকে ধরে নিয়ে যাবে। বেল দেবে না। মানে নো-বেল। বুঝেছিস?'

সুবীরকাঙু তার ফেত্তি বাঁধা টাকটাতে হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন—'আহা, এত রাতে আবার বেলের কথা কেন? চল্প পিকুল, বরং ছাতটাই দেখে আসি।'

--'বাবা... ও মিথ্যে বলছে'।

--'চুপ কর্ণ দেবী'। সুবীরকাঙু বললেন—'এত রাতে কেউ প্র্যাকটিক্যাল জোক করার জন্য আছাড় খেয়ে হাত পা কাটে না! তাছাড়া আমিও ছাতের উপর একটা ধূপ করে শব্দ শুনেছি!'

বলতে বলতেই স্পষ্ট শোনা গেল ছাতের উপর কারুর একটা পায়ের আওয়াজ! কেউ যেন থুপথুপিয়ে হাঁটছে। পায়চারি করছে!

দেবীর মনে পড়ে গেল ছেটবেলায় পড়া একটা ভূতের গল্লা। একটা লোকের পা কাটা গিয়েছিল। তারপর থেকে তার প্রেতাঞ্চা একপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছাতে পায়চারি করত—হেঁটে বেড়াত। তার সাথে মায়ের বলা বর্ণনাটাও মনে পড়ে গেল। দত্তদের আমবাগানে মা 'অসভ্য চোখ'কে দেখে ফেইন্ট হয়ে পড়েছিল! তার নাকি ইয়া লম্বা তালগাছের মত চেহারা!

বিস্তিপিসিকে এমন চাঁচি হাঁকিয়েছিল যে তিনদিন তার ঘাড়ের, চোয়ালের ব্যথা কমেনি!

শিরুর বৌ শ্যামলী বলেছিল, তার চোখদুটো একদম ফকফকে সাদা! মণি আছে কি নেই বোঝাই যায় না!

সেই মৃত্তিমান আতঙ্ক তাদের বাড়ির ছাতে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ভাবতেই ভয়ে রক্ত হিম হয়ে গেল দেবীর! কাকিমা হাঁটমাট করে উঠে জড়িয়ে ধরেছেন কাকুকে—ওগো, এ কি সর্বনাশ হল! আমার বিস্তিপিসির সাথে যাওয়াই ভুল হয়েছে। বিস্তিপিসির চ্যালেঞ্জ অ্যাঙ্গেপ্ট করে নিয়েছে ভূটটা। সেইজন্য দেখা দেওয়ার জন্য বাড়ি ধাওয়া করে ঠিক আমাদের বাড়ির ছাতে এসেই হাঁটছে! ও আমাকে ছাড়বে না...!'

সুবীরকাঙু কি করবেন বুঝতে পারলেন না। কিছুক্ষণ থম্প হয়ে বসে থেকে বললেন—'পিকুল, চল্প ছাতটা দেখে আসি। যে-ই হোক, সে এখনও আমাদের ছাতের উপরেই আছে। পালাতে পারেনি। হাত গুটিয়ে বসে না থেকে একবার দেখা দরকার!'

কাকিমা বললেন—'পাড়ার ছেলেদের খবর দেওয়া উচিত। ওরা আসুক, তারপর যেও।'

--'নাঃ। ততক্ষণে দেরি হয়ে যাবে। সুবীরকাঙুর মুখ শক্ত—সুব্রত মোবাইল নম্বর জানো তো। ওকেই ফোন করে বলো। আর এত রাতে তোমাদের বেরিয়ে কাজ নেই! দেবী, তুই নিজের ঘরেই থাক। বেরোবি না। চল্প পিকুল।'

ছুজনেই গুটিগুটি পায়ে ছাতের দিকে এগোলা। সুবীরকাকুর বাঁ হাতে টর্চ, ডানহাতে ছাতের চাবি। তিনি সাবধানে তালা খুললেন।

--'শুনছ?' ভয়ে ভয়ে কাকিমা বললেন--'বলছি যে হেলমেটটা পরে যাবে না কি!'

--'হেলমেট?' সুবীরকাকুর ভুঁরু কুঁচকে গেছে। তিনি হেলমেটের তাৎপর্য ঠিক বোঝেন নি। কিন্তু পিকুল বুঝেছে। কাকুর টাকটার উপর দিয়ে বর্তমানে খুব ফাঁড়া যাচ্ছে। সেইজন্যই হেলমেটের প্রসঙ্গ।

--'পরে নিন কাকু!'

কাকু বিনাপ্রতিবাদে হেলমেট পরে নিলেন। তারপর ছাতের দরজা খুললেন। বাইরে তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। সে এমন জমাট অন্ধকার যে তার বর্ণনা করাই অসম্ভব! চাঁদটা এতক্ষণ তবু মিটমিট করে দাঁত কেলাচ্ছিল। এখন মেঘের এক চিলতে ওড়না টেনে ঘোমটাবতী হয়ে বসে আছে। সুতরাং কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ইনফ্যাট্ট, নিজেকেই কেমন চলমান অশ্রীরী বলে মনে হচ্ছে! মনে হচ্ছে নিজের মুন্ডুটা ছাড়া বাদবাকিটা নেই!

হঠাৎ কোথায় যেন মোবাইল বেজে উঠল। জোরালো গলায় রিংটোন বাজিয়ে চিলচিকার করছে ফোনটা! কিন্তু কোথায় বাজছে? কার মোবাইল?

--'কাকু?'

সুবীরকাকু ঢোঁটে আঙুল ছেঁয়ালেন--'শ্ৰীণু, আমার ফোন না।--তোর?'

--'নাঃ! এরকম বদ্ধত রিংটোন আমি লাগাই না!'

--'তাহলে?'

তাহলে আর কার? কারই বা হতে পারে? এই হারামীর হাতবাক্স মাকড়টার ছাড়া।

পরমোৎসাহে আস্তিন গোটাল পিকুল। একবার হতভাগাকে হাতের কাছে পেলে হয়! মোবাইল যখন আছে তখন সে মাকড়াও আশেপাশেই আছে নির্ধাৎ।

--'টর্চটা একটু জ্বালান তো কাকু। মোবাইলটা কোথায় বাজছে একটু দেখে নিই'।

টর্চ জ্বলে উঠল। কিন্তু ঠিক তখনই মোবাইলের আওয়াজ থেমে গেছে।

--'যাঃ বাবা! থেমে গেল যে....'। বলতে বলতেই ফের বেজে উঠল সেই প্রাণান্তকর

রিংটোন! এরকম বিকট রিংটোন আগেও কোথাও শুনেছে পিকুল! কিন্তু কোথায়, সেটা এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না!

--'পেয়েছি....এই দ্যাখ'। টর্চের আলো ছাতের এককোণে ফেলে বললেন কাকু--'এই দ্যাখ, মোবাইলটা দেখতে পাচ্ছিস?'

পিকুল এগিয়ে গিয়ে মোবাইলটা তুলে নিয়েছে। একটা বড় মুষকো কালো রঙের মোবাইল!

আলো দপদপিয়ে জ্বলছে নিভছে। মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে সে অবাক। কিছুক্ষণ কি বলবে ভেবে পেল না। তারপর ঢোক গিলে বলল--'কাকু...এইটা দেখে যান....'।

--'কি রে?' বলতে বলতেই সুবীর কাকু ডিসপ্লেতে চোখ রেখেছেন। ব্যাপারটা দেখে হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পেলেন না! কি আশ্চর্য! কি অন্দুতুড়ে কান্দ! ডিসপ্লেতে দপদপ করে জ্বলছে কলারের নাম--সুবীরদা কলিং....!'

--'আমি ফোন করছি!', কাকুর চোখ প্রায় টাকে চড়াৎ করে চড়ে গেছে--'আমি কি করে....!'

এই অবধিই বলতে পেরেছিলেন। তার পরেরটুকু বলার আগেই এল অতর্কিতে আক্রমণ! ছাতের একপাশে কতগুলো মাটির খালি টব ছিল। তাদের মধ্যেই একটা ঠাঁই করে লাগল সুবীরকাকুর ঠিক টাক লক্ষ্য করে! ভাগিয়স্ক হেলমেটটা পরা ছিল। নয়তো শ্রেফ 'রাম নাম সত্য' হয়ে যেত!

ঘটনাটা কি হচ্ছে বোঝার আগেই আরেকখানা টব সাঁই করে ছুটে এল পিকুলের নাক লক্ষ্য করে। সে তিন লাফ মেরে সরে দাঁড়িয়ে কোনমতে বাঁচল। সুবীরকাকুর হাত থেকে টর্চটা মাটিতে পড়ে গেছে। গড়াগড়ি খাচ্ছে। সুবীরকাকুর মাটিতে বসে পড়েছেন। সন্ধিবত তখনও হেলমেটের উপরে টবের বাড়ি খাওয়ার শক থেকে বেরোতে পারেননি।

পিকুল অজান্তেই ছাতের একদম ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হঠাত তার সামনে ছুটো দপদপে চোখ কোথা থেকে লাফ মেরে এসে দাঁড়াল! কথা নেই বার্তা নেই, খপ্ করে টিপে ধরল তার গলা!

টর্চের সাথে টর্চের আলোটাও মেঝের উপরে সরলরেখায় গড়াগড়ি দিচ্ছিল। সেই আলোয় যা দেখল, তাতে ভয়ে হার্টফেল করতে যাচ্ছিল পিকুল! ছুটো বীভৎস রোমশ হাত! এরকম রোমশ হাত সে আগে কোথাও দেখেছে! কোথায় দেখেছে...!

আর কিছু মনে করার আগেই কোথায় যেন পেন্নায় শব্দ করে বাজি ফাটল! রোমশ হাত ছুটো যেন ঘাবড়ে গিয়ে পিকুলকে ছাত থেকে ঠেলে ফেলে দিল!

পিকুল একটা আর্টিচিকার করে ওঠে। কয়েকসেকেন্ডের জন্য তার মনে হল সে বোধহয় আর বেঁচে নেই! একদম দোতলা থেকে স্টান নীচে পড়ে তার চ্যাপ্টাৰ ক্লোজড! এক্ষনি ধাঁই করে আছড়ে পড়বে নীচে! হাড়-পাঁজৱা ভেঙে খানখান হবে! বাবাকে আর কেউ পায়রা এনে দেবে না! আর কেউ প্যাকেট থেকে সিগ্রেট বেড়ে দেবে না! মায়ের সন্দেহের লিস্ট থেকে একটা নাম কমবে! লাট খেতে খেতে নীচের দিকে পড়তে পড়তে তার মনে হল, দেহের ওজন ক্রমশই কমছে। নীচে পড়লেই প্রাণপাথি ফুডুৎ! ভয়ের চোটে চোখ বুঁজে ফেলেছিল সে!

কিন্তু কেসটা কি হল! পড়তে এত সময় লাগছে কেন? নাকি কখন পড়ল টেরই পায়নি? অ্যঁ, মরা এত সহজ! কই, ব্যথা ট্যথা তো কিছুই মালুম হল না!

--' অ্যাই গৰ্দভ! চোখ বুঁজে আছিস কেন?'

এ কার গলা! যমরাজের! কিন্তু যমরাজের গলা এত কোমল! নাকি রাবণের মত তারও কিছু পোষা চেড়ি-টেড়ি আছে!

ভয়ে ভয়ে একখানা চোখ খুলল পিকুল! সামনে... চেড়ি নয়, চেরিলসম! দেবী! তার ঘরের জানলাটা খোলা! যখন উপর থেকে নীচের দিকে পড়ছিল সে তখন বোধহয় চিৎকার শুনে জানলার সামনে চলে এসেছিল। তাকে পড়তে দেখে প্রাণপণে হাত টেনে ধরেছে! ফলস্বরূপ নীচে আছড়ে পড়েনি পিকুল, দেবীর জানলার সামনে ঝুলছে!

পায়ের দিকে তাকিয়ে রঞ্জ হিম হয়ে গেল! পড়লে একদম সোজা পড়বে সুবীরকাকুর যমদূতের মত টাটা সুমোটার উপরে। দেবী যদি একটু আলগা দেয়...!

--'দেবী!' সে প্রাণপণে কাতর অনুরোধ করে--'কাকুর মাথায় বলটা আমি ইচ্ছে করে ফেলিনি। তুই রিভেঙ্গ নিতে চাইলে আমার মাথায় একটা আস্ত কাঁচের প্লোব ছুঁড়ে মারিস্, কিন্তু হাতটা ছাড়িস্ না!'

দেবীর চোখে রাগ ঘন হয়ে আসে--একে বলে জম্মের মর্কট! ছাড়বো বলে হাত ধরেছি না কি!'

যদিও ঝুলন্ত অবস্থায় প্রেম জিনিসটা ঠিক তেমন আসে না। তবু দেবীর কথা বড় মিষ্টি ঠেকল তার কানে!

ফৌঁচ ফৌঁচ করতে করতে পিকুলের কাটা ঘায়ের শুশ্রষা করছিল দেবী। সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে পা অনেকটা কেটে গেছে। হাতের চামড়াও জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। উপর থেকে পড়ার সময় মাথার একপাশে গুঁতো লেগেছিল। এখন সেই জায়গায় একটা ছেট্ট আলু হয়েছে। কালসিটেও পড়েছে।

--'আউচ...আউচ...'। দেবীর হাতের তুলোয় ডেটল। কাটা জায়গায় লাগতেই চিড়বিড় করে উঠেছে। কাতর গলায় বলল পিকুল--দেবী, এভাবে রিভেঙ্গ নেওয়ার চেয়ে তুই বরং আমাকে ফেলেই দিতি। রামজুলছে মাইরি।'

দেবী ঝাঁঝিয়ে ওঠে--চুপ কর মর্কট! 'অসভ্য চোখকে, তাড়া করার সময় মনে ছিল না? তখন তো খুব খাঙ্গা খাঁ বনেছিলি! এখন বুঝি পরতায় পোষাচ্ছে না! হাত না ধরলে এতক্ষণে কোথায় থাকতি! ভালোই হত। তোর প্যাঁকপ্যাঁক আমায় শুনতে হত না!', বলতে বলতেই ফের ফৌঁচফৌঁচ!

পিকুল ভয়ে ভয়ে দেবীর দিকে তাকায়। ওর মুড় বোঝাই দায়! কখনও ফৌসফৌস করছে, কখনও ফৌঁচফৌঁচ!

--'কি হল? অমন জুলজুল করে কি দেখছিস?' সে আবার কানা থামিয়ে খিঁচিয়ে ওঠে--'আজ কিছু একটা হয়ে গেলে কি হত? কে বলেছিল এত বীরতৃ দেখাতে? তোর কিছু হয়ে গেলে কাকিমার কি হত? কাকুর কি হত? আমার...?'

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই চুপ করে গেল দেবী। তার ফর্সা মুখ, নাক লাল হয়ে উঠেছে।

পিকুল আড়চোখে তার মুখের দিকে তাকায়। ডায়লগটা কেমন যেন অন্দুত শোনাচ্ছে না?

--'তোর আবার কি হত?', পিকুল নির্বিকারে বলে--'তুই তো ড্যাং ড্যাং করে পল্টুর হাত ধরে ঘুরে বেড়াতি!'

--'হ্যাং ইওর পল্টু! রাগে দেবীর মুখে ঘাম জমেছে। সে চড়া গলায় বলে--' ছেটবেলা থেকে পল্টু কি আমার সাথে খেলা করেছে? আমার জিততে ভালো লাগত, বলে ইচ্ছে করে কে হেরে যেত? যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, তখন দুবেলা এসে পাশে বসে থাকত কে? বাড়ি থেকে কুলচুর ছুরি করে রোজ কি পল্টু আমাকে খাওয়াতো? আমার হোমওয়ার্ক করে দেওয়ার জন্য নিজের হোমওয়ার্ক না করে বেত কে খেয়েছিল? ক্লাস সেভেনে পড়ার সময়ে সরস্বতী পুজোর দিন আমার হাত ধরে কে বলেছিল--'দেবী, তুই খুব সুন্দর!', পল্টু কি বলেছিল আমি হাসলে প্রীতি জিন্টার মত টোল পড়ে?', এবার অভিযোগের সাথে কানা মিশল--'চিরদিন শুনে এসেছি আমি মোটা, হাতির মত, গভারের মত। আমার চশমাটা দিদিমনির মত! আমার কম খাওয়া উচিত। তুই বোঝালি যে আমি যেমনই হই, তেমনই

সুন্দর! আমি আমার মত করেই সুন্দর। লোকের চোখে সুন্দর হওয়ার জন্য মুখে এনামেল করে মোমপালিশ হওয়ার দরকার নেই! তুই-ই বলেছিলি পিকুল-এর একটাও পন্টু বলেনি! আর আজ তুই আমাকে পন্টু দেখাচ্ছিস?’

পিকুল হাঁ! দেবীর সব মনে আছে! এতক্ষণ ডেটলের জ্বালায়ও তার চোখে জল আসেনি। এবার তার চোখ ভিজে এল-তোর সব মনে আছে? তুই সব মনে রেখেছিস দেবী! তবে পন্টু...?’

--'ওকে কি আমি নিজের শখে সাথে নিয়ে ঘূরছি?' দেবী আরও হিংস্র-তুই একটা গাষ্ঠাট! তাই ওকে দিয়ে তোকে জেলাস ফিল করাচ্ছিলাম! যদি হিংসের জ্বালায় আসল কথাটা তোর মুখে ফোটে, এই আশায় ঐ মাথামোটাটাকে নিয়ে ঘূরছিলাম'।

--'দেবী...দেবী...। তার হাতছুটো নিজের বুকে চেপে ধরল পিকুল- তুই আমার উপর রাগ করিস না! আসলে আমি তোকে খুব ভয় পাই। কাকুর মাথায় জল ঢালার ইচ্ছে আমার একদম ছিল না, বিশ্বাস কর্ত। আর বলটা অ্যাঞ্জিডেন্টালি...আমি আর কখনও ক্রিকেট খেলবো না। বিশ্বাস কর্ত। ব্যাটে হাতই দেবো না! আর কখনও তোকে কমপ্লেন করার ক্ষেপ দেব না। প্লিজ তুই একবার বল, আমায় ক্ষমা করেছিস্ত।'

--'দাঁড়া', দেবী উঠে গিয়ে তাক থেকে কি যেন একটা নামিয়ে আনল। জিনিসটা দেখে পিকুল হতবাক! এ তো সেই ব্যাটটা! যেটা দিয়ে ছুঁকা মেরে সুবীরকাকুর টাক ফাটিয়েছে সে! ব্যাটটা তো সেদিনই বাইরে ফেলে দিয়েছিল! দেবীর কাছে এল কি করে!

--'ক্ষমা তো তোকে করাই উচিত নয়!', দেবী রাগতস্বরে বলে--'একে তো বাবার মাথা ফাটিয়েছিস্ত, তার উপর ব্যাটটা বাইরে ফেলে দিয়েছিস্ত। আমি চুপিচুপি সময়মতো কুড়িয়ে এনেছিলাম বলে এটা এখনও ঠিকঠাক আছে। তোর এতবড় সাহস হয় কি করে? এই ব্যাট নবগ্রাম প্লেটোনিক ক্লাবকে জিতিয়েছে হাউ ডেয়ার ইউ! নিজের এতদিনের সাথীকে যদি ফেলে দিতে পারিস্ত, তবে আমাকেও ফেলে দিবি না তার গ্যারান্টি কি?'

কি বলল দেবী! কি বলল! পিকুল এবার দেবীর কোলে মুখ গুঁজে কেঁদে ওঠে। আজ বড় সুখে কান্না পেয়ে গেছে তার!

১৬.

লাটুরও আজকাল কথায় কথায় চোখে জল এসে পড়ে। এ যে কি জাতীয় রোগ বুঝে উঠতে পারে না সে। যেদিন থেকে ঐ কপালপোড়াটার সাথে দেখা হয়েছে, সেদিন থেকেই নিজের মধ্যে একটা অঙ্গুত বদল বুঝতে পারছে। এখন বিজনেসের কাজে মন লাগে না তার। হফতা তোলা, অপোনেন্ট গ্যাঙের হ্মকি, কিছুই যেন স্পর্শ করে না তাকে। শুধু কে যেন হাওয়ায় হাওয়ায়, ঘড়ির কাঁটার শব্দে, জলের টুপটাপে একনাগাড়ে বলে যায়-তুমি যেই হও, ... যেমনই হও। আমি তোমাকে ভালোবাসি...ভালোবাসি...ভালোবাসি....!'

'ভালোবাসা', শব্দটা বহুবার শুনেছে সে। রোম্যান্টিক ফিল্মে দেখেছে, নায়ক নায়িকাকে একগুচ্ছ গোলাপ দিয়ে, তাকে খুব করে বার খাইয়ে, হাওয়া টাওয়া দিয়ে 'ভালোবাসি', বলে। আর এ মাকড়াটা তো তাকে ঠিকমত দেখেওনি। লাটুও দেখেনি তাকে। তবে কি করে অত সহজে বলে দিল-তোমাকে ভালোবাসি!, কি অনায়াসে উচ্চারণ করল শব্দগুলো! আর সেই লোকটার জন্যই বা লাটুর মন কেমন করে কেন? যখন ও কাঁদে, তখন লাটুরও কান্না

পায়! যখন বলে—‘তুমি একদম আমার মায়ের মতন’, তখন অন্তুত একটা আনন্দ ছুঁয়ে যায় তাকে। কেন? কই, লাটু তো কখনও এমন ছিল না! এমন অনুভূতিপ্রবণ তো সে কখনই নয়! তবে এই মানুষটা তাকে আকুল করে তুলল কেন?

এই ঘটনার কথা সে কাউকে জানায় নি। এমনকি মাকে ও নয়। মা আজকাল তার নয়। ফ্রেন্ডের সাথে খুব অ্যাপো করে বেড়াচ্ছে। কে জানে লাভ-শাভ, ইন্টু-পিন্টু করছে কি না! করলেও লাটুর আপত্তি নেই। সারাজীবন তো একা থেকেই গেল মা। লাটুর জন্য সবসময়ই ভেবে গেল। এখন শেষ সময়ে যদি কারুর সঙ্গ পায়, তবে ক্ষতি কি?

তবু একবার মাকে আমতা আমতা করে বলেছিল—‘মা, এসব ভালোবাসা-টালোবাসা কি চিজ বল তো? লভ করলেই কি মানুষ ধেই ধেই করে ডাঙ মারে! কিস্বা ঢলাঢলি করে বেড়ায়?’
—‘ধূর্ৰ বাল’। মা সঙ্গে হাসে—ওসব ফিলিমে হয়। লাইফে হয়না।

—‘তবে কি হয়? কি করে পার্সিক বোৰে যে ঐ পেম নামের ঘোঁটালাটা হয়ে গেছে? তুমি কি করে বুঝেছিলে?’

—‘তাবলি কাঁহিকা!’, মা একটু কি যেন মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—‘আমার কি পেম করার কপাল? তোর বাপের আগে রোজ রাতে একটা করে মরদের সাথে শুয়েছি! পেম ফেম কিস্য ছিল না বুঝলি?—বক্ত্বায়াস্! মেয়েছেলের মাংসের খরিদারের সাথে ধান্দা চলে, পেম না! তারপর তোর বাপটা ছিল ডবডবে জোয়ান। একরাতে আমার ঘরে এল। মাকড়াটার আমাকে ভালো লেগে গেল। ব্যস্, গায়ের জোরে তুলে নিয়ে গেল। তারও পেম ছিল না। আমি বেওয়ারিশ ছিলাম। ঐ হারামী আমার বাঁধা বাবু হল। খেতে দিল, পরতে দিল, বিছানায় নিয়ে রঞ্জরালিয়াঁ করল, তার বাচ্চার মা বানাল। কিন্তু পেম...?’

তার বুক ভেঙে হতাশার নিঃশ্বাস পড়ল—‘একেও পেম বলে না! পেম-লভ কাকে বলে তা আমি জানি না! তোর মত আমিও লাইফে ঐ চিজটা দেখিনি। তাই তো ভাবি, আমি যা পাইনি—সব তোর নসিবে জুটুক। সিঁদুর, পেম, মনের মত মরদ—সব’।

লাটু অবাক হয়েছিল—‘বাবার সাথে তোমার তবে ভালোবাসা ছিল না মা?’

—‘না রে। ভালোবাসার এখানে কোনও সিন নেই। লভ হবার জন্য যতটুকু পহচান দরকার, তোর বাপের সাথে সেটুকু পহচান ছিল না আমার। আমার কাছে তার কি জরুরত জানতাম। কিন্তু, মালটা কখনও আমার জরুরতের পরোয়াই করেনি! কেয়ারই করেনি।

একটা মেয়েছেলেকে ঘরে রেখেছে, খেতে পরতে দিচ্ছে—যেন বাঁধা মাগী পুষছে। যেমন লোকে কুতিয়া পোষে। এর মধ্যে লভ কোথায় বল? এও তো একরকম ধান্দা!’

সে বিস্মিত হয়ে মায়ের কথা শোনে। বলে কি মা! তাহলে ভালোবাসাটা আসলে কি? একটা পুরুষের সাথে নারীর জৈবিক সম্পর্ক মাত্র? না তার থেকেও বেশি কিছু! এই যে মদ্দটা মাগীদের মত ভেউ ভেউ করে কাঁদে, নরম সরম কাতর একটা পার্সিক—তাকে তো চোখেও দেখেনি লাটু। তাহলে জৈবিক সম্পর্কের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? তাহলে জৈবিক সম্পর্কের বাইরে সে যা অনুভব করছে—তাকে কি বলে?

অনেক ভেবেও এ প্রশ্নের কোনও উত্তর পায়নি। চিরকুটটা সেদিন দিব্যি বলে বসে থাকল—‘ভালোবাসি’। আর সে কথা টুকু শুনেই কেমন যেন হেজে গেল সে! ব্যোম্কে গেল। লোকে বলে, ব্যাটাছেলের মত মেয়েদের কেউ ভালোবাসে না। কিন্তু মাকড়াটা তাকে কেমন করে

ভালোবেসে ফেলল? তার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য মোমপালিশ, মধুবালা মার্কা স্মাইল বা ক্যাটওয়াক-কিছুরই প্রয়োজন হয়নি! তবু সে ভালোবাসল! সে রাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল সে-'হয়তো আমি তোমার ভালোবাসার যোগ্য নই। কিন্তু, আমায় যোগ্য হওয়ার সুযোগ দাও। সিন্ডারেলা, তোমায় আমি সব সুখ হয়তো দিতে পারবো না। তবু তোমায় ভীষণ ভালোবাসব। তুমি যা বলবে, মনে নেবো। একটু কষ্টও দেবো না। সিন্ডারেলা, তুমি আমার হবে? সবাইকে হারাতে পারি, তোমাকে হারাতে পারবো না সিন্ডারেলা!' উত্তর দিতে পারেনি লাটু। কানায় তার কষ্টস্বর বুঝে এসেছিল। লোকটা একেবারে হাবাগোবা! বড় ভালো মানুষ! সে জানেও না কাকে প্রপোজ করছে। যাকে ভদ্রঘরের মেয়ে ভাবছে, সে আসলে এক মাস্তান আর এক বেশ্যার অবৈধ সন্তান! অল্লবয়েসেই খুন করে বর্তমানে লাটু মস্তান নামে নবগ্রাম কাঁপাচ্ছে! জানতে পারলে কি আর ভালোবাসত! ভালোবাসত না। বরং ঘো়া করত!

জীবনে কখনও গুভাজম্বের প্রতি আফসোস করেনি লাটু। সেই প্রথম তার ভীষণ রাগ হয়েছিল উপরওয়ালার প্রতি। কেন?...কেন এভাবে তার লাইফটাকেই ঘেঁটে 'ঘ' করার তাল মালটার! লাটু কি একটা ভদ্র লাইফ লিড করতে পারত না? কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে একটা ভালো ভদ্র লাইফ লিড করতে পারত না! কি দরকার ছিল এই খুনোখুনি, গুভাগর্দির মধ্যে তাকে পয়দা করার! যদি গুভাগরিই করার ছিল তবে লাইফে এ আবার কিরকম টুইস্ট? এতদিন তো দিবি সুখেই ছিল লাটু। একে মেরে, তাকে ধরে, ভয় দেখিয়ে, ব্যবসা চালিয়ে মানু তুলছিল। যদি এমন জীবনই তার জন্য বেছে ছিলে দীশ্বর, তবে এই ন্যালাক্ষ্যাপা লোকটার আসার কি দরকার ছিল? কি দরকার ছিল 'ভালোবাসি' বলার? এখন লাটু কি করে? তার যে খালি কানা পায়! ঐ ভালো মানুষটার জীবন নষ্ট করতে পারে না সে। বৌ যদি মস্তান হয়, তবে সমাজ কি ওর মত ভীরু, অসহায় মানুষের মুখে খুতু ছেটাবে না? ওকে ভুলতেও পারে না। ওর জীবনে যাওয়ার উপায়ও নেই। অথচ ওর কথা মন থেকে মুছে ফেলতেও পারে না লাটু। শুধু অমোঘ মন্ত্রের মত মনে পড়ে—'ভালোবাসি...তোমাকে ভালোবাসি...'।

সেরাতে তার বুকে মুখ গুঁজে বলেছিল লোকটা—'তোমায় এখনই জবাব দিতে বলছি না। যদি আমার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারো, যদি বিশ্বাস করো আমাকে, তোমার যদি সম্মতি থাকে, তবে বুধবার রাত দশটায় স্টেশনের সামনে এসে দাঁড়িও। জোর করছি না। তোমার ইচ্ছের মর্যাদা আমার কাছে আছে। যদি আসতে হয়, নিজের ইচ্ছেতেই এসো। আমি তোমার জুতোজোড়া নিয়ে অপেক্ষা করব। তুমি আমার উইভচিটারটা নিয়ে এসো। তাহলেই দুজনেই দুজনকে চিনতে পারবো'।

ভাবতে ভাবতেই অন্যমনশ্ব হয়ে গিয়েছিল লাটু। আজই বুধবার। এখন সাড়ে ন'টা বাজে। তার কি যাওয়া উচিত? না গেলে হয়তো লোকটা অপেক্ষা করে করে হতাশ হয়ে ফিরে যাবে। অথচ ওকে যে ফেরাতে ইচ্ছে করে না লাটুর। মানুষটা বড় ভালো, বড় অসহায়। ওর হাত ধরে নতুন একটা জীবন শুরু করার লোভ তার মনের মধ্যে কখন যেন অঙ্কুরিত হয়ে গেছে। সে লোভ বড় অমোঘ! তার মূলোচ্ছেদ নিজের হাতে কি করে করবে লাটু! অথচ ওদের

ছুজনের মিলন কখনই সম্ভব নয়—তা লাটুর চেয়ে ভালো আর কে জানে! যে চোখে
ভালোবাসা খেলে বেড়াচ্ছে, সে চোখে নিজের জন্য কৃৎসিত ঘেন্না কি করে দেখে!
তার চোখ বেয়ে টপ্টপ্ করে জল গড়িয়ে পড়ে। মনে হল, তার কেউ নেই! মনে হল,
ভগবান—এ জন্ম আমাকে কেন দিলে? এ যন্ত্রনার চেয়ে তো মৃত্যুও ভালো!

নিজের যন্ত্রণার মধ্যেই ডুবে ছিল সে। হঠাৎ একটা জোরালো শব্দে সচকিত হয়ে উঠল।
জন্মাবধি এই কানফটানো শব্দ শুনে আসছে লাটু। আজন্মপরিচিত শব্দটাকে চিনতে ভুল
করেনি। বম্বিং হচ্ছে! এবং তাও খুব কাছেই! তার এরিয়ার মধ্যেই! কার এতবড় দুঃসাহস,
তার এরিয়ার মধ্যে এসে বোম ফেলে!

সে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে। ঘোঁটালাটা কি? দেখতে হচ্ছে।
তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল লাটু। মা ও আওয়াজটা শুনতে পেয়েছেন। অন্তব্যস্ত
হয়ে এসে বললেন—‘কি মাজরা রে লাটু? বোম পড়ছে কেন বে?’
—‘জানি না মা,’ তার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত আশঙ্কা কাজ করছিল। কয়েকদিন আগেই
তার অপোনেন্ট গ্যাঙের সর্দার দোদো হমকি চিঠি পাঠিয়েছিল যে খুব তাড়াতাড়িই লাটু আর
তার সাজোপাঙ্গরা খতম হতে চলেছে। উত্তরে নিজের মাথার একটা চুল ছিঁড়ে পাঠিয়ে
দিয়েছিল লাটু। দোদো আর লাটুর মধ্যে প্রায়ই গোলমাল লেগে থাকে! লাটু মেয়ে বলে
দোদো তাকে পাতাই দিতে চায় না। অথচ মুখোমুখি গ্যাং ওয়ারে সে যে কতবার হেরে ভূত
হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই!

নবগ্রাম আর নতুন পলীর মাঝখানে একটা ছোট অংশ আছে। লোকে সেটার নাম রেখেছে—
‘সোনার গাঁ।’ সেটার দখল নিয়েই দুই পক্ষের মারপিট। কারণ সোনার গাঁয়ে বেশিরভাগ
দোকানই জুয়েলারি। এছাড়া, জায়গাটায় নতুন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনও হচ্ছে। ফ্ল্যাট কালচার
যাকে বলে আর কি! লাটুর মত মন্ত্রনদের কাছে প্রায় সোনার খনি। তার দলবল হফতা
হিসাবে একটা মোটা টাকা তোলে। এছাড়া প্রোমোটারদের কাছ থেকেও প্রচুর আমদানি হয়।
এগুলো একধরণের সওদাও বটে। লাটু মন্ত্রনকে খুশি রাখলে কোনরকম বিপদ-আপদের
সম্ভাবনা নেই। ঘটনাটা বাস্তবে অনেকটা তাই। আজ পর্যন্ত সোনার গাঁয়ে কোনওরকম চুরি-
চামারি, লুটপাট হয়নি। লাটুর আশ্রয়ে সোনার গাঁ নিরাপদ।

কিন্তু সেটা সহ্য হচ্ছে না দোদোর। লাটু মেয়ে হয়ে এত উন্নতি করবে কেন? এত দবদ্বা
কেন তার? অনেকবার লাটুর কাজে বাগড়া দিতে চেয়েছে সে। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি।
এখন সোনার গাঁ নিয়ে ছুজনের ইগোর লড়াই চলছে। অনেকটা আমারিকা ভার্সাস ইরাকের
মত। লাটুকে অনেকবার হমকি দিয়েছে সে—‘মাগী হয়ে এত তেজ ভালো নয় লাটু।’

লাটু মুচকি হেসেছে। সে দোদোর সোনার চেইনে ঝুলে থাকা লকেটে মা কালীর ছবির দিকে
আঙুল তুলে দেখিয়েছে—‘ওঁকে এই ডায়লগটা মেরেছিস কখনও? কালীপুজোর সময় তো
দেখি একটা তেজি মাগীর পায়ে পড়েই পাঁঠার মত ম্যা ম্যা করিস্। তখন তোর এই
শানপাতি কোথায় থাকে বাড়া?’

—‘জাদা হলপত্তি নয় লাটু।’
দোদো ফৌস ফৌস করতে করতে বলে—‘নয়তো এখান থেকেই তোর মাঝ্যত শুরু হবে।’

--'ফোঁস ফোঁস যত খুশি কর'। লাটু তার গালে আলতো করে একটা ঠোনা মেরে বলে--
'চ্যাম্না সাপের ফোঁসফোঁসানি যদি না থাকে, তবে কি আর থাকল!'

দোদো সেদিন রাগে জ্বলে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু বলতে পারেনি। সে হয়তো ভেতরে প্রস্তুত হচ্ছিল বড় কোনও আঘাত দেওয়ার জন্য।

আরেকখানা বোম পড়ার শব্দ। মা অসহায়ের মত লাটুর দিকে তাকালেন--'লাটু...কিছু লোচা হচ্ছে...আজ সোনার গাঁয়ে যাওয়ার কথা ছিল না?'

--'সে তো কাবুল, পচারা...!' বলতে বলতেই সে থেমে গেল। নিশ্চূপ হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। কাবুল-সোনাদের দেখতে পেয়েছে সে। তারা দৌড়তে দৌড়তে এদিকেই আসছে।

--'ভাই...ভাই...!'

কয়েকসেকেন্ডের মধ্যেই তাদের পরিষ্কার দেখা গেল। প্রাণপণে দৌড়তে দৌড়তে এসে তুকল লাটুর দলবল। সোনার মাথা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। কাবুলের হাত জখম, ঘাড় বেয়ে জমাট রক্তের ধারা! তবু তারা ঠিকঠাক আছে। কিন্তু কাবুলের পিঠে পচা নিষ্পন্দ!

লাটু শুধু নীরব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। পচা! পচা নড়ছে না কেন?

--'পচার কভিশন ডেঞ্জার ভাই'। কাবুল কোনমতে বলল--'একের পর এক বোমা ছুঁড়ছিল ওরা। দোদো দলে ভারি ছিল। সোনা একা পড়ে গিয়েছিল। দোদো ওকে মেরেই ফেলত। কিন্তু পচা গিয়ে দোদোর কাঁধে ভোজালি বসিয়ে সোনাকে বাঁচাল। ওরা টাকার ব্যাগ নিয়ে পালিয়েই আসছিল, কিন্তু একটা বোমা...'। বলতে বলতেই কেঁদে ফেলল সে।

কাবুলের পিঠ থেকে পচাকে ততক্ষণে নামিয়ে নিয়েছেন মা। তার সর্বাঙ্গ পুড়ে গেছে! মুখের একদিকটার বীভৎস অবস্থা! একটা হাত উড়ে গেছে...! সন্ত্বত বোমার ধাক্কাতেই হাতটা গেছে! তবে সে তখনও বেঁচে আছে। বুক ওঠানামা করছে।

--'লাটু...অ্যাস্বুলেঙ্গ ডাক'। পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলেন মা। দুহাতে পচার মুখ ধরে উন্মত্তের মত কাঁদতে কাঁদতে ডাকছেন--'পচা...পচা রে...!'

অতিকষ্টে চোখ মেলল পচা। তার মুখটা একটু বেঁকল--'ভাই, কেঁদো না। এখনও ফোট হইনি'।

--'ফোট হবে তোর দুশ্মন'! মা বললেন--'তুই ডুম হলে আমাকে ইঞ্জিরি শেখাবে কে? জুতোর বাড়িই বা কে খাবে? তোকে শ্লা, টপকাতে দিচ্ছ না। এখনই হাসপাতালে...'।

--'ভাই...'। খুব কষ্ট করে টেনে টেনে বলল পচা--'কোথাও যাবো না। তোমার কোলে মাথা রাখতে দেবে?'।

মা তার মাথাটা কোলে টেনে নিলেন। পচা কোলে মুখ গুঁজে যেন ভীষণ শান্তি পেল। ফের তার চোখ বুঁজে আসে....।

--'পচা, শ্লা, তুই চোখ বুঁজবি না!', মায়ের বুকফেটে কান্না বেরিয়ে আসে--'গুয়োরের বাচ্চা! তোকে আমি বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছি--আমার হকুম--আমার অডর--তুই চোখ বুঁজবি না'।

পচা অসন্তুষ্ট কষ্টে চোখ খুলে ফের হাসার চেষ্টা করে--'ব-ড-ভা-ই...'।

তিনি প্রবল কান্নাকে বুকে চেপে বলেন--'বল'।

--'অডু মানে বদু। ওটা অর্ডার হবে'।

--'শ্লা-হারামীর হাতবাক্স, কুত্তার দুম...দেব এক...।' বলতে বলতেই স্থির হয়ে গেলেন মা। এ কি! পচার মাথাটা এমন ঝুলে পড়ল কেন? তিনি বড়বড় চোখ করে লাটুর দিকে তাকালেন। লাটু পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে...? তার মানে...!

গোটা ব্যাপারটা বুঝতে তার সময় লাগল। যখন বুঝলেন, তখন তার চোখ দিয়ে জল পড়ল না! নাক দিয়ে টপটপ করে কাঁচা রক্তের ধারা পড়তে লাগল পচার ঠীঁট ছাঁয়ো। একদিন এই রক্তই দুধ হয়ে তার প্রাণ বাঁচিয়ে ছিল। মৃত্যুর পরও সেই রক্ত তার সঙ্গে ছাড়ল না।

আস্তে আস্তে অবশ্য হয়ে যাচ্ছিলেন লাটুর মা! বুকে একটা তীব্র যন্ত্রণা...! তার মধ্যেই কোনমতে বললেন--'যা শ্লা! পালিয়ে গেলি! আমিও কয়েকদিন পরে আসছি। তখনই জুতোপেটা করবো। জাহানমে দেখা হবে...'।

লাটু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তৈরি হচ্ছিল।

মায়ের অবস্থা সিরিয়াস। তাকে আর পচাকে নিয়ে লাটুর দলবল নার্সিংহোমে দৌড়েছে। আপাতত বাড়িতে লাটু একাই। যা করার তাকেই করতে হবে। দোদোর সঙ্গে তার বোৰাপড়া করার আছে। পচার মৃত্যু ব্যর্থ যাবে না! ওর মৃত্যুর শোধ দিতেই হবে। হয় লাটু নিজের জান দিয়ে ওর হিসাব চুকিয়ে দেবে। নয়তো দোদোর জান নিয়ে...!

এই হারামীর দুনিয়ায় ক্ষমা বলে কিছু হয় না! জানের বদলে জান, খুনের বদলা খুন। এই আঞ্চলিকের উপরেই এই দুনিয়া টিঁকে আছে।

কালো লেদার জ্যাকেটে, কালো চাপা ট্রাউজারে লাটুকে মৃত্যুরই আরেকনাম বলে মনে হচ্ছিল। সরু কোমরে স্টিলের বেল্টটা ঝকমক করছে। মৃত্যুর অনেকগুলো হলিয়া আছে। সম্ভবত সবচেয়ে সুন্দর হলিয়া এটাই। যতটা সুন্দর, ততটাই খতরনাক! তার চোখে শুধু জিঘাংসা ঝলসাচ্ছে! উদ্যত হাতদুটো পারলে এখনই দোদোর গর্দন টিপে ধরে! মসৃণ হিলহিলে কালসাপের মত শরীরে বিদ্যুৎ তুলতে তুলতে এগিয়ে গেল লাটু! তার কোমরে পয়েন্ট চুয়ালিশ রাশিয়ান রিভলভার উদ্যত ফণা গুটিয়ে বসে আছে। দোদোকে সামনে পেলেই ছোবল বসিয়ে দেবে! বুকে নয়, পিঠে নয়! একেবারে দুই ভুরুর মাঝে! সোজা ভেজায়! বাইকে ওঠার আগে হেলমেট পরতে গিয়েই ফের নজর পড়ল উইন্ডচিটারটার দিকে! বুকের মধ্যে একটা পিন ফোঁটার মত ব্যথা! মাকড়াটা আজ হয়তো অনেক আশা নিয়ে আসবে। দাঁড়িয়েও থাকবে! কিন্তু কার জন্য? সেই মেয়েটার জন্য, যে চিরকালই বদনাম! কোন মেয়েটাকে ভালোবাসে সে? সমাজের চোখে যে ঘৃণিত? দশবছর বয়েসে যে খুন করে লতিকা থেকে লাটু মস্তান হল, আজ আবার আরেকটা খুন করতে যাচ্ছে, বা খুন হতে যাচ্ছে!

তাকে কি ভালোবাসা যায়?

লাটু একমুহূর্ত চুপ করে কি যেন ভাবল। তারপর উইন্ডচিটারটা তুলে নিল হাতে। নাঃ, মালটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা ঠিক হবে না। তার লাইফে আর কতটুকু বাকি আছে কে জানে! হয়তো আজই দোদোর হাতে নিকেশ হয়ে যাবে। ওকে আজ এই চূড়ান্ত মুহূর্তে সব কথা খুলে বলবে। সব কথা খুলে বলা দরকার। ওর জানা দরকার, ও কাকে ভালোবাসে। উইন্ডচিটার আর সোনার গাঁ থেকে আনা টাকার ব্যাগটা নিয়ে বাইকে উঠল লাটু। সজোরে গর্জন করে উঠল তার বাইক!

১৭.

বিশু তখন একজোড়া জুতো নিয়ে রেলস্টেশনের সামনে অপেক্ষারত। এর মধ্যে সে পিকুলের কাছ থেকে প্রেম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান তথা ফান্ডা নিয়ে নিয়েছে। পিকুল এখন সফল প্রেমিক। তাই তার কাছ থেকে একটু টিপ্স্ তো নিতেই পারে বিশু। কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই তার নিরেট খোপরিতে চুকছে না! প্রেমের নির্দর্শন হিসাবে অনেকেই অনেক কিছু দেয়। বিশুর পূর্বপ্রেমিকারা কেউ নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে দিয়েছে, কেউ গিফ্ট দিয়েছে, কেউ বা নিজের অন্তর্বাস দিয়েছে। এছাড়াও হিস্টোরিক্যাল রেফারেন্স বলছে, তাস্তুল, মানে পান, ফুল-টুল দেওয়ারও রেওয়াজ ছিল।

কিন্তু জুতো! প্রেমের নির্দর্শন হিসাবে জুতো দেওয়ার কথা কখনও কেউ শুনেছ? জুতো কি প্রেমের প্রতীক? একমাত্র সিন্ডারেলা ছাড়া আর কারুর ক্ষেত্রে জুতোর রেফারেন্স পায়নি সে! কিন্তু তাও ঠিক অতটা রোম্যান্টিক নয়!

শুনে পিকুল বলেছে--‘ধুতোর বিশুদ্ধা! তোমার লাভস্টোরিটাই তো বিলকুল মগজমারিওয়ালা! ছেলের সাথে প্রেম করছ না মেয়ের সাথে তাও জানো না! দশ নম্বরের জুতোর মালকিন কোনও মেয়ে হয় কি না, ধারণা নেই! মালটাকে ঠিকমত দেখোও নি। সে যে ভাষায় কথা বলে, সে ভাষায় কোনও মেয়ে কথা বলে বলে আজ পর্যন্ত শুনিনি। তার উপর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কথা, যখন তোমার পা মচকে গেল, তখন সে তোমায় কোলে করে নিয়ে এসেছিল! যা যা একজন পুরুষের করার কথা, তার সবই তোমার সিন্ডারেলা করছে! মামু, গোটা কেসটাই গড়বড়ে! তুমি সেসব নিয়ে চিন্তা না করে জুতো হাতে বসে আছ!’,
--‘পুরুষ কি মেয়ে জানি না!’, বিশু কনফিডেন্ট--এমনকি অ্যালিয়েন হলেও আমার কোনও আপত্তি নেই! আমি ওকেই বিয়ে করবো’।
--‘তাহলে আর কি? এগিয়ে যাও’।

পিকুল আর কথা বাঢ়ায়নি। বরং বিশুকে আজ সে নিজেই সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়েছে। নতুন সাদা রঙের পাঞ্জাবী পরে তাকে একদম নতুন বর লাগছে। তার উপর ফ্যাঁচর ফ্যাঁচর করে একগাদা পারফিউম ছিটিয়েছে পিকুল। এমনভাবে পারফিউম দিচ্ছিল যেন গোটা শিশিটাই তার উপরে ঢালবে। তার কান্তকীর্তি দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছিল বিশু। জীবনে কোনও মেয়ের সাথে দেখা করতে এত টেনশন হয়নি তার! বারবার ভাবছে-সিন্ডারেলা কি পরে আসবে? শাড়ি না অন্যকিছু? আদৌ আসবে তো? তাকে দেখে কি লজ্জা পাবে? নাঃ, অমন লজ্জাবতী লতা সে নয়। লজ্জা পেলেই বরং আশ্চর্য হবে। যেটুকু সময় তাকে দেখেছে, তাতে মনে হয় টিপিক্যাল মেয়েলি সেন্টিমেন্টগুলো ওর নেই!

তাছাড়া সিন্ডারেলা যা বলে সব সত্য হয়! পরদিন যখন সে আবার শান্তনুদাদের বাড়িতে হৃক্সকে পড়াতে গিয়েছিল, তখন সত্যিই গ্রে হাউন্টাও ও বাড়িতে ছিল না! কারা যেন তাকে গভীর রাতে চুপিসাড়ে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে! শান্তনুদার বৌ খুব কানাকাটি করছিল। কিন্তু বিশু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। মনে হয়েছিল, ঈশ্বর এতদিনে তার মুখের দিকে তাকিয়েছেন।

বেশি টেনশন হলে, বেশি বেশি জলতেষ্ঠা পায়। আর বেশি বেশি জল খেলে বেশি হিসি
পাওয়াই স্বাভাবিক! ঠিক যখন বেরোতে যাচ্ছে, দশটা বাজতে দশ মিনিটে একেবারে ব্লাডার
রেঁপে হিসি এল। সে বেরোতে গিয়েই অ্যাবাউট টার্ন মেরে সোজা তুকে গেল টয়লেটে!

পিকুল অধৈর্য হয়ে হাঁক পাড়ল—আরে শুরু! ফের টয়লেটে! আবার মাইনাস! কি শুরু
করেছ মামা! এই তো গেলে!'

বাথরুম থেকে আওয়াজ আসে—কি করব। পেল যে! বলতে বলতেই গান শুরু হল—ভরা
থাক্ ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায় হৃদয়ের পাত্রখানি...।

--'তোমার কিছু হওয়ার নয়!', পিকুল বিরক্ত—খালি হতে না হতেই ভরা থাক্
ভরা থাক্ গাইছ...।

--'তোর জিভটা বহুত লম্বা হয়েছে পিকুল', বাথরুম থেকেই বলে বিশু—কথায় কথায় চেটে
দিচ্ছিস'।

--'চাটাচাটি পরে হবে। আগে বেরোও তো বাপু! কতক্ষণ ধরে তুকে বসে আছো! তোমার
ইয়েটা কি হোস্পাইপ? না টালার ট্যাঙ্কটা তুমি ভরেছ?'

এমন কথা বলার পর আর বাথরুমে বসে থাকা যায় না। অগত্যা বেরিয়ে এল বিশু। মানে
বেরোতেই হল তাকে! আর তারপরই দুরুত্বুরু বুকে স্টেশনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে।
হাতে সিভারেলার জুতো। একটা একটা করে মেয়ে তার সামনে দিয়ে যাচ্ছে, আর সে
কৌতুহলী হয়ে তাকাচ্ছে। ঐ গোলাপি রঙের শাড়ি পরা মেয়েটা? নাঃ, বড় বেঁটে। সিভারেলা
বিরাট লম্বা! তাহলে কি ঐ কমলা রঙের সালোয়ার সূট পরা লম্বা মেয়েটা? নাঃ, বড়
কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে হাঁটছে। সিভারেলা অত ললিতলবঙ্গলতাও নয়! তবে কোন্টা? হলুদ
কুর্তি? নাঃ ওর হাতে কোনও উইভচিটার নেই!

ঘড়িতে আন্তে আন্তে রাত দশটা বাজল। তারপর সাড়ে দশটা। তারপর একটু একটু করে
ঘড়ির কাঁটা পৌনে এগারোটার দিকে এগোল। অনেক মেয়ে সামনে দিয়ে এলো। যত
তৎপরতায় এলো, ঠিক তত তৎপরতাতেই গেল। আন্তে আন্তে স্টেশনের সামনেটা ফাঁকা হয়ে
এলো। আশেপাশের পান, বিড়ি, সিগ্রেটের দোকানগুলো ঝপ ঝপ করে বন্ধ হচ্ছে।
ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল বিশুর। হতাশাতেও মানুষের ক্লান্তি আসে। সে হতাশ। বুঝে গেছে
সিভারেলা আর আসবে না। আসলে সে ও প্রত্যাখ্যান করল বিশুকে! অন্যান্য মেয়েদের মত
তাকে ছেঁড়া চশ্মলের মত ফেলে গেল! নাঃ, সিভারেলার কোনও দোষ নেই। বিশু যখন
প্রপোজ করেছিল তাকে, তখন সে চুপ করে গিয়েছিল। কোনও আশা দেয়নি। হয়তো মুখের
উপর রিফিউজ করতে খারাপ লেগেছিল বলেই চুপ করেছিল। আর তার নীরবতাকেই
সম্মতির লক্ষণ ভেবে আশায় বুক বেঁধেছিল বিশু। ভুল করেছিল।

দুপ্ত করে বুকের আশার বাল্বটা ডুম হয়ে গেল। বুকে বড় আগুন জ্বলছিল। অথচ বড়ও
ধারেকাছে কোথাও নেই। এমন সন্তাননার কথা মাথাতেই আসেনি বিশুর। আসলে সাথে গোটা
কয়েক বড়ি নিয়ে আসত। আর তারপর রেললাইন তো কাছেই....!

যেহেতু বড়ি নেই, সেহেতু পান সিগ্রেটের দোকানের দিকেই এগোলো বিশু। বড়ি নেই তো
কি আছে, সিগ্রেটই ধরবে। টোব্যাকো কজেজ ক্যানসার! দেবদাস পার্বতীর জন্য লিভার

পচাতে পারে, আর সে সিন্ডারেলার জন্য ফুসফুস পচাতে পারে না! সিন্ডারেলার জন্য শহীদ হয়ে যাবে সে। সেই উদ্যোগ নিয়েই কয়েক প্যাকেট সিন্ককাট কিনে নিল।

একটা সিন্ককাট মুখে গুঁজে মনে পড়ল, দেশলাই নেই! ওদিকে হতচাড়া দোকানি ঝাঁপ ফেলার প্রায় ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। শালা, ব্যাডলাকটাই খারাপ!

হঠাতে নাকের কাছে একটা লাইটার ফস্ক করে জুলে উঠল! একটা লেদার জ্যাকেট পরা হাত তার দিকে লাইটার এগিয়ে ধরেছে!

--'থ্যাঙ্কস দাদা'। সে হাতের মালিকের দিকে তাকায়। এক বাইক আরোহী। হেলমেটে মুখ ঢাকা। বিশ শুনতে পেল লোকটা বলছে--'তবে যে সেদিন বলেছিলি, বিড়ি খাস্ না! গাঞ্জ মারছিলি?'

বিশ্বয়ে বিশুর হাত থেকে সিপ্রেটটা পরে গেল! এ কার কষ্টস্বর শুনছে সে! সিন্ডারেলা! বাইকের উপরে বসে!

তার সমস্ত সন্দেহের মুখে তালা ঝুলিয়ে বাইক আরোহী এগিয়ে দিল তার উইন্ডচিটারটা। বিশ হাঁ। কোনমতে বলল--'তুমি... তুমি... ছেলে!'

--'ছেলে হবে তোর বাপ!', বলতে বলতেই হেলমেটটা খুলে ফেলেছে সিন্ডারেলা! হ্যাঁ, সেই তো! এই তো সেই মিশরীয় চোখ! নিটোল সুন্দর মুখ! আর বাজি ধরে বলতে পারে বিশ এ মুখ কোনও ছেলের নয়! তবে এ কি ধরণের মাঝা!

--'সিপ্রেটটা তো উলটো করে ধরেছিলি বাল',। সিন্ডারেলা হাসল--' থোবড়া পুড়ে গেলে কি হত? যা হাতে ধরতেই জানিস না, তা নিয়ে রঙবাজি করতে যাস্ কেন?'

--'আমার মুখ পুড়লে তোমার কি?', প্রায় মেয়েদের মত অভিমান করেছে বিশ--'আমি তোমার কেউ নই। নয়তো এত দেরি করে কেউ আসে? আমি কখন থেকে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে প্রায় হেরিটেজ হয়ে গেলাম...'

--'শোন্ মাকড়া',। সিন্ডারেলা বলল--' তোর ভ্যানতারা শোনার মত সময় নেই। যা যা বলছি ধ্যান দিয়ে শোন্। আমি কোনও সিন্ডারেলা-ফেলা নই। তুই ভুল লোককে ভালোবেসেছিস্ত। আমার পরিচয় জানিস তুই? আমাকে সবাই 'লাটু মন্তান' নামে একডাকে চেনে! আমি বহুত খতরনাক গুড়া। আমার বাপটা ছিল মান্তান-মা রাস্তি...'

বিশ স্তুতি! এর থেকে তো মাথায় বাজ পড়লেও ভালো ছিল! এই তবে লাটু মন্তান! এই তার সিন্ডারেলা! যখন অতনূর বাড়িতে সিন্ডারেলার খোঁজে গিয়েছিল, তখনই ফেরার পথে এই লাটু মন্তানেরই বাইকের তলায় চাপা পড়েছিল সে! গালাগালিও দিয়েছিল! নবগ্রামের আস, সবার ভাই লাটু মন্তান-তার সিন্ডারেলা! একজন ভাই তার স্বপ্নের প্রেয়সী-রূপকথা! হে ভগবান!

--'অনেককে টপকেছি, অনেককে মায়ের ভোগে পাঠিয়েছি! এখন যাচ্ছি দোদোর কাছে। বদলা নেব। হয় মরবো, নয় মারবো',। লাটুর চোখ জুলে ওঠে--'এবার বল, ভালোবাসিস আমায়? ভালোবাসা কাকে বলে বুঝিস? একটা মান্তানকে ভালোবাসার মানে বুঝিস তুই?', বিশ তখনও প্রায় দুই পাউন্ডের হাঁ করে আছে! তার মুখের চোয়ালটা হঠাতে আটকে গেছে কি না সন্দেহ হয়!

--'বল না!' অন্তুত রাগে চেঁচিয়ে উঠল লাটু-'ভালোবাসিস? এখনও পেয়ার মহৰতের ব্যান্ড বাজাবি কানের কাছে?'

আর প্যায়ার মোহৰতের ব্যান্ড! বিশুর নিজেরই তখন ব্যান্ড বাজছে! সে তখনও নিরুত্তর! ধপাস্ করে শক্তিহীনের মত মাটিতেই বসে পড়েছে! লাটু তার দিকে তাছিল্যভরে ছুঁড়ে দেয় উইঙ্গচিটারটা। তার বাইক গর্জন করে উঠল। অসহায়ের মত বসে থাকা বিশুর দিকে তাকিয়ে তার ভীষণ রাগ হয়! মনে হয়, খুন করে ফেলে লোকটাকে! দোদোকে নয়, এখনই এই পার্লিকটাকে টপকে দেয়! রাগে, দুঃখে তার চোখে জল এসে পড়েছে। চোখের জল ঢাকতেই হেলমেটটাকে মুখের উপরে নামিয়ে আনল সে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তারপর লাটু চলে গেল। একরাশ ধূলো বিশুর মুখের উপরে উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল তার বাইক!

বাইকের স্পিড বাড়তে বাড়তেই ঝাঙ্গা দুচোখে আকাশ দেখল লাটু মন্তান! হঠাৎ মনে হল, তার কেউ নেই! সব আছে, তবু অন্তুত একটা শূন্যতা তাকে প্রাস করছে নিরুত্তর! নাঃ, রাগ করে লাভ নেই। লোকটা বড় ভালো মানুষ! শরিফ লোক। ওর ভালো হোক।

শুধু অন্তর্যামী জানলেন দোর্দভপ্রতাপ লাটু সত্যিই কাউকে ভালোবেসে ফেলেছিল! সে যে যন্ত্রণা ভোগ করছে—তাকেই বলে ভালোবাসা!

দোদো মন্তানের আজ মেজাজ খুব শরিফ!

ঐ লাটু নামের খানকি মাগীটাকে একহাত নেওয়া গেছে! সোনার গাঁয়ের টাকার ব্যাগটা অবশ্য হাত ছাড়া হয়ে গেল! কিন্তু ওর চ্যালাচামুভাদের খুব চমকে দিয়েছে সে। একটা বোধহয় খচাই হয়ে গেল। তা যাক্, তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই দোদোর। হাতের কাছে পেলে ঐ ঘমভি শালির মুভুটাও ধড় থেকে আলাদা করে দিত! দোদোকে নিয়ে মাজাকি! মাথার চুল ছিঁড়ে পাঠানো! মানে, বাল ছেঁড়া গেছে! বাল ছেঁড়াচ্ছি হারামজাদী।

বিদেশী মদের বোতলে ত্পিস্তুচক কয়েকটা চুমুক দিল সে। এমনিতে সে 'বাংলু জিন্দাবাদেই' বিশ্বাসী। কিন্তু আজ বিশেষ দিন। সেলিব্রেট করতে হবে না? মাগী হয়ে মদ্দাবাজি! দেখলেই গা চিড়বিড় করে দোদোর! খুব একচোট বদলা নেওয়া হয়েছে। খানকি নিশ্চয়ই এখন নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে।

ধুস বাল্। মাল খেয়ে মন্তি হচ্ছে না! আরেকটু চিল্ দরকার। ওদিকে কাঁধের ব্যথাটাও টনটনাচ্ছে। হারামের পিল্লা পচা ভোজালির এক কোপ বসিয়ে দিয়েছিল। যদিও জখম তেমন সাজ্জাতিক নয়। ব্যান্ডেজ মেরে দিয়েছে কোনমতে। তবু শালা দবদ্বাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে সে চেঁচায়—' নন্দু... পদু... কোথায় মরে গেলি শালা... বরফ দিয়ে যা...। মাল তো চায়েরও অধম হয়েছে!'

--'কেউ আসবে না বে!', দোদো যেখানে বসেছিল, ঠিক তার সামনেই টেবিলের ওপান্তে অন্ধকার জমে আছে। সেলিব্রেট করার জন্য বেশি ঝিনচ্যাক পছন্দ করে না সে। বরং অন্ধকারে বসেই মাল খাওয়াই তার বেশি পছন্দের। সেই অন্ধকারই যেন হিস্হিস্ করে বলল—সব কটাকে আগেই ঠিকানা লাগিয়ে এসেছি!

ঠিকানা লাগিয়ে এসেছে! একটু একটু করে নেশা ধরছিল দোদোর। এ কথায় আমেজটা চুরমার হয়ে গেল! ঠিকানা লাগিয়ে দিয়ে এসেছে মানে!

সামনের ছায়ামূর্তিটা সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বিনা অনুমতিতেই বসে পড়ল- টেনশন খাস না বীৰু। ফোট হয়নি। শ্রেফ একটু ঘন্টৱ-পাতি তোড়ফেঁড় কৱেছি। মেৰামত হবে'।

--'ଲାଟୁ...ତୁଇ...!' ଦୋଦୋ କଥା ବଲତେ ବଲତେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଗତିତେ ଟେବିଲେର ନୀଚ ଥେକେ ବନ୍ଦୁକଟା ବେର କରେ ଏନେହେ। କିନ୍ତୁ ଯତ ଦ୍ରୁତ ଗତିତେ ସେ ଅନ୍ଧଟା ବେର କରେ ଆନଳ ତାର ଥେକେଓ ଦ୍ରୁତଗତିତେ ଏକଟା ଛୁରି ଏମେ ପଡ଼ିଲ ତାର ହାତେର ଉପର। ପୁରୋ ତାଲୁ ଏଫୋଡ୍ ଓଫୋଡ୍ କରେ ଟେବିଲେର ଗାୟେ ଗେଁଖେ ଗେଛେ! ସନ୍ତ୍ରଣାୟ ପାଗଲେର ମତ ଚିତ୍କାର କରେ ଉଠିଲ ଦୋଦୋ। ହାତ ଥେକେ ଫିନକି ଦିଯେ ରଙ୍ଗ ଛୁଟିଛେ! ହାତ ନାଡ଼ାନୋର ଉପାୟ ନେଇ! ଅବଶ ହାତ ଥେକେ ଆହ୍ଲେଯାନ୍ଧଟା ଖୁସି ପଡ଼ିଲ ଲାଟିର ପାରେର କାହେ!

—‘খামোঁখা লাফড়াবাজি করছিস কেন বে?’ লাটু তার অস্ত্রটা তুলে তাছিল্যের দৃষ্টিতে দেখছে—কি বে বাড়া, এ কে ফরটি সেভেনের যুগে দেশি কাটায় কাজ চালাছিস খানকির ছেলে? ছোঁ! নেহাঁ তোদের ঘন্টরটা আমার নেই, নয়তো এটার উপর পেসাব করতাম।’

--'ফের হলপটি?' দোদো কাতরাতে কাতরাতেই বলে--'লাট...খানকি...!'

—‘গাঁড় মারা গেছে তোর হলপট্টির!’, লাটু ঠাণ্ডা গলায় বলে—এসেছি তোর সাথে একটা সেটিং করতে। ছেনালিপনা করতে আসিনি। তুই খামোখা ক্যাওড়া করছিস্কেন বে?’

-- 'কিসের সেটিৎ'?

সোনার গাঁয়ের টাকা ভরা কালো ব্যাগটা টেবিলের উপর ধপাস্ করে ফেলে দেয় সে। ব্যাগ ভর্তি টাকা।

--'এই টাকার জন্যই পচাকে উড়িয়েছিস্ম না?', লাটুর চোখ ধ্বক ধ্বক করে জুলে ওঠে।
তার হাতে মসৃণ পয়েন্ট ফরটি ফোর ফণা তুলেছে। একদম সোজা গান পয়েন্টে দোদোকে
রেখে হিস্থিস্ম করে বলল সে--লেংঃ, টাকা ফেরত দিলাম। এবার পচাকে ফেরত দে হারামী।
পারবি ফেরত দিতে? প্রচন্ড রাগে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল লাটু--পারবি ফেরত
দিতে? পারবি পচাকে এনে দিতে শালা, খানকির ওলাদ!

ଦୋଦୋ କିଛୁ ବଲତେ ଯାଚିଲା। ତାର ଆଗେଇ ତାର ମୁଖେର ଭିତରେ ରିଭଲବାରେର ନଳଟା ତୁକିଯେ ଦିଯେଛେ ଲାଟୁ। ଉଦ୍‌ୟତ ଆଞ୍ଜଳ ଟ୍ରିଗାରେ! ଛଡ଼ଛଡ଼ ଖଲ୍‌ଖଲ୍ କରେ ଏକଟା ଶବ୍ଦ! ଦୋଦୋର ପ୍ୟାନ୍ଟ ଭିଜେ ଗେଛେ!

--'ঘাঃ শা-লা!' সে অট্টহাসি হেসে ওঠে--মুতে দিল? চোখের সামনে যমরাজকে দেখলে সকলেরই প্যান্ট গিলা হয়! কিন্তু তুই তো শালা মরদের বাচ্চা! একটা মাপীর সামনে মুতে প্যান্ট ভাসাচ্ছিস! ' বলতে বলতেই বাঁ হাতে একটা সিগ্রেট ধরাল। দোদোর মুখ থেকে বের করে আনল বন্দুকের নল। কিছুক্ষণ তার দিকে বন্দুক তাক করে রাখল লাটু। দোদোর মুখের উপরে চুপচাপ ধোঁয়া ছাড়ছে। কোনও কথা বলছে না। আন্তে আন্তে তার চোখে রঞ্জ জমছে! পচার ক্ষতবিক্ষত মুখটা মনে পড়ছে... হাতটা উড়ে গিয়েছিল... ছোটবেলায় সে আর পচা একসাথে খেলত... মায়ের ভুলভাল ইংরেজি ঠিক করে দিত সে... জুতোপেটা খেয়েও থামত না... সেই পচা মায়ের কোলে শুয়ে শেষ নিঃশ্঵াস ফেলল...!

— ‘শা-লা মাদারচোদ’। প্রচন্ড আক্রমণে সে চেয়ার থেকে টেনে তুলল দোদোকে। এতসহজে ওকে মেরে ফেললে তো কাম তামাম হয়ে যায়। কিন্তু এত সহজে ওকে মারবে না লাগ্যু! পচার এক একটা ঘায়ের বদলা নেবে সে! প্রথমে হাত দিয়ে শুরু করল ধোলাই। লাগ্যু

ক্যারাটে এক্সপার্ট। সে জানে কিভাবে মারলে হাড় ভাঙে। একটাৰ পৱ একটা মারে দোদোৰ হাড় ভেঙে চুৱমাৰ কৱছিল। শোন্ শালা, হাড় যখন ভাঙে তখন কেমন শব্দ হয়! দ্যাখ্, মাৰ খেতে কেমন লাগে! তাকে তুলে টেবিলেৰ উপড়ে প্ৰচন্ড জোৱে আছড়ে ফেলল লাটু! টেবিলটা ভেঙে খানখান। সঙ্গে সঙ্গে দোদোৰ কোমৰও। মালটা সাপেৱ মত বুকে ভৱ দিয়ে এদিক ওদিক পালানোৰ চেষ্টা কৱছে দেখে ওৱ পিঠে চেয়ারটাও আছড়ে ভাঙল লাটু!

দোদোৰ দম নেই লাটুৰ সাথে লড়াৰ! যতই সে পুৱৰষ হোক, লাটুৰ মত ট্ৰেনিং তাৱ নেই! খালি হাতে সে ঐ মেয়েটাৰ সামনে দাঁড়াতেই পাৱবে না! দলবল সঙ্গে থাকলে অন্যকথা— কিন্তু একা লড়াৰ ধৰক নেই! ফলস্বৰূপ যন্ত্ৰণায় ছট্টফট্ কৱতে কৱতে, শুলে চড়ানো শুয়োৱেৰ মত পৱিত্ৰাহি চিংকাৰ কৱে একতৰফা মাৰ খেয়ে যাচ্ছে।

মাৰ খেয়ে যখন তাৱ অৰ্ধমৃত অবশ্য তখন দোদোৰ বুকেৱ উপৱ পা রেখে রণচন্তীৰ মতই দাঁড়াল লাটু! হাতে রিভল্যুবাৰটা উদ্যত! তাৱ মুখে থুঁ: কৱে একদলা থুতু ফেলে বলল সে—শা_লা, তাকে টপকাতেই এসেছিলাম। কিন্তু দ্যাম্না সাপ মেৰে কোনও লাভ নেই! তোৱ সোনাৰ গাঁ দৱকাৱ। নে! তোকে টাকটাও দিয়ে গেলাম। সবকটাকে মেৱামত কৱতে দৱকাৱ লাগবে। কিন্তু এৱপৱ কোনও মেয়েছেলেকে ।খানকি, বলাৰ আগে, পাঞ্জা নেওয়াৰ আগে মনে ৱাখিস্, একটা খানকিই তোৱ এই হালত কৱেছে। ইচ্ছে কৱলে, উপৱে প্ৰোমোশনও কৱে দিতে পাৱত! এৱপৱ যে লাইফটা চেয়াৱে বসে কাটাৰি, সেটা তোকে এই খানকিই ভিখ দিয়েছে! যাতে ভুলে না যাস্, তাই তোৱ কোমৰ আৱ পিঠেৰ দফাৱফা কৱে গেলাম। এবাৱ দ্যাখ্ শালা, কোমৰ ভাঙলে কেমন লাগে!'

এৱ চেয়ে চূড়ান্ত অপমান আৱ হতেই পাৱে না! অন্তত দোদোৰ কাছে তো নয়ই। এৱ চেয়ে ৰোধহয় মৃত্যু ও ভালো!

তাকে একটা লাথি মেৰে ফেৱাৰ পথ ধৱল লাটু। তাৱ আৱ কিছু ভালো লাগছে না! দোদোকে মাৰতেই এসেছিল। কিন্তু মাৰপথে মাকড়াটাৰ সাথে দেখা হয়ে যাওয়াৰ পৱই মনটা কেমন বদলে গেল। কি হত দোদোকে মেৰে? পচা ফিৱে আসত? একটা খুনেৱ বদলে বৱং পালটা খুন হত! খুনেৱ বদলে খুনেৱ সিলসিলা চলতেই থাকত যতদিন না দুই দলই কুতুৱ মওত মৱছে! এটা কি একটা লাইফ! কিসেৱ জীবন এটা!

মায়েৱ বলা কথাগুলো মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৱতে পাৱছিল সে। সত্যিই এই জীবনে কিছু ৱাখা নেই! লোকে তোমায় ভয় কৱবে, শ্ৰদ্ধা কৱবে না! পাতা দেবে, যত্ন কৱবে না! সেলাম ঠুকলেও প্ৰণাম কৱবে না! সৰ্বোপৰি ।ভাই ভাই, কৱে চাপলুশিগিৱি কৱলেও—কেউ বলবে না ।ভালোৰাসি'।

অব্যক্ত যন্ত্ৰণায় ভিতৱে কাঁদছিল লাটু। সে দোদোৰ দিকে পিছন ফিৱে হেঁটে যাচ্ছে। হতাশ, ব্যৰ্থ—ক্লান্ত লাটুৰ পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না যে দোদো কোমৱে ভৱ দিয়ে ঘেঁষটে ঘেঁষটে তাৱ দেশি কাটাৰ কাছে পৌঁছেছে। কোনমতে হাত বাঢ়িয়ে তুলে নিয়েছে বন্দুকটা! তাৱ বন্দুকেৱ নল অব্যৰ্থভাৱে লাটুৰ মাথা তাক কৱেছে! সামনাসামনি না পাৱক, পিছন থেকেই খালাস কৱবে খানকিটাকে! যুদ্ধে অন্যায় বলে কোনোকিছু নেই! তাৱ কোমৰ ভাঙলাৰ শোধ তুলতেই হবে।

ଲାଟୁ ବେଶ ଖାନିକଟା ଏଗିଯେ ଗିରେଛିଲ। ହଠାତ୍ ଦେଶି କାଟା ଗରଜନ କରେ ଉଠିଲ! ସେ ଥମକେ ଗେଲ! ବ୍ୟାପାରଟା କି ହଲ ତଥନଓ ବୁଝାତେ ପାରେନି। ବିଶ୍ୱଯେ ଚୋଖ ବଡ଼ ବଡ଼ କରେ ପିଛନଦିକେ ତାକାଳ। ଏ କି! ଦୋଦୋ ମୁଖ ଥୁବଡ଼େ ପଡ଼େ ଆଛେ! ମାଥା ଚୁଇୟେ ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛେ! ତାର ହାତେ ତଥନଓ ଦେଶି କାଟା ଧରା! ବାଞ୍ଗୋତ ତବେ ପିଛନ ଥେକେ ତାକେ ତାକ କରେ ଗୁଲି ଚାଲିଯେଛିଲ! ଢାମନା, ମାଦାରଚୋଦ ଶାଲା! ସାମନାସାମନି ମୋକାବିଲା କରାର ହିମ୍ବତ ନେଇ! ପିଛନ ଥେକେ ଗେମ ଖେଳିଛେ ଶୁଣେରେ ବାଚା!

କିନ୍ତୁ ଗୁଲିଟା ଲାଗଲ ନା କେନ? ଦୋଦୋର ଟିପ ଯଥେଷ୍ଟଇ ଭାଲୋ! ଏତକ୍ଷଣେ କାଟାର ଗୁଲିତେ ଲାଟୁର ଭେଜା ଉଡ଼େ ଯାଓଯାଇ କଥା! ତବେ!

ଚୋଖ କୁଁଚକେ ଓଦିକେ ଭାଲୋ କରେ ଦେଖତେଇ ବ୍ୟାପାରଟା ଆଯନାର ମତ ସାଫ ହୟେ ଗେଲ। ଏକଟା ଲୋକ ଦୋଦୋର ଠିକ ପିଛନେଇ ଦାଁଡିଯେ ଆଛେ! ତାର ହାତେ ଏକଟା ଡାଙ୍ଗ ମତନ କିଛୁ! ସନ୍ତବତ ଏକଟା ହଡ଼କୋ। ଯଥନ ଦୋଦୋ ଗୁଲିଟା ଚାଲାତେ ଯାଚିଲ ଠିକ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତେଇ ଲୋକଟା ଧାଇ କରେ ଓର ମାଥାଯ ହଡ଼କୋର ମୋକ୍ଷମ ବାଢ଼ି ବସିଯେଛେ! ଫଳସ୍ଵରୂପ ଗୁଲିଟା ଠିକ ଜାଯଗାଯ ନା ଲେଗେ ହାଓଯାଯ ଫାଯାରିଂ ହେବେ!

କେ ବାବା ଏଇ ଓୟେଲ୍‌ଟେଇଶାର! ଲୋକଟା ହଡ଼କୋଟାକେ ଫେଲେ ଏକଟୁ ଏଗିଯେ ଆସତେଇ ଚୋଖ ଛାନାବଡ଼ା ହୟେ ଗେଲ ଲାଟୁର। କୋନମତେ ବଲଲ—'ତୁଇ!...ତୁଇ ଏଖାନେ! କି କରେ ଏଲି!,'--'ତୋମାର ପିଛୁ ନିଯେ, ଆଇ ମିନ ଫଳୋ କରେ,' ବିଶୁ ବଲଲ—'ଆମାର ସିଭାରେଲା ଯେମନଇ ହେକ, ସେ ତୋ ଆମାରଇ। ତାକେ ଏକା କି କରେ ବିପଦେର ମଧ୍ୟେ ଯେତେ ଦିତେ ପାରି? ତାଇ ତୁମି ଚଲେ ଆସାର ପରଇ ଏକଟା ଅଟୋ କରେ ତୋମାଯ ଫଳୋ କରତେ କରତେ ଚଲେ ଏସେଛି। ଏସେ ଦେଖି ଏଇ ହାରାମୀର ପୋ ତୋମାଯ ପିଛନ ଥେକେ ଶ୍ରୀଟ କରତେ ଯାଚେ। ତାଇ ହାତେର କାହେ ଆର କିଛୁ ନା ପେଯେ ହଡ଼କୋଟାଇ ବସିଯେ ଦିଲାମ ଓର ମାଥାଯ!,' ସେ ଭୟାର୍ତ୍ତ ଗଲାଯ ବଲେ—'ଲୋକଟା ମରେ ଗେଲ ନା କି!'

ଜୋରେ ହେସେ ଉଠିଲ ଲାଟୁ—'ଧୁସ ମାକଡ଼ା, ଏତ ଯଦି ଭୟ ଖାସ ତବେ ଓର ମାଥାଯ ହଡ଼କୋଟା ବସାଲି କେନ?'

--'ବା-ରେ!,' ବିଶୁ ବଲଲ—'ଯେ ତୋମାଯ ମାରତେ ଯାଚିଲ! ତାଇ...,'

--'ତାଇ ବେବାକ ବସିଯେ ଦିଲି!,' ହାସତେ ହାସତେ ତାର ଚୋଖେ ଜଳ ଏସେ ପଡ଼ିଲ—'ଜୀବନେ ତୋ ଏକଟା କକରୋଚଓ ମାରିସ୍ତିନି। ଆଜ ଠ୍ୟାଙ୍ଗାଲି କି କରେ?'

--'କି ଜାନି! ମନେ ହଲ ଆମି ଯଦି ଓକେ ନା ମାରି—ତବେ ଓ ତୋମାକେ ମାରବେ। ଆର ତୋମାଯ ମାରଲେ ଆମିଓ ବାଁଚବୋ ନା!,' ବିଶୁର ଗଲା ଧରେ ଏସେଛେ—'ସିଭାରେଲା, ତୁମି ଜିଜ୍ଞାସା କରେଛିଲେ ଲାଟୁ ମନ୍ତନକେ ଭାଲୋବାସତେ ପାରବ କି ନା! ଭାଲୋବାସା କାକେ ବଲେ ଜାନତେ ଚେଯେଛିଲେ! ଉତ୍ତର କି ଦିତେ ପେରେଛି?'

ଉତ୍ତର! ଏର ଥେକେ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ଆର କି ହତେ ପାରେ! ଯେ ବିଶୁ କୋନଓଦିନ ଏକଟା ମଶାଓ ମାରେନି, ସେ ଆଜ ହାତେ ଅନ୍ତର ତୁଲିଲ! ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତର ତୁଲିଲଇ ନା—ଏକଟାକେ ମାୟେର ଭୋଗେଓ ପାଠାଲ! ଲାଟୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କୋନଓ ଉତ୍ତର ଦିଲ ନା। ବରଂ ଏକଟୁ ଚିନ୍ତିତ ହୟେ ବଲେ—'କିନ୍ତୁ ମାମା, କାଜଟା ଠିକ କରିସ୍ତିନି। ତୁଇ ଶରିଫ ଲୋକ। ଏସବ ଖେଳନା ନୟ ବେ! ଏ ଜିନିସ ତୋର ହାତେ ମାନାଯ ନା,'

--'ଆମି ତୋମାର ଜନ୍ୟ ସବ ପାରବୋ। ଆମି ତୋମାଯ ଭାଲୋବାସି ଲାଟୁ,' ଲାଟୁର ପାଯେର କାହେ ବସେ ପଡ଼େଛେ ବିଶୁ—'ଆମାଯ ଫିରିଓ ନା,'

লাটু মুচকি হাসছে। তার চোখে জল। মুখে কানামাখা হাসি। বড় সুখে কাঁদছে-হাসছে সে।
মমতা মাখা স্মিঞ্চ স্বরে বলল-‘আঃ মাকড়া, তোকে নিয়ে যে কি করি। তোর জন্য শা-লা,
আমাকে ধান্দাই পাল্টাতে হবে বুঝলি? শরিফ ধান্দা করতে হবে। তোকে বিশ্বাস নেই। এবার
ডাঙ্গা হাতে নিয়েছিস্, পরের বার হয়তো রামদা নিয়েই মাঠে নামবি!‘

--‘লাটু... তাহলে!‘

--‘লাটু না’। সে বিশুর দুহাতে হাত রেখেছে-‘লতিকা বল’।

অনেকদিন এমন আনন্দ পায়নি বিশু। তার মনে হল, সে এই পৃথিবীর রাজা!

সিভারেলা... থুড়ি লতিকাও তবে তাকে ভালোবাসে... লতিকা তাকে ভালোবাসে... ওঃ
ইশ্বর!

১৮.

--‘এই মোবাইলটাকে চিনতে পারছ কেউ?’

সুবীরকাকুর বাড়িতে সেদিন অসভ্য চোখ, যে মোবাইলটা ফেলে রেখে পালিয়েছিল, সেই
মোবাইলটাকে দেখিয়ে বললেন সুবীরকাকু-‘এই ফোনটা আমার বাড়ির ছাতে পাওয়া গেছে।
হুলোদা অনেকক্ষণ সরু চোখ করে মোবাইলটাকে মাপলেন। তারপর ফের বিসর্গ জুড়ে
বললেন-‘এটা থোঃ...’।

তিনি শেষ করার আগেই পিকুল বলল-‘সুব্রতদার মোবাইল। তাই না সুব্রতদা?’

সুব্রতদা হাঁ করে মোবাইলটার দিকে তাকিয়েছিলেন। এখন তাকে আর শার্লক হোম্স বা মিস্
মার্পল বলে মনে হচ্ছে না! বরং সদ্য ধরা পড়া কয়েদীর মতই মনে হচ্ছে! একদম চোরের
চাকর যাকে বলে আর কি! কোনমতে থুতিয়ে থুতিয়ে বললেন-

‘হ্যাঁ... ওটা... আমারই... কিন্তু... সুবীরদার বাড়ির ছাতে গেল কি করে!’

--‘যেমন করে তুমি গিয়েছিলে!’, পিকুল চোখ কটমট করে বলে-‘এতদিন সবাইকে সন্দেহ
করে বেড়াচ্ছিলে! কখনও বিশুদ্ধা, কখনও রাবণ! সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স!

সাইকোলজি! আরও কত কি! এবার বল? তোমার মোবাইল সুবীরকাকুর ছাতে গেল কি
করে?’

--‘কি জ্বালা!’, সুব্রতদা মুখটাকে বেগুনের ফালির মত লম্বাটে করে বললেন-‘আমি কি
করে বলব? মাইরি বলছি... আমি নই!‘

--‘তুমি বললেই তো হবে না!’, পিকুল গঞ্জীর-‘আই উইটনেস আছে’।

--‘আই উইটনেস? সেটা কে?’

--‘আমি’।

--‘তুই?’, সুব্রতদা একেবারে তেড়েফুঁড়ে একসা হলেন-‘তুই আমায় দেখেছিস?’

--‘ দেখেছি।

--‘স্বচক্ষে দেখেছিস আমাকে?’

পিকুল মৃদু হাসল-‘তোমায় না দেখলেও চলে! তোমার হাত দেখাই কাফি!‘

--‘হাত দেখা কাফি মানে!’, তিনি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন-‘তুই কি জ্যোতিষী? না আমার হাতে
লেখা আছে যে আমিই ‘অসভ্য চোখ’!‘

--'তোমার হাতেই লেখা আছে!', পিকুল বলল--' যখন ছাতে আমার গলা টিপে ধরেছিলে তখন তোমার হাত দেখতে পেয়েছিলাম। এ তল্লাটের কারুর হাতে অমন বনমানুষের মত লোম নেই! এরকম কঙ্গে হাত একমাত্র তোমারই আছে! তাছাড়া গত মেলায় তুমি একটা ফসফরাস দেওয়া চশমা কিনেছিলে তাই না?'

--'কি বলছিস্ যা তা!', সুব্রতদা অসহায়ের মত বললেন--'বিলিভ মি...! আমি এসব করিনি!'

--'আচ্ছা? তাহলে বলো, মজুমদার বাড়ির বৌভাতে রাবণ আর বিশে দুজনেই লেটে এসেছিল তাই না? তুমি দুজনকেই আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলে। তার মানে তুমিও অনেক রাত অবধি ওখানে ছিলে। ইয়ানি তোমারও ফুল স্কোপ ছিল লাইভ পানু দেখার!'

--'কি বলছিস!'

পাশ থেকে পাঁচু বলল--'তাহলে বলো কাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে? রোজ রাতে তুমি আমাদের সঙ্গে পাহারা দাও। কাল রাতে শ্রেফ হাওয়া হয়ে গেলে! আর তোমার মোবাইলটা সুবীরকাকুর ছাত অবধি পৌঁছল কি করে?'

--'আরে কাঁচকলা, আমি তো নিজেই বুঝতে পারছি না!', সুব্রতদার মাথায় হাত পড়ল--'কাল রাতে আমি বাড়ি ছিলাম না...মানে বিয়ের নেমন্তন্ত্র খেতে গিয়েছিলাম। মোবাইলটায় চার্জ ছিল না বলে জানলার পাশে চার্জারে বসিয়ে চলে গিয়েছিলাম। ফিরেছি অনেক রাতে, তাই খেয়াল করিনি। আজ সকালে দেখলাম মোবাইলটা নেই!'

আশেপাশের সবাই হাইলি সাশ্পিশাস্, ভঙ্গিতে থোবড়া লটকে বসে আছে। অর্থাৎ কেউ সুব্রতদার কথায় বিশ্বাস করছে না। কথায় দম নেই!

--'আচ্ছা', পিকুল ভুরু কুঁচকে বলে--'তুমি লং জাম্প চ্যাম্পিয়ন ছিলে না? ছাত থেকে ছাতে লাফিয়ে যেতে পারো?'

--'হ্যাঁ, লং জাম্প চ্যাম্পিয়ন ছিলাম। কিন্তু সে তো...!', সুব্রতদা বললেন--'ওঃ পিকুল, পিঙ্গ, বিশ্বাস করু। ওটা আমি ছিলাম না। আমি কোনমতেই ছিলাম না! কাল বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ত্র ছিল। সেটাই অ্যাটেন্ড করতে গিয়েছিলাম। তাই কাল আসতে পারিনি।'

--'কোথায় বিয়ে বাড়ি ছিল?'

--'ওঃ নো পিকুল!', তার প্রায় কাঁদোকাঁদো অবস্থা--'এভাবে তোরা আমাকে সন্দেহ করিস না! আমি কিছু করিনি! একটা নিরীহ, নিরপরাধ মানুষকে এভাবে সন্দেহ করতে কষ্ট হচ্ছে না তোদের?'

--'তোমার হয়েছিল?', পিকুল তীব্রস্বরে বলে--'যখন বাবন আর বিশুর মত দুটো নিরীহ লোককে চমকানোর প্ল্যান করেছিলে, বিশুকে চমকেছিলে, তখন কষ্ট হয়নি? এখন নিজের গাঁড় মারা যাচ্ছে বলে খুব কষ্ট হচ্ছে--তাই না?'

সুব্রতদার টানটান গোঁফজোড়া কেমন যেন ঝুলে পড়ল। কয়েকমুহূর্ত গুম মেরে বসে থাকলেন। তারপরই বাচ্চা ছেলের মত হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন--'ওরে, আমি আর কখনও কাউকে সন্দেহ করবো না...এই ঘাট মানছি...নাক মুলছি...কান মুলছি...আর কখনও কথায় কথায় পার্নিককে চমকে বেড়াবো না...কারুর দিকে আঙুল তুলবো

না...শালা, উংলি করার আগে উংলি কেটেই ফেলবো...কিন্তু বিশ্বাস কর... আমি কিছু করিনি...আমি অসভ্য চোখ নই...আমি নই...!

বলতে বলতে অত বড় লোকটা, শার্লক হোম্স আর মিস্ মার্পলের গুষ্টির তুষ্টি করতে করতে কেঁদে গড়াগড়ি দিতে লাগল!

১৯.

বাবনের মনে হল—একটা ট্রেন তার কানের সামনে হইস্ল্ দিতে দিতে চলে যাচ্ছে! একটা ঘড়ি ক্রমাগত টিকটিক করে করে কাঁটা সরিয়ে সরিয়ে সময়ের পরিমাপ করে চলেছে! এইমাত্র ডঃ মিত্র বালিঘড়িটাকে উলটে দিয়ে গেছেন। বালি ক্রমশই ঝুরঝুর করে পড়েই যাচ্ছে। ইশারা করছে—সময় শেষের পথে!

এখন শিউলি অনেকটাই ভালো। কিন্তু এ ভালো ভালো নয়। প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে যেমন শেষবারের মত একবার দপ করে জ্বলে ওঠে—এই সুস্থতা অনেকটা সেই রকম। আগের দিন ডঃ মিত্র বলছিলেন—‘ওঁর হাতে আর বেশি সময় নেই। বড়জোর একমাস বাঁচবেন। আজই ওকে রিলিজ করে দিচ্ছি। বাড়ি নিয়ে যান। দেখবেন শেষের কটা দিন যেন আনন্দে থাকেন উনি। যেন বেশি উত্তেজিত না হন’।

--‘ডাক্তারবাবু, এখন কিছুই কি করার নেই?’

--‘নাঃ!’, ডঃ মিত্র মোলায়েম গলায় বলেন—‘শরীরের যা অবশ্য তাতে পেশেন্ট অপারেশন টেবিল অবধি বাঁচবেন না। অ্যানাস্থেশিয়াই নিতে পারবেন না। তার চেয়ে বরং বাড়িতে নিয়ে যান। আপন মানুষদের মধ্যেই শেষ দিনটা কাটুক’।

বাবনের কানে আবার ট্রেনের হইস্ল্। দিনের শেষ ট্রেনটা যেমন ক্লান্ত ভাবে সিটি দিতে দিতে চলে যায়, ঠিক সেভাবেই সময় চলে যাচ্ছে। অথচ কিছু করার নেই! কালকে ডাক্তারবাবু বললেন শিউলিকে আনন্দে রাখতে। আপনজনের মধ্যে রাখতে। কিন্তু কিভাবে? এর মধ্যে অবশ্য একটা ভালো খবর আছে। লাটু অবশ্যে বিয়ে করার জন্য রেডি হয়েছে। পাত্র বড়িখোর বিশু! বাবনের মনে হয় লাটুর জন্য এর থেকে ভালো বর পাওয়া সম্ভব ছিল না। বিশু ভীষণ ভালো ছেলে। লাটুকে ভালো রাখবে। তাছাড়া লাটু ঠিক করেছে গুভাগিরি ছেড়ে দেবে! বিশুর জন্যই ছাড়বে! বিশুর কথা ভেবেই তার এই সিদ্ধান্ত! শুধু বিউটি পার্লার আর হোটেলের কারবারটাই থাকবে। বাট নো মোর কালা ধান্দা! প্রেম যে মানুষকে কি থেকে কি করে! একটা মানুষ ভালোবাসা পেলেই আমূল পালটে যেতে পারে। লাটু কালকে মায়ের সাথে দেখা করতে এসেছিল শাড়ি পরে! তাকে দেখে হাঁ বাবন! কোথায় সেই বাইক হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়ানো মাচো টমবয়! চলাফেরায় নরম ছন্দ এসেছে! চোখে কাজল, ঠাঁটে লিপস্টিক! কানে দুল, হাতে একগাদা ছুড়ি ঝুমুর ঝুমুর করছে! পায়ে নৃপুরের ঝমঝম! চোখ নামিয়ে লাজুক লাজুক হাসছিল। তার হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল বিশু! কোথায় সেই ন্যালাক্ষ্যাপা পান্তি! গ্রীতিমত ক্লিনশেভড আন্ত একটা চকচকে ঝকঝকে পুরুষ! আর তিনিদিন পরেই ওরা বিয়ে করছে! কয়েকদিনের পরিচয়ের জল অবশ্যে বিয়ে অবধি গড়াল। কিন্তু প্রেমটা যে ঠিক মত করা হল না! বিশুর সপ্রতিভ উত্তর—‘কেন বিয়ের পর কি প্রেম কন্টিনিউ হয় না? আমাদের প্রেম টি.বি.সি.’।

বাবন আঁৎকে উঠে বলে—‘টি.বি.সি? টিউবারকুলোসিস?’

--'ଲ୍ଲୁ ବି କନ୍ଟିନିଉଡ!,' ବିଶୁର ଦିକେ ତାକିଯେ ଲାଜ୍ଞକ ହେସେ ବଲଲ ଲାଟୁ--'ତାଇ ନା?'

--'ଲାଟୁ'। ବାବନ ବଲେ--'ଅବଶେଷେ ବିଯେର ଫୁଲ ଫୁଟଳ?'

--'ଲାଟୁ ନୟ'। ସେ ଫେର ହାସଛେ--'ଲତିକା!'

ବାବନ ଅବାକ! ଏଇ ଦୋର୍ଦ୍ଦପ୍ରତାପ ଭାଇୟେର ମଧ୍ୟେ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ମେଯେଟା ଏତଦିନ ଛିଲ କୋଥାଯ!

ଶିଉଲି ଠିକଇ ବୁଝେଛିଲ, ଲାଟୁ ପ୍ରେମ ପେଲେ ପାଲଟେ ଯାବେ। ସତିଇ ବିଶୁର ଐକାନ୍ତିକ ଭାଲୋବାସା ଓକେ ପାଲଟେ ଦିଯେଛେ! ହୟତୋ ଭବିଷ୍ୟତେ ଆରା ପାଲଟାବେ!

ଓରା ଦେଖା କରେ ବେରିଯେ ଆସାର ପର ବାବନ ଶିଉଲିର ସାମନେ ଗେଲ। ବାବନକେ ଦେଖେଇ ତାର ଚୋଥେ ଜଳ ଚିକଚିକିଯେ ଓଠେ--'ବାବନ, ଏସେଛିସ୍? ତୋର ଅପେକ୍ଷାଇ କରଛିଲାମ। ଶୁଣେଛିସ୍? ଆମାର

ଲାଟୁ... ଆମାର ଲାଟୁର କପାଳେ ସିଁଦୁର ଜୁଟବେ। ମନେର ମତ ମରଦ ଜୁଟବେ। ପେମ ଜୁଟବେ!'

ଆନନ୍ଦେର ଚୋଟେ ତାକେ ଜଡିଯେ ଧରେଇ କାଁଦିଲ ଶିଉଲି। ତାର କାଁଧେ ମାଥା ରେଖେ ପରମ ସୁଖେ ଚୋଥେର ଜଳେ ଭିଜିଯେ ଦିଲ ଶାର୍ଟ! ବାବନ କୋନରକମ ଇତ୍ତତ ନା କରେ ତାର ମାଥାଯ ହାତ ରାଖିଲ। ଯେନ ଏକଟା ବାଚା ମେଯେକେ ଆଦର କରଛେ।

--'ତୁଇ ଆମାର ଜନ୍ୟ ହେବି ଲାକି ବେ!,' କାଁଦତେ କାଁଦତେଇ ବଲେ ଶିଉଲି--'ତୁଇ ଆମାର ଜିନ୍ଦେଗିତେ ଏଲି। ଆର ଆମାର ପ୍ରଲବେମ ଖତମ ହଲ,'।

ବାବନ ଗଲା ଖୁବାରି ଦେଯ--'ଭାଇ, ପ୍ରଲବେମ ନୟ, ଓଟା ପ୍ରବଲେମ ହବେ!'

ତାର ବୁକେ ଏକଟା କିଲ ମେରେ ବଲଲ ଶିଉଲି--'ହାରାମଜାଦା!'।

--'ଶୁଧୁ ହାରାମଜାଦାଯ ହବେ? ଜୁତୋ କଇ?'।

ଜୋରେ ହେସେ ଉଠେଛିଲ ସେ। ବାବନ ତାର ହାସି ହାସି ମୁଖ୍ଟାର ଦିକେ ଏକଦୃଷ୍ଟି ତାକିଯେଛିଲା। ଏହି ହାସିଭରା ମୁଖ୍ଟା କବେ ଯେନ ତାର ବଡ଼ ଆପନ ହୟେ ଗିଯେଛେ। ସେ ବୁଝାତେଓ ପାରେନି। ହୟତୋ ବୁଝାତେଓ ପାରତ ନା! କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସଖନ ନୋଟିସ ଦିଯେ ଦିଲ ତଥନଇ ଯେନ କେ ଏକ ଝଟକାଯ ଜାଗିଯେ ଦିଯେ ଗେଲ ବାବନକେ। ଶିଉଲିର ଜନ୍ୟ ରାତର ପର ରାତ ଜାଗା... ଆଇ ସି ଇଉର ବାଇରେ ଥେକେ ତାକେ ଏକଝଲକ ଦେଖା... ମୃତ୍ୟୁର ସାଥେ ପାଞ୍ଜା କଷାର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ତାର ପାଶ ଛେଡ଼େ ଏକମୁହୂର୍ତ୍ତର ଜନ୍ୟଓ ନଡ଼େନି। ଯେନ ସେ ସରଲେଇ ଶିଉଲି ତାକେ ଫାଁକି ଦିଯେ ଚଲେ ଯାବେ!

ଏତଦିନ ବାବନ ଏକଟା ନେଶାର ମତ ଦିନ କାଟାଛିଲ। ଶିଉଲିର ସାଥେ କଥା ବଲତେ ଭାଲୋ ଲାଗତ। ଅନିନ୍ଦିତାର ସଙ୍ଗଓ ତାକେ କଥନଓ ଏତ ଆନନ୍ଦ ଦିତେ ପାରେନି। ଶିଉଲିର ଆମୁଦେ ସ୍ଵଭାବ,

ସବସମୟ ଜୀବନକେ ଉପଭୋଗ କରାର ଫାନ୍ଦା ତାକେ ଯେନ ଜୀବନେର ଆରେକ ରୂପ ଦେଖିଯେଛିଲ।

ଶିଉଲି ସଖନ ତାର ଉପର ନିର୍ଭର କରତ ତଥନ ନିଜେକେ ଖୁବ ଦାମି ମନେ ହତ ବାବନେର। ଏହି ନାରୀ କଥନଓ କୋନଓ ଅଭିଯୋଗ କରେନି। ଶୁଧୁ ଜୀବନେର ପ୍ରତିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାର ସାଥେ ଶେଯାର କରେଛେ। ଅନିନ୍ଦିତା କି କଥନଓ କରେଛିଲ? ନାଃ, କରେନି!

--'ଆମି କତନି ଟିକବୋ ରେ? ଆମାର ଲାଟୁର ସିଁଥିତେ ସିଁଦୁର ଦେଖେ ଯେତେ ପାରବୋ ତୋ?'

ତାର ହାତ ନିଜେର ହାତେ ଟେନେ ନିଯେ ବଲେଛିଲ ବାବନ--'ଖୁବ ଦେଖେ ଯାବେ'।

--'କିନ୍ତୁ...'। ସଜଳ ଚୋଥେ ବଲଲ ଶିଉଲି--'କିନ୍ତୁ ଲାଟୁଟାର କନ୍ୟାଦାନ କେ କରବେ? ଓର ବାପ ମାକଡ଼ାଟା ତୋ...'।

--'ତୁମି ଚିନ୍ତା କୋର ନା। ସବ ଠିକ ହୟେ ଯାବେ'।

পরম শান্তিতে বাবনের হাতছুটো জড়িয়ে ধরে বাচ্চা মেয়ের মত ঘুমিয়ে পড়েছিল শিউলি! সে স্পর্শ কি নির্ভরতা! অঙ্গুত নিশ্চিন্তা! বাবনের কথাই যেন বেদবাক্য! সে যখন বলেছে, তখন সবই হবো।

ভিজিটিং আওয়ার্সে শিউলির সাথে দেখা করতে এসে মনে মনে প্রস্তুতি নিছিল সে। সব ঠিক করে ফেলেছে। এখন শুধু শিউলিকে এখান থেকে বের করতে পারলেই হয়।

কাবুল-সোনারা ক্যাশ কাউন্টারে গিয়ে টাকা মেটাচ্ছিল। সব ফর্মালিটি শেষ করে এসে বলল-‘ভাইদাদা, সব হয়ে গেছে গাড়ি রেডি। তুমি বড়ভাইকে নিয়ে এসো। টেনশন নিও না মামা! একদম যেরকম বলেছে, সেরকম হবো।’

--‘টেনশন নেবো না বলছিস?’

কাবুল একগাল হাসল-‘আরে মামা, ফুলটু বিন্দাস হয়ে যাও। কোনও লোচা নেই’।

সোনা কথাবার্তা নেই ভাঁক করে কেঁদে ফেলল-‘মামু... আমার হেবি কান্না পাচ্ছ... নাক শুড়শুড় করছে...’।

--‘ওয়ে সেন্টুর বাক্স!,’ কাবুল খিঁচিয়ে ওঠে-‘ভাইদাদা সেটিং করতে যাচ্ছে আর তুই শালা পনৌতি খাড়া করছিস্ক! নাকে কান্না থামা!’

হুরুহুরু বুকে শিউলির কেবিনে ঢুকল বাবন। একটু ভয় ভয় যে করছে না, তা নয়। তবু প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজেকে ঠিক রাখার মাথার চুলে একবার হাত বোলাল। গলা সাফ করে নিল। পাঞ্জীবীর পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল, জিনিসটা আছে কি না!

শিউলি বোধহয় উদগ্রীব হয়ে তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখেই বলল-‘তুই এসেছিস? আমি শো কখন থেকে টেম দেখে মরছি। এত দেরি হল কেন বে?’

বাবন আস্তে আস্তে উত্তর দেয়-‘ইয়ে, মানে লাটুর কন্যাদানের বন্দোবস্ত করছিলাম কি না!’,

--‘লাটুর কন্যাদানের বন্দোবস্ত!’, সে ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। বাবন একমুহূর্ত তার দিকে মায়াময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তারপর হেসে বলে-‘এক ছুটকি সিন্দুর কা মতলব তুম ক্যায়া জানো বড়ভাই!’,

শিউলি স্তুতি হয়ে দেখল বাবন পকেট থেকে একটা নতুন সিঁদুরের কৌটো বের করে এনেছে। সে ব্যাপারটা বুঝেও বোঝে না! ওটা কার জন্য? লাটুর জন্য? না অন্য কিছু? তাকে ঐ সসেমিরা অবস্থাতেই রেখে মুহূর্তের মধ্যে বাবন সিঁদুর নিয়ে পরিয়ে দিল শিউলির সাদা সিঁথিতে! শিউলির উঠল শিউলি। রোমাঙ্কে, সুখে, বিস্ময়ে থরথর করে কাঁপছে সে! যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না! ঠিক কি ঘটল ঘটনাটা!

বাবন তার স্তুতি মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিঘ হাসছে-‘এরপর আমরা মন্দিরে গিয়ে আনুষ্ঠানিক বিয়ে করবো। ফটো তুলবো।’ এখন আমিই লাটুর বাবা। ওর কন্যাদান করার রাইট আমার। অতএব তোমার ‘প্রলবেম’ সলভড!’,

--‘কি করলি!... এ তুই কি করলি বাবন...!’, পরম সুখে তার বুকে মাথা রেখে কাঁদছে শিউলি-‘আমি ক, দিন পরেই টপকাবো! তখন তুই কি নিয়ে থাকবি!... কি করলি তুই!... এমন উল্লুর মত কাজ করলি কেন পাগলাচোদা...’!

--‘বেশ করেছি।’ বাবন তার চিরুক ধরে মুখটা তুলে দেয়-‘শিউলি, তোমার কাছ থেকেই আমি একটা খুব দামি জিনিস শিখেছি। আমরা ‘জীবন জীবন’ করে যতই হেদিয়ে মরি,

জীবন আসলে আমাদের লাইফের মত বড় নয়! জীবন শুধু কয়েকমুহূর্তের। লোকে গোটা আয়ুটা কোনমতে 'খোড় বড়ি খাড়া' করে কাটায়। কিন্তু নিজেদের জীবন বেঁচে নেয় শুধু কয়েকটা বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে! আসল বাঁচাটা শুধু খুব কম সময়ের জন্যই হয়—বাদবাকিটা শ্রেফ জাবর কাটা'।

বলতে বলতেই ভীষন আদরে সে দুহাতে শিউলির মুখ ধরল। তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল—'যতদিন তুমি থাকবে, ততদিনে আমরা গোটা লাইফটাই বেঁচে নেব। একমুহূর্তও বাদ রাখব না। প্রাণভরে খাবো দাবো। হাওড়া বিজে উঠে মাতলামি করবো। মাল্টিপ্লেক্সে গিয়ে ফিল্ম দেখে গলা জড়াজড়ি করে কাঁদব। পান্না দিয়ে ফুচকা খাবো। রোজ সকালে নিজের হাতে তোমার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেব। তোমায় নিজের মত করে সাজাবো। তুমি শপিং করবে, আমি ব্যাগ বইবো। তোমার জন্য রাত জাগবো। তোমার ভুলভাল ইংরেজি শুধরে দেবো। তোমার জুতোপেটা আমি সারাজীবন ধরে খেয়ে যাবো শিউলি। মন খারাপ হলে নষ্টামি করে মন ভালো করে দেবো। আমি তোমার সাথে সবসময় থাকবো। যতক্ষণ তুমি আমি পাশাপাশি আছি, ততক্ষণ যমদূতের নোটিসও আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না!'

শিউলির আবার কান্না পাছিল। কিন্তু আরও জোরে একটা কান্নার শব্দ পেয়ে সে খেমে যায়। এত জোরে জোরে কাঁদছে কারা? সে কৌতুহলী হয়ে এক পা দু পা করে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

কেবিনের বাইরে কাবুল আর সোনা বসেছিল। সেই জগাই-মাধাই দুটোই গলা জড়াজড়ি করে কান্না জুড়েছে। একদম সেন্টু খেয়ে গেছে। কাবুল বলছে—'এত খুশ আগে কখনও হইনি রে সোনা। খুশির মাঝে কান্না পেয়ে যাচ্ছে! দোদোর দলকে একহাত ঠ্যাঙালেও এত খুশি পাবো না! ছেটভাইয়ের লাইফ সেট। বড়ভাই ও...!'

--'ঢাম্না! নোটক্ষি শালা!', শিউলি পায়ের জুতো খুলতে শুরু করেছে—'কেবিনের বাইরে বসে জাসুসি করছিস্। মেরে মেরে বিচি মাথায় না তুলেছি তো...!'

পালোয়ান দুটো তিনটে লাফ মেরে হড়মুড় করে চোঁ চা ভেগে গেল।
অবশ্যে হে-পি ও-য়ে-ল্ডিং!

কার আবার? আমাদের বিশু আর লাটু... থুড়ি লতিকার! সাতদিন ধরে ধুমধাম চলল! নবগ্রাম এত বড় বিয়ে আগে কখনও দেখেনি! বিয়েতে লাইভ কনসার্টের বল্দোবল্দ হয়েছিল। বাইরে থেকে কনসার্ট তো এসেছিলই। এমনকি মেহেন্দি উপলক্ষে পাড়ার মেয়েরাও নাচাগানা করেছে! বিশুর প্রাঞ্জন প্রেমিকারা সব প্রায় পুড়ে ধোঁয়া! যে ছেলেটাকে লাইফ থেকে ক্লিন বোল্ড করে আউট করেছিল, সে যে এরকম ডাব্লু সেঞ্চুরি হাঁকাবে তা কে জানত! শুধু রাজপাটাই নয়, সেরা সুন্দরীটিকেও কজা করেছে! মেয়ে তো মেয়ে নয়, সাক্ষাৎ উর্বশী! ছেলেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছে—'কে জানত ঐ বড়িখোর, ফ্রাস্টু খাওয়া, চিরকেলে দেবদাস বিশুটার বরাতে এমন একটা হাই ভোল্টেজ মেয়ে নাচছে! শালার কি বরাত!'

বিশুরও বড়ি ল্যাঙ্গোয়েজ পুরো অন্যরকম। অনেকটা 'উলটে দেখুন পালটে গেছে' কেস! এখন তাকে দেখলে কে বলবে—একদিন সে-ই বড়ি খেয়ে ল্যাদ্ খেয়ে বেরিয়েছে চতুর্দিকে! ছড়িয়ে ছত্রিশ করেছে! আজ সে বোধহয় দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী পুরুষ! মাঝেমধ্যেই

আড়চোখে বৌয়ের দিকে তাকিয়ে নিচ্ছ! বৌও কখনও হাসতে চোখ মেরে দিচ্ছ!

কি দুষ্টু বল দেখি!

বিয়ের দিন বাবনই কন্যাদান করল। শিউলি দু চোখে জল নিয়ে দেখছিল মেয়েকে!

বেনারসী, সোনার গয়নায় মোড়া মেয়ে যেন রাজেন্দ্রাণী! বরটা একটু ঝোগাসোগা বটে। কিন্তু দেখতে ভালো।

-- 'শুনছ?'

বাবন এখন তার স্বামী। স্বামীকে তো আর 'তুই' বলা যায় না। অগত্যা দুজনেই অধুনা 'ওগো হ্যাঁগো'!

-- 'বলো'।

-- 'ছেলেটা বড় প্যাংটা!', শিউলি স্থিত হাসল-- ওটাকে একটু তাগড়াই করতে হবে। এটা তোমার ডার্টি....!'

-- 'কেলো করেছে'। বাবন বলল-- 'বড়ভাই, ওটা ডিউটি, ডার্টি মানে নোংরা'।
শিউলি হেসে ফেলল।

এমনিতে বিয়েতে তেমন কোনও সমস্যা হয়নি। শুধু একটাই চাপের ব্যাপার। বিয়ের লগ্ন রাত তিনটৈয়ে পড়েছিল। রাত পেরিয়ে ভোর হতে চলেছে। লাটু প্রায় রঞ্জচক্ষু করে পুরুতের দিকে তাকিয়ে। পারলে এখনই আঁশবটি নিয়ে তেড়ে যায়। বিশু চুলছে এবং বিড়বিড় করে ভুলভাল মন্ত্র পড়ছে।

পুরুতমশাই মন্ত্র থামিয়ে বাবনের দিকে তাকিয়ে বললেন-- 'একটা কলা...'

বিশুও সঙ্গে সঙ্গে বললো-- 'একটা কলা...!'

কি কেলো!

ওদিকে বাবন চোখটিপে ইশারা করছে-- পুরুত ঠাকুর, যতটা শর্টকার্টে হয় সারুন।

কিন্তু কে শোনে কার কথা? পুরুতঠাকুর সমস্ত দেবদেবীদের ডাকাডাকি শুরু করেছেন।

শিবঙ্গোত্ত্ব, চঙ্গী, দুর্গা, লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ মায় তার ইঁহুরটা পর্যন্ত কেউ বাকি নেই!

শুধু সরস্বতী ছাড়া বাদবাকিরা নেমন্তন্ত্র পেয়ে গেছেন, এখন-- জয় জয় দেবী চৰাচৰসারে... ই বাকি আছে!

শেষমেষ অবশ্য সরস্বতীই বাদ পড়লেন। ভোর ছ'টায় পুরুতঠাকুর ঘোষণা করলেন যে বিবাহ শেষ। ততক্ষণে প্রায় সকলেই ল্যাদ খেয়ে পড়েছে!

এই হল বিয়ের ধারাবিবরণী।

পিকুল সাতপাক ঘোরার সময়ে দেবীর মাথায় ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিল। দেবী চোখ পাকিয়ে তাকাতেই বলল-- 'কবে যে আমাদেরও এমন দিন আসবে?' উত্তরে দেবী আধহাত জিভ কেঁটে ভেংচি কাটল।

বাবন ও শিউলি পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে বিয়ে দেখল। লাটুটার কপাল থেকে নাকের উপর সিঁদুর পড়েছে! মেয়েটা ভাতারসোহাগী হবে! তার বড় সুখের দিন আজকে! বড় আনন্দের দিন! এমন দিনে বোধহয় মরে যেতেও ভালো লাগে!

কিন্তু গল্লের তখনও কিছু বাকি ছিল!

বিয়ে শেষ হওয়ার পর যখন বর-বৌ বাসরে গিয়ে বসেছে ঠিক তখনই...!

একজোড়া চোখ! সেই একজোড়া অসভ্য চোখ!

লাটু আর বিশু পাশাপাশি বসে সবার সঙ্গে কথা বলছে। লাজুক লাজুক হাসছে। বড়দের দল রাসিকতা করছেন। ছেট আর সমবয়সী পার্টি পানু জোক্স্ ছাড়ছে। সব মিলিয়ে জমজমাট পরিবেশ!

এর মধ্যেই বিভিপিসি একটু আড়ালে গিয়ে গুড়াকু মাজতে শুরু করেছেন। এটাই তার এনার্জি সাপ্লাইয়ের মূল রাস্তা। সারা রাত জেগে থাকাটা তো কম ধকলের নয়! মনের আনন্দে দাঁত মাজতে মাজতে জানলার সামনে গিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন।

হঠাতে চোখে পড়ল জানলার সাইডে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে! তার চোখ দুটো ধ্বক ধ্বক করে অঙ্ককারেও জ্বলছে! লোকটা জানলা দিয়ে এদিকেই উঁকি মারছে!

সঙ্গে সঙ্গে খাঁই খাঁই করে উঠলেন বিভিপিসি!

--'ভূ-ত, ভূ-ত!', কোনমতে দৌড়ে এসে জানালেন--'সেই ভূতটা... সেই অসভ্য চোখ জানলা দিয়ে উঁকি মারছে!'

পাড়ার ছেলেরা সবাই তখন সেখানেই ছিল। লাফ মেরে দৌড়ল ভূত ধরতে।

'অসভ্য চোখ' বোধহয় আশা করেনি যে তাকে ধরার জন্য সারা পাড়ার লোক ঘাপ্টি মেরে ওখানেই বসে আছে! ভেবেছিল ফাঁকে তালে একটু সিন-চিন দেখে টুক করে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু একেই তো সারা পাড়ার ছেলেরা ওখানেই আছে। তার উপর লাটুর চ্যালাচামুভাগুলোও দৌড়ল তার পিছনে। বেশ কয়েকবার চুককি দিয়েও পালাতে পারল না ব্যাটা। সোনা-কাবুলরা তাকে জাপ্টে কমে ধরল! তারপর নিয়ে এল বিয়ের আসরে!

'অসভ্য চোখের' আসল পরিচয় এতদিনে ফাঁস হল! সবাই তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে! যেন ভাবতেই পারেনি এ 'অসভ্য চোখ' হতে পারে! পিকুল শক্তি! সুবীর কাকু 'থ'। দেবী কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল--'পিকুল, তবে এর হাতেরই রামথাঙ্গড় খেয়েছিল তুই!'

পিকুল বলল--'হ্যাঁ। এবার বিশুদ্ধার সাপ, ঘোঁতনের চিংকার, আমগাছ আর ছাতে ছাতে হাইজাপ্পের রহস্য একসাথে রিলেট করতে পারছি!'

'অসভ্য চোখের' কিন্তু কোনও তাপ-উত্তাপ নেই! সে সবার দিকে নিপাট ভালোমানুষের মত জুলজুল করে তাকাচ্ছে। ভাবটা এমন যেন বলছে--'আমায় ধরেছ কেন বাপু! আমি তো ভাজা মাছের উলটো পিঠটা চিনিই নে!'

বিশুও কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দেখল ব্যাটাকে। তারপর চেঁচিয়ে উঠল--'মর্কট কাঁহিকা! ঐ ল্যাজ দেখিয়েই আমায় ভয় দেখিয়েছিল! ওর ল্যাজটাকেই আমি সাপ ভেবেছিলাম। দে তো হতভাগার ল্যাজ কেটে!'

ল্যাজই বটে! রীতিমত প্রমাণ সাইজের ল্যাজ! অ্যাঁ! না... না... মানুষ টানুষ নয়! পেন্নায় সাইজের একটা মুখপোড়া হনুমান! হরিনাম লেখা একখানা পায়জামা পরে আছে। তার পিছন থেকে উঁচিয়ে আছে ল্যাজটা!

এরই জ্বালায় জ্বলছে নবগ্রাম! হতভাগা গাছের উপর দিয়ে আসে। ভয় দেখিয়েই সুট করে লাফ মেরে পালিয়ে যায়। তাই তাকে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। ধরাও যায়নি। আর অঙ্ককারে তার চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলে! সেই চোখ দেখেই সবার হাল পাতলা হয়ে গেছে!

পিকুল রে রে করে এগিয়ে গেছে—'একটা পেন্নায় চড় তোকে আমিও না
মেরেছি!... হনুমানের বাচ্চা... বদমায়েশ...!'
সুবীরকাকুও হাতা গোটাচ্ছেন—'আমার টাকে টব ছেঁড়া...!'
সুব্রতদা এতক্ষণ কোথায় ঘাপ্ট মেরে বসেছিলেন কে জানে। এবার এগিয়ে এসে বললেন—
'এই পামরের জন্য আমি কেস খেয়ে যাচ্ছিলাম। শালা কঙ্গে হাত দেখিয়ে আমায় বঙছাড়া
করার বড়যন্ত্র...!'
হনুমানটার কপালে নির্ধার দুঃখ ছিল। বাঁচালেন বিস্তিপিসি। এগিয়ে এসে বললেন—'আ-হা!
মারিস্ নি! জানিস এ কে! এই দ্যাখ কেশব মাধব লেখা প্যান্টুল পরে আছে!'
—'থাকুক,'। পিকুল ক্ষেপে গিয়ে বলে—'শুধু কেশব মাধব কেন? যাদব, উদ্বব, ধবধব,
গর্দভ লেখা প্যান্টুল পরলেও ছাড়ছি না!'
—'আ-হা!', পিসি দুহাত ঠেকিয়ে প্রণাম করেন—'এ কি যেমন তেমন হনুমান! এ হল
ঘামেশ্বর বাবার পোষা হনুমান। সমোক্ষিত বলতে পারে। হনুমান চান্নিসা পড়তে পারে। মারিস্
নি বাবা। পাপ হবে...!'
সোনা-কাবুলরা ঘাবড়ে গিয়ে হনুমানটাকে ছেড়ে দিয়ে গড় করল। বজরংবলীর জাত কি না!
বিস্তিপিসির কি অসীম সাহস! দিব্যি হনুটার কাছে গিয়ে বললেন—'বাবা, ওদের মাফ করো,
ওরা তো জানে না যে তুমি কে। তা বাবা, এমন শুভ সময়ে এসে যখন পড়েছ তখন একটু
সমোক্ষিত বলে যাও। আমরাও একটু শুনে পূণ্যি করি....। বলো বাবা, জয় হনুমান
জ্ঞানগুণসাগর...!'
হনুমানটা কি যাচ্ছেতাই! সমোক্ষিত তো বললই না, উলটে এক খামচা মেরে পিসির হাত
থেকে গুড়াকুর ভর্তি ডাক্কাটা নিয়ে একলাফে গাছে চড়ে বসল।
ব্যস্ত! ভক্তি টক্তি কোথায় গেল পিসির কেজানে! তিনি তিন লাফ মেরে নাচতে শুরু
করলেন—'হতভাগা, মুখপোড়া ড্যাক্রা! আমার তামাকের ডিবে নিয়ে গেলি! ভোলা মুদির
দোকান থেকে আজই ভর্তি কৌটো এনেছি! সবটা নিয়ে গেলি! তোর মুখে পোকা পড়ুক!
হাতে কুষ্ট হোক! সমোক্ষিত পড়তে পারে না কচু!... যতসব ঢ্যাম্নার দল! আমার ডিবে
দিয়ে যা বলছি! নয়তো...!'
হনুমানটা দাঁত বের করে উত্তরে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কচু কচু বলে আরেক লাফে কোথায় হাপিশ
হয়ে গেল!
লেং হালুয়া! কি ছোটলোক দেখেছ!
(সমাপ্ত)